ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

ত্রয়োদশ বর্ষ, ১৩১৬ সাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিত সেবক রামচন্দ্র প্রবর্ত্তিত

ও সেবকমণ্ডলী সম্পাদিত।

তত্ত্ব-মঞ্জরী কার্য্যালয়।

৮০।১, করপোরেসন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার।

কলিকাতা, ৬ নং ভীম ঘোষের লেন,

গ্রেট ইডিন্ প্রেসে শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৬ সাল।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ এক টাকা।

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী

বৈশাখ, ১৩১৬ সাল।

ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ।*

(পূর্ব্ব বর্ষের ২০০ পৃষ্ঠার পর)

৪৩৫। ঈশ্বরকোটির বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। প্রহ্লাদ 'ক' লিখ্‌তে একেবারে কান্না—কৃষ্ণকে মনে পড়েছে। যারা জীবকোটি, তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। জীবের স্বভাব—সংশয়াত্মক বুদ্ধি।

৪৩৬। যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে,—এই বোধ, ততক্ষণ অজ্ঞান; যতক্ষণ হেথা হেথা বোধ, ততক্ষণ জ্ঞান। যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিস চৈতন্যময় বোধ হয়।

৪৩৭। সরল বিশ্বাস, বালকের বিশ্বাস, না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

৪৩৮। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব, এতে কোনো বিপদ নাই। ভগ্নীভাব, এও মন্দ নয়। স্ত্রীভাব—বীরভাব, বড় কঠিন।

৪৩৯। প্রেমোন্মাদ না হলে তিনি সমস্ত ভার লন না। ছোট ছেলেকেই হাত ধরে খেতে বসিয়ে দেয়; বুড়োদের কে দেয়? তাঁর চিন্তা কোরে, যখন নিজের ভার আর নিজে নিতে পারে না, তখন ঈশ্বরই ভার লন।

৪৪০। তিনি সাকার, নিরাকার, আবার কত কি, তা আমরা জানিনা।

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত হইতে সংগৃহীত।

শুধু নিরাকার ব্রহ্ম কেমন করে হবে? সব মানতে হয়। তিনি কখন কিরূপে দেখা দেন, সামনে আসেন, বলা যায় না!

৪৪১। মেয়েমানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়, তবে যদি ভগবান লাভ হয়। যাদের মতলব খারাপ, সে সব মেয়েমানুষের কাছে আনাগোনা করা, কি তাদের হাতে কিছু খাওয়া, বড় খারাপ। তারা সত্ত্বাংহরণ করে।

৪৪২। মেয়েমানুষের কাছে খুব সাবধানি হতে হয়। মেয়ে—ত্রিভুবন দিলে খেয়ে ফেলে।

৪৪৩। যাদের কৌমার বৈরাগ্য, যারা ছেলেবেলা থেকে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়, সংসারে ঢোকে না, তারা একটী থাক্ আলাদা। তারা নৈকুষ্য কুলীন। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হলে, তারা মেয়েমানুষ থেকে পঞ্চাশ হাত তফাতে থাকে, পাছে তাদের ভাব ভঙ্গ হয়। তারা যদি মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ে, তা হলে আর নৈকুষ্য কুলীন থাকে না, ভঙ্গভাব হয়ে যায়। তাদের ঘর নিচু হয়ে যায়। যাদের ঠিক কৌমার বৈরাগ্য, তাদের উঁচু ঘর; অতি শুদ্ধ ভাব। গায়ে দাগটী পর্য্যন্ত লাগেনা।

৪৪৪। আপনাতে স্ত্রীলোকের ভাব আরোপ কর্ত্তে পারলে, জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায়।

৪৪৫। যার স্তনে বোঁটা আছে, সেই মেয়ে। শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জ্জুনের স্তনে বোঁটা ছিল না।

৪৪৬। শিবপূজার ভাব কি জান? মাতৃস্থান ও পিতৃস্থানের পূজা। ভক্ত এই ব'লে পূজা করে,—ঠাকুর! দেখো যেন আর জন্ম না হয়; শোণিত শুক্রের মধ্য দিয়া, মাতৃস্থান ও পিতৃস্থান দিয়া আর যেন আসতে না হয়।

৪৪৭। শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় ময়ূরের পাখা, ময়ূর-পাখাতে যোনি চিহ্ন আছে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে মাথায় রেখেছেন। কৃষ্ণ রাসমণ্ডলে নিজে প্রকৃতি হলেন, তাই রাসমণ্ডলে তাঁর মেয়ের বেশ। নিজে প্রকৃতিভাব না হলে, প্রকৃতিসঙ্গের অধিকারী হয় না। নিজে প্রকৃতিভাব হলে, তবে রাস, তবে সম্ভোগ।

৪৪৮। সাধক অবস্থায় খুব সাবধান হতে হয়। তখন মেয়েমানুষ থেকে অনেক অন্তরে থাকতে হয়। এমন কি ভক্তিমতী হলেও, তার কাছে বেশী যেতে নাই। ছাতে উঠবার সময় হেলতে দুলতে নাই; হেল্‌লে দুল্‌লে পড়বার খুব সম্ভাবনা। যারা দুর্ব্বল—তাদের ধরে ধরে উঠতে হয়।

৪৪৯। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা। ভগবানকে দর্শনের পর বেশী ভয় নাই। অনেকটা নির্ভয়। ছাতে একবার উঠতে পারলে হয়। উঠবার পর ছাতে নাচাও যায়। সিঁড়িতে কিন্তু নাচা যায় না। আবার দেখ, যা ত্যাগ করে গেছি, ছাতে উঠবার পর, তা আর ত্যাগ করতে হয় না। ছাতও ইট, চূণ, সুরকির তৈয়ারী, আবার সিড়িও সেই জিনিসের তৈয়ারী। যে মেয়েমানুষের কাছে এত সাবধান ছিলে, ভগবান দর্শনের পর বোধ হবে, সেই মেয়েমানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী। তখন তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করবে। আর ভয় নাই।

৪৫০। কথাটা এই—বুড়ী ছুঁয়ে পরে যা ইচ্ছা কর।

৪৫১। ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে, তার লক্ষণ আছে। একটী লক্ষণ—মাথায় পাখী বসবে, জড় মনে ক'রে।

৪৫২। চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়; কথা কচ্ছে তবুও ধ্যান হয়। যেমন মনে কর, একজনের দাঁতের ব্যামো যদি থাকে, সব কর্ম্ম কচ্ছে, কিন্তু দরদের দিকে মনটা আছে।

৪৫৩। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার না থাকলে ফস্ করে বৈরাগ্য হয় না।

৪৫৪। শেষ জন্মে সত্ত্বগুণ থাকে, ভগবানে মন হয়। তাঁর জন্য মন ব্যাকুল হয়। নানা বিষয় কর্ম্ম থেকে মন সরে আসে।

৪৫৫। যেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে, সেরূপ স্বভাব হয়ে যায়। আবার নিজের যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ সঙ্গও লোকে খোঁজে।

৪৫৬। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ খুব ভাল। রোগ মানুষের লেগেই আছে, সাধু সঙ্গে অনেক উপশম হয়।

৪৫৭। সংসার ত্যাগ করতে হবে কেন? আপনার মনে ত্যাগ করো। সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাক।

৪৫৮। শুধু বিচার করলে কি হবে? তাঁর জন্য ব্যাকুল হও, তাঁকে ভালবাসতে শেখো। জ্ঞানবিচার পুরুষমানুষ, বাড়ীর বাইরে পর্য্যন্ত যায়; ভক্তি মেয়েমানুষ, অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে।

৪৫৯। একটা কোনও রকম ভাব আশ্রয় করতে হয়, তবে ঈশ্বর লাভ হয়। সনকাদি ঋষিরা শান্তরস নিয়ে ছিলেন। হনুমান দাসভাব নিয়ে ছিলেন। শ্রীদাম, সুদাম, ব্রজের রাখালদের সখ্যভাব। যশোদার বাৎসল্য ভাব—ঈশ্বরেতে সন্তানবুদ্ধি। শ্রীমতীর মধুরভাব।

৪৬০। "হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু,' আমি দাস",—এই ভাবটীর নাম দাস-ভাব। সাধকের পক্ষে এ ভাবটী খুব ভাল।

৪৬১। শুধু জ্ঞান জ্ঞান করলেই কি হয়? জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে। দুটী লক্ষণ। প্রথম—অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা। কেবল জ্ঞানবিচার করছি, কিন্তু ঈশ্বরেতে অনুরাগ নাই, ভালবাসা নাই, সে মিছে। আর একটী লক্ষণ—কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। যাই তাঁর নিদ্রা ভাঙ্গে, অমনি ব্যাকুলতা আরম্ভ হয়, ঈশ্বরকে পাবার জন্য। বসে বসে বই পড়ে যাচ্ছি, বিচার করছি, কিন্তু ভিতরে ব্যাকুলতা নাই, সেটী জ্ঞানের লক্ষণ নয়। কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ হ'লে ভাব ভক্তি প্রেম এই সব হয়।

৪৬২। সন্ধ্যাদি কত দিন? যত দিন না তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি হয়, তাঁর নাম কত্তে কত্তে চক্ষের জল যত দিন না পড়ে, আর শরীর রোমাঞ্চ যত দিন না হয়।

৪৬৩। যখন ফল হয়, তখন ফুল ঝরে যায়; যখন ভক্তি হয়, যখন ঈশ্বর লাভ হয়, তখন সন্ধ্যাদি কর্ম্ম চলে যায়।

৪৬৪। কেন তীব্র-বৈরাগ্য হয় না জানো? ভিতরে বাসনা, প্রবৃত্তি, এই সব আছে বলে। বাসনায় মন সংসারে নোয়ানো রয়েছে। বাসনা না থাকলে মনের সহজে উর্দ্ধদৃষ্টি হয়।

৪৬৫। যদি ষোলআনা চাও, তবে ষোলআনা দিতে হবে। একটু বিঘ্ন থাকলে আর যোগ হবার যো নাই। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে, তা হ'লে আর খবর যাবে না।

৪৬৬। সংসারে আছ, থাকলেই বা। কিন্তু কর্ম্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ কর। নিজের কোনও ফল কামনা কত্তে নাই।

৪৬৭। ভক্তি কামনা—কামনার মধ্যে নয়। ভক্তি কামনা, ভক্তি প্রার্থনা করতে পার।

৪৬৮। ভক্তির তমঃ আন্‌বে। মার কাছে জোর কর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম কামারপুকুর ও জয়রামবাটী।

(পূর্ব্ব বর্ষের ২৫৩ পৃষ্ঠার পর)

[শ্রীধাম কামারপুকুর]

আর পরস্পর দেখিতে পাওয়া গেল না। সুতরাং মামা পশ্চাৎ ফিরিলেন, আমরাও চলিতে চলিতে 'আমোদরের' তীরে আসিয়া পৌছিলাম। হাঁটিয়া পার হইয়া আমরা বরাবর পূর্ব্বমুখে চলিলাম। রাস্তা জানা নাই, সুতরাং পূর্ব্বদিক নির্ণয় করিয়া ধানবন ভাঙ্গিয়া চলিতে লাগিলাম। মাঠ শেষ হইলে দেখিলাম যে, আমরা একটী পল্লির নিকট পৌছিয়াছি। ৩।৪ জন কৃষক তথায় চাষ করিতেছিল। তাহাদিগকে কামারপুকুরের পথ জিজ্ঞাসা করায় কহিল যে, 'আপনারা একটু বে-পথে আসিয়াছেন, যাহা হউক, এই গ্রামে ঢুকিয়া রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যান।' আমরা তাহাদের নির্দ্দেশানুযায়ী চলিয়া আবার একটী মাঠে পড়িলাম। দেখি, দুই দিকে দুটী রাস্তা গিয়াছে। কোন পথে যাইব ভাবিতেছি, ঠিক এমন সময়ে যে পথে যাওয়া উচিত নয়, সেই পথে একটী লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে যথাপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিল। সেই নির্দ্দিষ্ট পথে একটু গেলেই পথ-পার্শ্বের শেষ বাটী হইতে একটী লোক বাহির হইল। তাহাকে কামারপুকুরের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, আমার সঙ্গে আসুন; আমি লাহাবাবুদের বাটী রাস দেখিতে যাইব। ইহাকে পাইয়া প্রাণে বড় আনন্দ হইল, আমরা নিশ্চিন্তমনে তাহার সহিত গল্প করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। তাহার মাতুলের ৫০৲ টাকা মূল্যের একটী গরু কাঠ আনার জন্য বনে লইয়া যাওয়ায়, তথায় হারাইয়া গিয়াছে; সেই কথা বলিতে বলিতে এবং তজ্জন্য দুঃখ করিতে করিতে সে আমাদের আগে আগে চলিতে লাগিল। ভুরসুবা গ্রামে পৌছিয়া একটী বড় পুষ্করণী দেখা গেল। সেই লোকটী বলিল যে, ইহা মাণিক রাজার দীঘি। ইহার নাম দামোদর সায়ের। যে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে পারিবে, সেই এখানে মাছ ধরিতে পারিবে, নতুবা আর কাহারও ধরিবার অধিকার নাই। দিব্য দেওয়া আছে। আমরা সেই পুষ্করণী হইতে মুখে একটু জল দিলাম।

সন্ধ্যা হয় হয়, আর অধিক বিলম্ব নাই। চলিতে চলিতে দেখি, অনেক ছেলে মেয়ে এবং স্ত্রীলোকগণ ও তৎসঙ্গে দুই একটী পুরুষ আসিতেছে। সেই

লোকটী কহিল, ইহারা সব লা' বাবুদের বাটীর রাস দেখিয়া ফিরিতেছে। আর একটু চলিলে দেখি, একটী ১৭।১৮ বৎসরের বালক গলা ছাড়িয়া গাহিতে গাহিতে আসিতেছে—

'পাখী এই যে গাহিলি গাছে।
কেন চুপি দিলি, ঝোপে ডুবে গেলি, এখনও রজনী আছে॥'

বটুবাবু কহিলেন দেখুন, এমন পাড়াগাঁয়েও থিয়েটারের প্রভাব কেমন প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমি কহিলাম হাঁ, সকল কার্য্যেরই এমনই রীতি। যেমন কার্য্যই হউক, সমাজে একটা ছাপ না দিয়া যায় না।

সন্ধ্যা হইয়াছে, আমরাও ভূতির খালধারে আসিয়া পৌঁছিলাম। বটুবাবু ইতিপূর্ব্বে একবার আসিয়াছিলেন, তাই কহিলেন যে, হাঁ, এইবার আমি চিনিয়াছি। সেই লোকটী আর একটু আসিয়া ডাইনের একটু রাস্তা ধরিয়া লাহাবাবুদের বাটী পানে চলিল। আমরা আর ২।৪ পদ অগ্রসর হইলেই, বটুবাবু এই যে, এই যে, কবিয়া ঠাকুরের বাটীর বৈঠকখানার দ্বারে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করতঃ দ্বার উন্মোচন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আমরাও অতি পুলকিত অন্তরে তাহার অনুসরণ কবিলাম।

আমরা তথায় পুটলি নামাইয়া আলো জ্বালিলাম। দেখি, একখানি কম্বল পাতা রহিয়াছে এবং তদুপরি অনেকগুলি কাপড়চোপড় রহিয়াছে। আমরা অনুমাণ করিলাম বোধ হয়, আরো কাহারা আসিয়াছেন। তৎপরে আমরা শিবু দাদাকে* ডাকিতে ডাকিতে একেবারে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে ৺ রঘুবীর ও ৺ মা শীতলার গৃহ। দাদা আরতির আয়োজন করিতেছিলেন। ঠাকুরদের জন্য আমাদের সঙ্গে কিছু দ্রব্য ছিল, তাহা উক্ত দেবগৃহের দাওয়ায় রাখিয়া আমরা সকলে সেই শ্রীরামকৃষ্ণ-গৃহ-বিরাজিত দেবদেবীগণকে প্রণাম করিলাম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকে তখন ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করিতে লাগিলাম। মনে উঠিতে লাগিল,—

'অদ্য মে সফলং জন্মং, অদ্য মে সফলং ক্রিয়াঃ।'

আরতি আরম্ভ হইল। আমরা অনিমেষনয়নে সেই শুভ আরতি দর্শন করিতে লাগিলাম। আরতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-আরতি গীতটী মনে উঠিতে লাগিল—

---

* ঠাকুরের অগ্রজ মধ্যম ভ্রাতার কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি এই সময়ে বাটীতে ছিলেন।

'ভাল রামকৃষ্ণ আরতি বাজে।
ভকত মোহিত প্রাণ চৌদিকে রাজে॥"*

আরতি শেষ হইল। দাদা আমাদিগকে চরণামৃত ও নির্ম্মাল্য দিলেন। আমরা তাহা মস্তকে ধারণ করিলাম। দাওয়ায় একটী যুবক বসিয়াছিলেন, নাম শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সান্যাল। তিনি এবং তাঁহার অপর ৩টী বন্ধু আমাদের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন, তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। পরে ঠাকুরের জন্মস্থানটী দেখিবার জন্য বটুবাবুকে কহিলাম। বটুবাবু সেই স্থানটী আমাদিগকে দেখাইলেন। সকলেই সেখানে অবনত মস্তকে প্রণত হইলাম এবং সেই স্থলের মৃত্তিকা লইয়া কিছু মুখে ও মস্তকে দিয়া জীবন সফল মনে করিতে লাগিলাম। এই স্থলটীর উপরে এইক্ষণ কয়েকটী তুলসী বৃক্ষ রোপিত রহিয়াছে। ঠাকুরের জন্মকালে এখানে ঢেকিশালা ও তৎপরে ধানের হামার (ধান রাখার ঘর) ছিল।

আমরা বাহিরে বৈঠকখানায় বিশ্রামার্থ গেলাম। অনুকূলবাবুর বন্ধুত্রয় বেড়াইতে গিয়াছিলেন তাঁহারাও আসিয়া জুটিলেন। আমরা সাত জনে এক সঙ্গে মিলিয়া প্রাণে খুব আনন্দ হইতে লাগিল। গৃহ মধ্যে কম্বলাদি বিছাইয়া লইয়া সকলে ফুল্লমনে বসিয়া আলাপ করিতে লাগিলাম। অনুকূলবাবু মেডিকেল কলেজে পড়েন এবং তাঁহার বন্ধুত্রয়† মধ্যে দুইজন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ, এবং একজন এম, এ, পড়েন। ইঁহারা ভক্তবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিয়া থাকেন। তাঁহারই উপদেশ মতে ইঁহারা এখানে দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছেন। কিয়ৎকাল কথাবার্ত্তার পর তাঁহাদের একজন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩য় ভাগ পাঠ করিতে লাগিলেন। আমরা তাহা শুনিতে লাগিলাম।

কিছু পরে শিবুদাদা আসিলেন। আমাদিগের সমাগমে তিনি পরমানন্দিত। হাসিতে হাসিতে আমাদিগের নিকট বসিয়া কহিলেন 'তোমারা এখন কিছু খাও।' আমরা তাহা অস্বীকার করিলাম। বটুবাবু দাদাকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইলেন, তখন আমরা দাদাকে একটী গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। দাদা গাহিতে লাগিলেন—

---

* তত্ত্ব-মঞ্জরী ১৩১৫ সালের বৈশাখ সংখ্যায় এটী মুদ্রিত আছে।

† শ্রীসীতাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিনয়েন্দ্রপ্রসাদ বাগচি, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বসু।

গো আনন্দময়ি, হয়ে মা, আমায় নিরানন্দ কোরোনা।
ও দুটি চরণ, বিনা আমার মন, অন্য কিছু আর চাহে না॥
(তপন-তনয় আমায় মন্দ কয় কি বল্‌বি মা তায় বলনা)
ভবানী বলিয়ে ভবে যাবো চলে মনে ছিল এই বাসনা।
(ওমা) অকূল পাথারে, ডুবাবি আমারে, স্বপনেও তাতো জানিনা॥
আমি অহর্নিশি, দুর্গানামে ভাসি, দুখরাশি তবু গেলনা।
(ওমা) আমি যদি মরি, ও হরসুন্দরি, তোর দুর্গানাম কেউ আর লবেনা॥

দাদা আবার একটী গাহিলেন—

আপনাতে আপনি থেকো (মন্) যেয়োনাকো কারো ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে॥
পরমধন সে পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে, আমার চিন্তামণির নাচ্‌-দুয়ারে॥

গান শেষ হইলে দাদা কহিলেন 'চল, লাহাবাবুদের বাটীতে রাস দেখিয়া আসি।' আমরা তিনজনে দাদার সঙ্গে লাহাবাবুদের বাটীতে গেলাম।

লাহাবাবুদের গৃহদেবতা দামোদর শালগ্রাম রাসমঞ্চে বসিয়াছেন। অনেকগুলি পুতুল ইত্যাদি দ্বারা প্রাঙ্গণের চারিধার সজ্জিত হইয়াছে। রাধার যমুনাপার, মার্কণ্ডের পুনর্জ্জীবন লাভ, কৃষ্ণের গোচারণ, কৃষ্ণকালী, বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ, ও শিবের বিবাহ প্রভৃতি প্রতিকৃতিগুলি অতিশয় সুন্দর বলিয়া মনে লইতে লাগিল। অনেক বালকবালিকা ও স্ত্রীলোকেরা আসিয়া রাসপ্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়াছে। অধিক রাত্রে যাত্রা হইবে, তাই নাটমন্দির সজ্জিত রহিয়াছে। কিয়ৎকাল দেখিয়া পূর্ব্বদিকে আমরা বাহিরে গেলাম। দেখি, দ্বারদেশে দুইটী বৃহদাকারের দ্বারবানের মূর্ত্তি করিয়া তাহাদের হস্তে দুইখানি বংশদণ্ড দেওয়া রহিয়াছে। অনেকে তাহাও দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। রাস্তার দুধারে অনেক খাবারের দোকান সজ্জিত রহিয়াছে। তথায় আসিয়া একটী শিবমন্দির দৃষ্ট হইল। দাদা কহিলেন যে, এইটী কামারপুকুরের পূর্ব্ব-জমিদার গোস্বামীদিগের দেবমন্দির। পরে আমরা একটু দক্ষিণে চলিলাম। দাদা কহিলেন, এইটী ধনির* পিত্রালয়। আমরা ধনির উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম। আর একটু চলিয়া দাদা একটী ময়রার দোকানে বসিলেন। শুনিলাম, ধনি এইখান হইতে খাবার কিনিয়া তাঁহার প্রাণের গদাইকে

* শ্রীরামকৃষ্ণের ভিক্ষামাতা।

খাইতে দিতেন। এইখানে বসিয়া শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুপ্ত (ইনি গ্রামস্থ বৈদ্য) মহাশয়সহ আলাপ পরিচয় হইল। ইনি তান্ত্রিক উপাসক। পরদিন প্রভাতে তাঁহার বাটীতে যাইবার জন্য আমাদিগকে বলিলেন; আমারাও স্বীকৃত হইয়া তথা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ধীরে ধীরে ঠাকুরের বাটীপানে চলিয়া আসিলাম। দাদা ভিতরে গেলেন এবং ক্ষণপরে আমাদিগকে প্রসাদ পাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। আমরা সকলে যাইয়া প্রসাদ পাইতে বসিলাম। আজ ঠাকুরের গৃহে বসিয়া প্রসাদ পাইতেছি, সকলের কি শুভ আনন্দের দিন! আমাদের আনন্দের সহ আনন্দ মিলাইয়া আজ আকাশের চাঁদও কত হাসিতেছে। সে হাসির ছটায় চারিদিক আলোকিত ও পুলকিত হইয়াছে।

আহারান্তে আমরা আবার সকলে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। কিছু পরে দাদা আর একবার আসিয়া আমাদের তত্ত্ব লইয়া শয়ন করিতে বলিয়া নিজেও বিশ্রাম করিতে গেলেন। আমরাও সকলে শয়ন করিলাম। পথশ্রান্তে সকলেই সত্বর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

রাত্রি ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রাণের ভিতরে কেমন একটী আনন্দ বোধ হইতেছে, তাই আর শুইতে ভাল লাগিল না। আলো জ্বালিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি ১ম খণ্ড পাঠ করিতে বসিলাম। বিনোদও আমার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল। পুঁথিখানি আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করা হইল। প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ভোর হয় হয় হইয়াছে, তখন 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভাতী' নামক গানটী* গাহিতে লাগিলাম। গানটী শুনিয়া সকলেই উঠিয়া বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলেন। শেষ হইলে সকলেই বলিলেন—'আহা! বেশ গানটী!'

বিনয়েন্দ্র বাবু কহিলেন, ঠাকুর সম্বন্ধে আর একটী গান শোনান্। তখন বটুবাবু গাহিতে আরম্ভ করিলেন—

দুঃখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো ক'রে।
কেরে ওরে দিগম্বর, এসেছ কুটীর ঘরে॥
মরি মরি মুখ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয় সন্তাপহারী, সাধ ধরি হৃদিপরে॥
ভূতলে অতুল মণি, কে এলিরে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী, এসেছ কি সকাতরে॥

* ১৩১৪ সালের তত্ত্ব-মঞ্জরী পৌষ সংখ্যা দেখ।

ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণা মাথা, হাস কাঁদ কার তরে॥"

এই গীতটী ঠাকুরের জন্মোপলক্ষে ভক্তবর শ্রীগিরিশচন্দ্রের রচিত। ঠাকুরের জন্মভূমিতে বসিয়া এই গীত শুনিতে শুনিতে সকলেই হৃষ্ট হইয়া গানে যোগদান করিলেন। সকলের সমবেত সংগীতে সেই উষাকালে যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ হইয়াছিল, তাহা সাদায় কালি দিয়া অঙ্কিত করিবার সাধ্য নাই।

শিবুদাদা উঠিয়া আসিয়া বলিলেন—"বা! বা! খুব আনন্দ হচ্ছে।" ভক্তগণ 'ঠাকুরের দয়া' বলিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসাইলেন এবং ঠাকুরের প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন।

বেলা প্রায় ৬॥০টা, আমরা মুখ প্রক্ষালনাদির মানসে বহির্দ্দেশে গমন করিলাম। চতুর্দ্দিক সন্দর্শনে হৃদয়ে এক অপূর্ব্বভাব অধিকার করিল। তখন ভক্ত আপন মনে গাহিতে লাগিলেন—

এই ত সে লীলাস্থলী।
যথায় বালকবেশে শ্রীহরি করিলা কেলি॥
সেই খুদিরাম ধাম, কামারপুকুর গ্রাম,
রঘুবীর শোভে সম, কেন বাম বনমালী॥
সেই দেশ সেই ঠাঁই, তাহে ত না ভেদ পাই,
কালের প্রভাবে দেছে, আলোকে আঁধার ঢালি॥
প্রাণসখা, তব তরে, আজি হেথা আঁখি ঝরে,
চাহ ফিরে এ কাতরে, প্রাণ পদে দিনু ডালি॥
শুনেছি ডাকিলে এস, ডাকি নাথ, এসো বোসো,
হৃদি সিংহাসন মম, তব তরে আছে খালি॥

বহির্দ্দেশ হইতে আসিয়া আমরা আশুবাবু সহ সাক্ষাৎ মানসে চলিলাম। কামারপুকুরে (এই স্থানকে শ্রীপুর বলে) বড় হাট হইয়া থাকে, সেই হাটের জমির উপর দিয়া আমরা চলিলাম। আশুবাবুর একটি সাধন কুটীর আছে, তথায় যাইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তান্ত্রিক সাধক। এই সাধনা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত সদালাপে আমরা পরম সন্তুষ্ট হইয়া, ঠাকুরের বাটীতে ফিরিয়া আসি-

লাম এবং যৎকিঞ্চিৎ তথ্য সংগ্রহে চেষ্টা পাইলাম। যাহা পাইয়াছি, নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। (ক্রমশঃ)

আত্মশুদ্ধি।

এ জগতে ব্যবহার্য্য ও অব্যবহার্য্য যত বস্তু আছে, সমস্তই পবিত্র, সমস্তই অপবিত্র। যাহার আত্মশুদ্ধি হইয়াছে, যাহার মনের ময়লা দূরীভূত হইয়াছে, তাহার নিকটে জগতের সমগ্র দ্রব্যই পবিত্র, সমগ্র পদার্থই নির্ম্মল; আর যাহার অন্তর্চক্ষু অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছাদিত, তাহার নিকটে সমস্ত বস্তুই অপবিত্র, সমস্ত জিনিসই অশুদ্ধ।

শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই আত্মশুদ্ধি হয় না, যাহার হবার হয় তাহার আপনিই হয়। সংসারে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক মূর্খ ব্যক্তি পবিত্র প্রাণে যে পথে গমনাগমন করিতেছে, যে কার্য্য আচরণ করিতেছে, যে বস্তুর ব্যবহার করিতেছে, আবার অপর একজন শাস্ত্রপাঠী পণ্ডিত সে পথে চলিতে ফিরিতে, সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে, সে দ্রব্যের ব্যবহার করিতে কতই যে অপবিত্র ও ঘৃণা বোধ করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আত্মদর্শী ব্যক্তি কিছুতেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না।

কোন্ বস্তু ভাল, কোন্ বস্তু মন্দ, কোন্ বস্তু শুদ্ধ, কোন্ বস্তু অশুদ্ধ, ইহার মীমাংসা আজ পর্য্যন্তও কেহ করিয়া উঠিতে পারে নাই। যে বস্তুকে আমি অসৎ পদার্থ বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছি, অপর একজন সেই বস্তুকে সাদরে গ্রহণ করিতেছে। আজ এক শ্রেণীর সাধক যে সমস্ত বস্তুকে অমেধ্য অসেব্য অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন, সেই সমস্ত বস্তুকে, সেই পঞ্চমকারকে বীরাচারী শক্তিসাধক পরম পবিত্র জ্ঞানে তাহার দ্বারা সাধনা করিয়া স্বর্গের পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কার করিতেছেন, এই জন্যই মহাদেব কলির নিদান তন্ত্র-শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

"মলে মূত্রে যাতি দ্রব্যং দ্রব্যে যাতি মলং মূত্রং।
দ্রব্যশুদ্ধি কথং দেবি আত্মশুদ্ধিং সমাচরেৎ॥"

মল, মূত্র, কাশ, নিষ্ঠীবন প্রভৃতি কতকগুলি বস্তু অবশ্যই সাধারণের অবজ্ঞাপিত; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী আত্মদর্শী সাধক এই সমস্ত বস্তুর অনাদর করেন না। এ প্রকার সাধকও আছেন, যিনি সর্ব্বাঙ্গ শরীরে বিষ্ঠা মাখিয়া সাধনা

করিতে বিন্দুমাত্র কিন্তুবোধ করেন না। এই কথা শুনিয়া আজকালকার নব্যসভ্য শিক্ষাভিমানীগণ কুৎসিৎ ভাবে হাসিয়া উঠিবেন, কিন্তু ইহারা একটু চিন্তা করিবার অবসর পান না যে, যাহার চিত্ত শুদ্ধ শান্ত পরম পবিত্র ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানে রত, তিনি বিষ্ঠার গন্ধ উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাহার নিকটে বিষ্ঠা অপবিত্র বলিয়া অনুমিত হইতে পারে না। যাহার ইন্দ্রিয় নদনদীগণ অনন্ত ভগবৎ সাগরাভিমুখে প্রধাবিত, তাহার ইন্দ্রিয় সকল অন্য পথে ধাবিত হইতে পারে না। যাহার মনভ্রমর ব্রহ্মসুধা পানে প্রমত্ত, তাহার মন অন্য বস্তুর আস্বাদ লইতে পারে না। এ কি তোমার আমার মত অস্থিরচিত্ত যে, আতর গোলাপ ল্যাভেণ্ডারের গন্ধে কখন আমোদিত হইবে, আবার মলমূত্রাদির গন্ধে দারুণ ক্লেশ অনুভব করিবে! এ যে অটল অচল হিমাদ্রি সদৃশ চিরস্থির।

অগাধ সলিলে অবস্থিত পদ্মোপরি ভ্রমর যখন মধু পানে রত থাকে, তখন যদি ঝটিকা ও তরঙ্গ যুগপৎ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কি সে মধুপানে বিরত হইয়া উড্ডীয়মান হয়, না বিচলিত হয়!

সংসারে একাগ্রচিত্তে যে, যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সেই কার্য্যেই মন নিযুক্ত থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে কার্য্যের পরিসমাপ্তি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে কিছুতেই তাহার মন যায় না, বা যাইতেও পারেনা; এ কথা ধ্রুবসত্য।

কোন গ্রামে এক ব্যক্তি বাস করিত। তাহার পিতার কৃত কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহার দ্বারাই কোন কাজকর্ম্ম না করিয়া, কোনরূপে তাহার সংসার নির্ব্বাহ হইত। সংসারকর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম না করিয়া কেহই থাকিতে পারেনা, তাই পরের দোষ অন্বেষণ ও কুৎসা, তাহার কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইজন্য গ্রামের সমগ্র লোকই তাঁহার উপর বিরক্ত ছিল। সে মনে করিয়াছিল যে, তাঁহার দিন এইরূপেই কাটিয়া যাইবে কিন্তু তাহা কাটিল না, বিধাতা বাদী হইলেন, সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, অকস্মাৎ পত্নীবিয়োগ হইল। তাঁহার সংসারে সংসারভার গ্রহণ করিবার আর কেহই ছিল না; তাই পুনরায় দার পরিগ্রহ করিল। পত্নী লাভ হইল বটে, কিন্তু স্ত্রীটি অল্পবয়স্কা ছিল, তাই বাধ্য হইয়া কিছু দিনের জন্য তাহাকে পিত্রালয়ে রাখিতে হইল। এই সময়ে, স্ত্রী আবার না মরিয়া যায়, এই ভাবনায় সে অধীর হইয়া পড়িল। সদা সর্ব্বদা একাকী গৃহমধ্যে বসিয়া কেবল এই চিন্তাই করিত। পরনিন্দা, পর কুৎসা রটনা করার স্বভাব কোথায়

চলিয়া গেল। তাহার এইরূপ পরিবর্তন দেখিয়া, লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত 'কি হে! আর দেখিতে পাই না কেন?' তদুত্তরে সে বলিত যে, 'আজকাল আমার মন অন্য চিন্তায় মগ্ন আছে, তাই আর এখন আমি পরের ভাবনা ভাবিবার অবসর পাই না।'

মনুষ্যচিত্তও যখন এইরূপ অসত্য অনিত্য ভাবনা পরিহার করিয়া কেবল এক ভগবচ্চিন্তায় ভগবত্তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহার হৃদয় হইতে অসৎবুদ্ধি, অসৎ ভাবনা, অসৎ আলোচনার ইচ্ছা বিদূরিত হইয়া যায়। তখনই তাহার হৃদয় হইতে এটি সু, ওটি কু, এটি ভাল, ওটি মন্দ, এটি পবিত্র, ওটি অপবিত্র, এইরূপ বিচার মীমাংসার বাসনা তিরোহিত হইয়া যায়।

মানব! তুমি অন্য ভাবনা না ভাবিয়া ভাব যদি সেই সচ্চিদানন্দ গোবিন্দের শ্রীপদারবিন্দ, তোমার চক্ষুকে মরীচিকামুগ্ধ হরিণের ন্যায় বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না করিয়া, কর যদি সেই নবজলধর শ্যামসুন্দরের অপরূপরূপে, তোমার শ্রবণযুগলকে সামান্য অতি ঘৃণ্য অপবিত্র প্রেমের কথা না শুনাইয়া, শুনাও যদি সেই প্রেমময় হরির অনন্ত পবিত্র প্রেমের কথা, আর চিত্তকে সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া, কর যদি সেই সেবাপ্রসন্নের পরম পবিত্র সেবাকার্য্যে, তাহা হইলেই তোমার আত্মশুদ্ধি সজ্ঘটিত হইবে, তাহা হইলেই তোমার চিত্তের অপবিত্রতা অপসারিত হইবে, তাহা হইলেই তুমি জগতের সদসৎ প্রত্যেক বস্তুকে পরম পবিত্রভাবে, বিভুর বিভিন্ন প্রকার বিকাশ জ্ঞানে সাদরে গ্রহণ করিতে পারিবে। অন্তঃশুদ্ধি হইলে আর বিষ্ঠাপূর্ণ কুম্ভের গাত্র ধৌত করিয়া চন্দন লেপনের ন্যায়, স্নানাবগাহন, গাত্র, বস্ত্র ধৌত বা কুশাগ্রে গঙ্গাজল স্পর্শ প্রভৃতি বাহ্য পবিত্রতা বোধক কোন কার্য্যেরই আবশ্যক হইবে না। অন্তর্ম্মল জ্ঞানজলে বিধৌত হইলে স্নান প্রক্ষালনাদি বাহ্য সদাচার নিষ্প্রয়োজন বলিয়া অনুমিত হইবে। আত্মশুদ্ধিই ভগবৎ প্রাপ্তির মূল কারণ। পূতচিত্ত না হইলে বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ সমস্তই বিড়ম্বনামাত্র।

কোন গণ্ডগ্রামে একজন ভগবদ্ভক্ত রমণী বাস করিত। সে ভগবানকে পুত্ররূপে সেবা করিতে বড় ভালবাসিত, তাই প্রত্যহ সকালে সকালে শ্রীগোপাল আহার করিয়া গোষ্ঠে যাইবে, এই জ্ঞানে মাতোয়ারা হইয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করতঃ হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন না করিয়াই রন্ধনশালে প্রবেশ করতঃ সিদ্ধ পোড়া ভাত রান্ধিয়া ভগবানকে অর্পণ করিত।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেলে, সেই গ্রামবাসী কোন শাস্ত্রপাঠী পণ্ডিত পরম্পর লোক মুখে এই কথা শুনিয়া, ঐ রমণীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, তুমি ওরূপ অনাচার পূর্ব্বক ভগবানের সেবা করিও না, উহাতে পাপ হয়, শুদ্ধাচারে সেবা করিও। এই কথা শুনিয়া সেই রমণী বলিল, মহাশয়! আমি নারী জাতি, সহজে জ্ঞানহীন, তাই ওরূপে সেবা করি, আপনি নিষেধ করিলেন, আর করিব না।

পর দিবস শুদ্ধাচারে ভোগ পাক করিয়া ভগবানকে অর্পণ করিতে বেলা প্রায় দ্বি-প্রহর অতীত হইয়া গেল। ভগবানের আহার করিতে বিলম্ব হইল বলিয়া সেই রমণীর মনে বড়ই দুঃখ হইল, শ্রীগোপালের সেদিন আহার হইল না।

ভক্তসেবা-পরিতৃপ্ত ভগবান নিশিথকালে এক ব্রাহ্মণ বালকের রূপে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, নিদ্রিত ঐ বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতকে বলিতে লাগিলেন, রে অবিদ্যাচ্ছন্ন গ্রন্থাধ্যয়নকারিন! তোর জন্য আমি আজ আহার করিতে পারি নাই। আমি প্রত্যহ সকালে সকালে ঐ রমণীর নিকটে পরম সুখে আহার করিতাম, তুই কি নিমিত্ত তাহাতে বাধা হইলি? তুই কি জানিস না যে, বহিঃশুদ্ধি প্রকৃত শুদ্ধি নহে, অন্তঃশুদ্ধিই বাস্তবিক শুদ্ধি। তাহার বাহিরে অপবিত্র ভাব থাকিলেও হৃদয় অতি নির্ম্মল, পরম পবিত্র, তাই তাহার প্রদত্ত অন্ন আমি সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।" অদ্য আমায় ক্ষুধার জ্বালায় অতিশয় কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে, অতএব তুই সত্বর সেই রমণীর নিকটে গিয়া বলিয়া আয় যে, সে পূর্ব্বে আমাকে যেরূপে সেবা করিত, সেইরূপই করুক।

ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দর্শনান্তে আর কাল বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে গিয়া সেই রমণীকে ভগবানের আদেশ জানাইলেন, রমণীও ব্রাহ্মণের মুখে ভগবানের অনুগ্রহসূচক আদেশ অবগত হইয়া যারপরনাই আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

ধন্য, ধন্য, রমণী তুমি! আজ তোমার সেবায় ভগবান পরিতুষ্ট। তোমার মত শুচি অশুচি ঘুচিয়া গিয়া কবে আমার হৃদয় স্বচ্ছ সুনির্ম্মল হইবে, কবে আমার আত্মশুদ্ধি সঙ্ঘটিত হইবে যে, তোমার মত আমার সেবা না পাইয়া সেই সেবাপ্রসন্ন অভিভূত হইয়া পড়িবেন। হে দীনতারণ! এ দীনের কি সেদিন হইবে, প্রভু! যে দিন আমার হৃদয় হইতে সঙ্কীর্ণ ভাব তিরোহিত হইয়া যাইবে, যে দিন শুদ্ধাশুদ্ধি বুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, যে দিন উচ্চ নীচ উত্তম অধম ভাব বিনষ্ট হইয়া সমভাব সমদৃষ্টি জন্মিবে—

"বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকেষ্য পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

হে অন্তর্যামিন। তোমাকে যে প্রাণে চিনিতে পারে, তুমিও তাহাকে জানিতে পার। হে ভাবগ্রাহিণ! এ ভবে তোমাকে যে, কে কি ভাবে ভজনা করে, তাহা তুমিই বুঝিতে পার, তাহা ব্রহ্মতত্ত্বানভিজ্ঞ শাস্ত্রপাঠী পণ্ডিতের উপলব্ধি করিবার সাধ্য নাই—

"অধীত্য চতুরোবেদান সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্ব্বী পাকরসং যথা॥"

তবে দয়া করিয়া তুমি যাহাকে বুঝিবার অধিকার দাও সেই বুঝিতে পারে, বুঝিতে পারে, আর প্রাণ ভরিয়া হৃদয় খুলিয়া মনের আনন্দে গাহিতে থাকে—

(হৃদে) হরির চরণ যে করে ধারণ, (কভু) শাস্ত্রের শাসন সে কি মানেরে।
সে ত, বেদবিধিপার, হয়ে অনিবার, হরিনাম সার শুধু করেরে॥
মরু কি উদ্যান, গৃহ কি শ্মশান, তার নিকটে ত সকলি সমান।
সে ত সুস্থলে কুস্থলে, বসি কুতূহলে, (সদা) ভাবে নীলকমলে হৃদিমন্দিরে॥
ভবে তার অন্তর শুদ্ধ নিরন্তর, অশুচিভাব তায় সদা রয় অন্তর,
দেখে, মেলি দিব্যনেত্র, সকলি পবিত্র, সে ত, ভবে অপবিত্র কিছু না হেরে॥

তার ত নাহি আর ভবের বিকার,
(তার) নির্ব্বিকার চিতে (করে) শ্রীকৃষ্ণবিহার,
(তাই সে) বিষ্ঠা কি চন্দনে, চণ্ডাল কি ব্রাহ্মণে,
সকলেরি মাঝে শ্রীকৃষ্ণেরে হেরে॥

শ্রীকান্তিবর ভট্টাচার্য্য।

বাহ্য-ধর্ম্মভাব।

আমরা যখনই যে ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিনা কেন, বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে, সকল কার্য্যের মূলেই বাহ্য-ধর্ম্মভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এরূপ ধর্ম্মভাবটী যেন আমাদের নিকটে বড়ই প্রীতিকর, বড়ই প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এটা আমরা ভ্রমেও একবার হৃদয়ে স্থান দেই না যে, এরূপ বাহ্যভাবের পরিপোষকতায় ও প্রশ্রয়ে, প্রকৃত, পবিত্র ধর্ম্মভাব হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে দিন দিন বিলুপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। বাহ্য-ধর্ম্মভাব

প্রদর্শন করা, আর ভাবের ঘরে চুরি করা, একই কথা। বুঝিতেছি না, যে, যতই আমরা ভাবের ঘরে চুরি করিতেছি, ততই আমরা যাহা খাঁটি, যাহা আসল, যাহা চিরন্তন সত্য, তাহা হারাইয়া বসিতেছি। যাহা প্রকৃত, যাহা শাশ্বত, তাহা হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছি। বুঝিতেছি না যে, সত্য সনাতন ধর্ম্মভাবের বিপর্য্যয়ে আমাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে দিন দিন ধর্ম্মভাণের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে। সত্য সরলতা পরিবর্জ্জন করিয়া কপটতার আপাতঃ মধুর স্নিগ্ধক্রোড়ে আশ্রয় লইতেছি।

বাহ্য-ধর্ম্মাডম্বর অনুষ্ঠান করিতে করিতে পরিশেষে নীচ, নিকৃষ্ট ভাণ্ডামি আসিয়া উপস্থিত হয়। ভণ্ডে আর চোরে কি পার্থক্য, কি বিভিন্নতা? বরং চোর ভাল, ত ভণ্ড ভাল নহে; কেন না, চোর সামান্য, পার্থিব, অস্থায়ী, অনিত্য ধনাগারে সিঁধ কাটিতেছে; আর ভণ্ড পারত্রিক, অপার্থিব, নিত্য সত্য ধর্ম্মভাবের ঘরে চুরি করিতেছে। চোরের দণ্ড এ সংসারে এক বৎসর, কি দুই বৎসর সশ্রম কারাবাস; কিন্তু ভণ্ড যে, বকসদৃশ পরম ধার্ম্মিক যে, তাহাকে ইহলোক, পরলোক, এজন্ম, পরজন্ম, না জানি কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া কঠিন কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

আমরা এইরূপ ভণ্ডামির প্রশ্রয় দিয়া, ক্রমে অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িতেছি, জীবন পথে স্বহস্তে বিষবৃক্ষ রোপণ করিতেছি, ভাবিতেছিনা যে, পরিণামে ইহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে।

অধুনা প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ভিতরেই যেন শুধু বাহ্য-ধর্ম্মভাবের পরিস্ফূরণ পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুর শাক্তসম্প্রদায়ে প্রবেশ কর, দেখিতে পাইবে তাহাদের মধ্যে বহুজনে জগন্মাতার ক্রোড়াশ্রয় উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া পঞ্চ-মকার সাধনার ছলে, কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনায়, অতি জঘন্য, ঘৃণিত কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া নির্ম্মল, বিশুদ্ধ সাধন পথ কলুষিত করিতেছেন। তাঁহাদের বাহ্যভাব দেখিলে কে বলিবে যে, তাঁহারা এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ, পাপাচারের অনুষ্ঠান করিয়া নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মপথ কলঙ্কিত করিতেছেন? পরিধানে গৈরিক বসন পরিহিত, বক্ষঃস্থলে রুদ্রাক্ষমালা দোদুল্যমান, ভালে ত্রিপুণ্ডরীক বিরাজিত, বহিরঙ্গ এইরূপ ধর্ম্মভূষণে বিভূষিত, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে কুপ্রবৃত্তির হুতাশন, দারুণ পাপবৃত্তির অনল সর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত।

আবার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভিতরে প্রবেশ করিলেও দেখা যায়— অনধিকারীর হাতে পড়িয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম কতদূর বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাহারা এধর্ম্মের প্রকৃতভাব আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, এরূপ বৈষ্ণবগণ নিয়ত অসংযতচিত্তে, হীন, অপকৃষ্টবৃত্তি নিচয়ের সেবা করিয়া, পক্ষান্তরে জনসমাজে নিজেদের পরম বৈষ্ণব, পরম বৈরাগী বলিয়া পরিচয় দিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের পরম পবিত্র নিষ্কাম ধর্ম্মের মর্য্যাদা হানি করিতেছেন। যে পরম বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপাদান নিষ্কপটতা, নিঃস্বার্থপরতা, নিষ্কাম, অনাসক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম, সেই ধর্ম্ম এখন সমাজ-তাড়িত, নিকৃষ্ট নিন্দিত ব্যক্তির কুরুচিপূর্ণ ঘৃণিত কার্য্যে প্রশ্রয় দিবার যেন একটী আড্ডাস্থল বা আশ্রয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ কাল অধিকাংশ ভেকধারী বৈষ্ণবগণের মন কামিনীর কোল এবং মৎস্যের ঝোল সম্ভোগ-সুখে, আর মাত্র জীবিকার্জ্জন বা ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য 'বোল হরি বোল' তাহাদের মুখে। হরিবোলের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য ত কই, বড় চক্ষে পড়েনা! অঙ্গ তিলক-ছাপায় চিত্রিত, শিরোদেশ মুণ্ডিত, কণ্ঠদেশ তুলসী মালায় পরিশোভিত, কটিদেশ ডোর কৌপিন পরিবেষ্টিত, এইরূপ বহির্দ্দেহে বৈরাগ্য লক্ষণাক্রান্ত বৈরাগী লইয়া কি হইবে, যদি অন্তর পূর্ণ মূর্ত্তিমতী আসক্তির আবাসস্থল হয়? বাহিরে ত্যাগের লক্ষণ, অন্তরে কামিনী-কাঞ্চন; বাহিরে সংসার-বিরাগভাব, অন্তরে সংসারানুরাগ, এ অতি ভয়ানক! বাস্তবিক যাহার অন্তর হইতে কামিনী-কাঞ্চন আসক্তি দূরীভূত হয় নাই, যাহার প্রাণে বৈরাগ্যভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যাহার মনে সংযমের কৌপিন আঁটা নাই, তাহার বাহিরে কৌপিন পরিধান বিফল, তাহার ভেক লওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাই সাধক হরিনাথ গাহিয়াছেন,—

"মনে না বিবেক হ'লে, ভেক লইলে, কেবল রে তার বিড়ম্বনা।
মনে তোর টাকা কড়ি, কোঠা বাড়ী, কিসে হবে সেই ভাবনা;
বাহিরে তিলক ঝোলা, জপের মালা, দেখে ত ভাই সে ভুলবেনা।
বাহিরে মোড়া মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, মনের মধ্যে কুবাসনা;
তাইত রে, মাগীর তরে, ভিক্ষা ক'রে, বেড়াও, আসল ঠিক থাকেনা।
কাঙ্গাল কয় কুবাসনা, মনের মাঝে থাকলে না হয় উপাসনা;
যদি বৈরাগী হ'তে, ইচ্ছা তবে, ছাই কর ভাই কুবাসনা।"

হায়, হায়, শাক্ত, শৈব সৌর, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি যে কোনও সম্প্রদায়ের দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই সম্প্রদায়ের ভিতরেই বাহ্য ধর্ম্মাড়ম্বরের জাজ্বল্যভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে সাজসজ্জা পরিধান করিলে,

লোকে পরম ধার্ম্মিক সাধুপুরুষ বলিয়া মনে করে, যে ধর্ম্মভূষায় ভূষিত হইলে লোকে মস্তক অবনত করে, সেই সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া, সেই ধর্ম্মভূষায় ভূষিত হইয়া, বাহ্য-ধর্ম্মাবরণের অভ্যন্তরে দুরভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, লঙ্কাধিপতি দশানন রাবণের মত লোককে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা করার ন্যায় অন্যায়, গর্হিত কর্ম্ম এ সংসারে আর কি হইতে পারে।

বাহ্য-ধর্ম্ম-সাজসজ্জা, বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান যে সম্পূর্ণভাবে আমাদের পরিবর্জ্জন করিতে হইবে, এমন কথা আমরা বলিনা, কারণ, দেহের পবিত্রতা মনের পবিত্রতা আনয়ন করে (Purity of body induces purity of mind.) কিন্তু যে ধর্ম্মভাব শুধু লোক দেখান, সে ধর্ম্মভাব আমরা চাহিনা। যে ধর্ম্মভাব কেবল বাহিরের, যে ধর্ম্মভাব শুধু লোককে প্রতারিত করিবার জন্য, সে ধর্ম্মভাব আমরা চাহিনা। আমরা চাই, সেই ধর্ম্মভাব, সেই সাজসজ্জা, যাহাতে আমাদের সবাহ্যাভ্যন্তর শুচি হইতে পারে। তাই, যাহা বাহিরের জিনিস, যাহা বাহিরের চাকচিক্য, তাহা লইয়া আর কাজ কি? যাহা গিল্টি করা, তাহাতে আর প্রয়োজন কি? যাহা নকল, যাহা মেকী, তাহা লইয়া আর বৃথা টানাটানি কেন? কপটতা, ভাণ, ভণ্ডামি, ছল, চাতুরী প্রভৃতি কুআবর্জ্জনা পূর্ণ করিয়া অন্তর আর অপবিত্র, কলুষিত করিও না। মনে রাখিও—হৃদয় ভগবানের মন্দির, যিনি ভগবানের মন্দির অপবিত্র—কলুষিত করিবেন, তাঁহার বিনাশ অনিবার্য্য, তাঁহার ধ্বংস সুনিশ্চিত, তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। ঐ শুন সেণ্টপল্ কি বলিতেছেন—"Know ye not, that ye are the temple of God; and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are." বাইবেলের এই অমৃতময় উপদেশটী সর্ব্বদা স্মৃতিপথে রাখিলে, আর কোন প্রকারের অপবিত্রতা হৃদয়ে স্থান পাইবেনা; হৃদয় প্রকৃতই ভগবানের মন্দির বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলে, মন আর কখন কোনপ্রকারে ভণ্ডামি, ধর্ম্মভাণেচ্ছা, কপটতা, চতুরতার কুহকমন্ত্রে আকৃষ্ট বা প্রলুব্ধ হইবে না।

শ্রীজগদীশচন্দ্র সান্যাল।

নববর্ষ।

ঊষার রঞ্জিত রাগ জানায় যেমতি,
ত্বরায় কমলবঁধু উঠিবে গগনে
গোধূলি যেমতি বলে কুমুদিনী পতি,
এখনি উদিত হয়ে হাসাবে ভুবনে;

তেমতি হে বিশ্ববাসি! বৈশাখ প্রথমে,
জানায় গো মানবেরে নববর্ষ কথা।
আশার আলোক পেয়ে সবে ফুল্ল মনে,
অধরে মধুর হাসে, দেখি এই প্রথা।

নবীন উদ্যমে আজি হে ভ্রান্ত-মানব!
জীবন কর্ত্তব্যপথে হও আগুয়ান;
নমি গো দেবতা পদে ভুলি গো পূরব,
সাধিতে আপন হিত কর প্রাণধান।

হে মানব! এতদিন বৃথায় কেটেছে,
কখন গো ভাব নাই আপন কল্যাণ;
কখন ত দেখ নাই কি দশা হয়েছে—
আপন অন্তর তব শ্মশান সমান!

যাঁহার কৃপায় তব জীবন ধারণ,
যাঁর দয়াগুণে তুমি ধনী, মানী, জ্ঞানী;
যাঁহার বলেতে তুমি এত বলীয়ান,
মন মাঝে তাঁরে কি গো রাখিবে না তুমি?

তাঁর প্রীতি যাহে জীব, সেই কাজ কর,
'জয় জগদীশ' বলি হও আগুয়ান;
কাটায়ে সংসার মায়া হও অগ্রসর,
তাঁহারে পাবার তরে দৃঢ় কর প্রাণ॥

আজি এই শুভদিনে বর্ষের প্রথমে,
জীবনে পবিত্র-কল্প কর ওহে নর!
শুদ্ধ মন মতি লয়ে বাসনা-সংগ্রামে,
স্মরি দেবদেবে আজি হও অগ্রসর।

বিগত কালের কথা বিস্মৃতির জলে,
বিসর্জ্জিয়া দেহ, কর নবীন উদ্যম,
কল্পতরু শ্রীহরির করুণার বলে,
ইষ্টলাভ হবে, পাবে পুলক পরম॥

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

সমালোচনা।

রঘুবংশ। নোয়াখালির সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

কবিতা সকল দেশে এবং সকল সময়েই মনের আনন্দদায়ক। বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ কাব্যের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় তেমন উঠে নাই। ইহার কারণ,—সংস্কৃত ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন যাঁহাদের হস্তে হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা আজীবন এক মনে বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিয়া বীণাপাণিরই আরাধনায় তৎপর ছিলেন। এই সংস্কৃত ভাষার বিচিত্র ইতিহাসে কবিবর কালিদাসের নাম প্রসিদ্ধ। তাঁহার ছন্দবন্ধ, ভাব ও ভাষা সকলই মনোহর। অধিকন্তু তাঁহার কাব্যে জটিলতা কিছুই নাই। নানা শাস্ত্রে পারদর্শী, মানব ও বাহ্য প্রকৃতির গূঢ় রহস্যজ্ঞ, কল্পনাশক্তির লীলাভূমি, বচনমাধুর্য্যে অদ্বিতীয়, অলঙ্কারে সুপাণ্ডিত, রসরাজ কালিদাসকে যিনি চিনেন না, তাঁহার বস্তুতই অনেক জ্ঞাতব্য আছে।

রঘুবংশ সেই কালিদাসের একখানি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য। স্বভাব-কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস মহোদয় সেই রঘুবংশের যে অপূর্ব্ব পদ্যানুবাদ লিখিয়াছেন তাহা সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ বঙ্গবাসী মাত্রেরই আদরের ধন এবং তজ্জন্য সমগ্র বঙ্গবাসী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। অনুবাদখানি অনেক স্থলে মূলের প্রতিবিম্ব। ইহার ভাষা সুবোধ অথচ পরিমার্জ্জিত এবং পদ্যও সুশ্রাব্য। ইহার সহিত যে সকল টীকাদি বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহাও তাঁহার চিন্তাশীলতা এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট প্রমাণ। নবীনবাবু সুকবি—সুকবি ব্যতীত কাব্যের এরূপ অনুবাদ কখনই সম্ভবে না। ফলতঃ এরূপ কবিতাকুসুমে বঙ্গীয় সাহিত্যকুঞ্জ দিব্য শোভা ধারণ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ সাল।

ত্রয়োদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪ পৃষ্ঠার পর)

৪৬৯। যার যাতে সত্ত্বা থাকে, তার তাতে টানও থাকে। যে ঠিক শৈব, সে শিবের সত্ত্বা পায়। কিছু কণা তার ভিতর এসে পড়ে। যে ঠিক বৈষ্ণব, তার নারায়ণের সত্ত্বা ভিতরে আসে।

৪৭০। বড় বড় দোকানে চালের বড় বড় ঠেক্ থাকে। ঘরের চাল পর্য্যন্ত উঁচু। চাল্ থাকে, দালও থাকে। কিন্তু পাছে ইঁদুরে খায়, তাই দোকানদার কুলোয় করে খই মুড়কী রেখে দেয়। মিষ্টও লাগে, আর সোঁধা সোঁধা গন্ধ। তাই যত ইঁদুর সেই কুলোতে গিয়ে পড়ে, বড় বড় ঠেকের সন্ধান পায় না। জীব কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হয়! ঈশ্বরের খবর পায়না।

৪৭১। যেখানে উজ্‌ঝিতা ভক্তি, সেইখানে ভগবান নিশ্চয়ই আছেন। উজ্‌ঝিতা ভক্তিতে হাসে কাঁদে নাচে গায়। যদি কারুর এরূপ ভক্তি হয়, নিশ্চয় জেনো ঈশ্বর সেথায় স্বয়ং বর্ত্তমান।

৪৭২। বিষয়ী লোকদের কোনও পদার্থ নাই। যেন গোবরের ঝোড়া। বিষয়ী লোক দেখলেই খোসামুদে এসে জুটে। মরা গরু একটা পেলে যত শকুনি সেখানে এসে পড়ে। খোসামুদেরা এসে বলে, 'আপনি দানী, জ্ঞানী, ধ্যানী।' বলা ত নয়;—অমনি বাঁশ।

৪৭৩। সংসারী লোকগুলা তিনজনের দাস, তাদের কি পদার্থ থাকে? মেগের দাস, টাকার দাস, মনিবের দাস।

৪৭৪। ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন দাও। তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়। আগে তিনি, তারপর দয়া, পরোপকার, জগতের উপকার, জীব উদ্ধার।

৪৭৫। কলিযুগে অন্য প্রকার দৈববাণী হয় না, তবে আছে, বালক কি পাগল, এদের মুখ দিয়ে তিনি কথা কন।

৪৭৬। মানুষ গুরু হতে পাবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। মহাপাতক, অনেক দিনের পাতক, অনেক দিনের অজ্ঞান, তাঁর কৃপা হলে একক্ষণে পালিয়ে যায়।

৪৭৭। মানুষ কি করবে! মানুষ অনেক কথা বলে দিতে পারে, কিন্তু শেষে সব ঈশ্বরের হাত। উকিল বলে,—আমি যা বলবার, সব বলেছি, এখন হাকিমের হাত।'

৪৭৮। ভক্তের জন্য অবতার, জ্ঞানীর জন্য নয়।

৪৭৯। প্রেম মানে ঈশ্বরেতে এমন ভালবাসা যে, জগৎ তো ভুল হয়ে যাবে, আবার নিজের দেহ, যা এত প্রিয়, তা পর্য্যন্তও ভুল হয়ে যাবে।

৪৮০। প্রেম চারি প্রকার। একাঙ্গী—অর্থাৎ ভালবাসা এক দিক থেকে, যেমন জল হাঁসকে চায় না, কিন্তু হাঁস জলকে ভালবাসে। সাধারণী প্রেম—নিজের সুখ চায়, তুমি সুখী হও আর না হও, যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব। সমঞ্জসা প্রেম—আমারও সুখ হোক, তোমারও সুখ হোক্। সকলের উচ্চ অবস্থা সমর্থা প্রেম—তুমি সুখে থাক, আমার যাই হোক। যেমন শ্রীমতীর,—কৃষ্ণসুখে সুখী।

৪৮১। ঠিক জ্ঞান হলে—সমাধিস্থ হলে জীবের অহঙ্কার থাকেনা। ঠিক দুপুর বেলায় যখন সূর্য্য ঠিক মাথার উপরে উঠে, তখন তার নীচেয় দাঁড়ালে আর ছায়া দেখা যায় না।

৪৮২। জ্ঞানীর ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের ঈশ্বর রসময়।

৪৮৩। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন কিন্তু কোনও কোনও স্থলে বেশী প্রকাশ। যেমন সূর্য্যের রশ্মি মাটিতে এক রকম পড়ে, গাছে এক রকম পড়ে, আবার আর্শিতে আর এক রকম। আর্শিতে কিছু বেশী প্রকাশ।

৪৮৪। ভক্ত তিন রকম। অধম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, আর উত্তম ভক্ত। অধম ভক্ত বল, ঐ ঈশ্বর। তারা বলে সৃষ্টি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা। মধ্যম

ভক্ত বলে, ঈশ্বর অন্তর্যামী। তিনি হৃদয় মধ্যে আছেন। সে হৃদয় মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে। উত্তম ভক্ত দেখে, তিনি এই সব হয়েছেন*। তিনিই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। সে দেখে, ঈশ্বর অধোউর্দ্ধে পরিপূর্ণ।

৪৮৫। অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে কর্ম্ম করলে, আর সব মিথ্যা জেনে জ্ঞানের পর সংসারে থাকলে, ঠিক ঈশ্বর লাভ হয়।

৪৮৬। সংসারী-জ্ঞানী কি রকম জান? যেমন সারসীর ঘরে কেউ আছে—সে ভিতর বার দুইই দেখতে পায়।

৪৮৭। অনেকে টাকা গায়ের রক্ত মনে করে, কিন্তু টাকাকে বেশী যত্ন করলে, একদিন হয়ত সব বেরিয়ে যায়। যারা খুব যত্ন করে মাঠের চারিদিকে আল্ দেয়, তাদের আল্ জলের তোড়ে ভেঙ্গে যায়। যারা একদিক খুলে ঘাসের চাপড়া দিয়ে রাখে, তাদের কেমন পলি পড়ে, কত ধান হয়! যারা টাকার সদ্ব্যবহার করে, ঠাকুর সেবা করে, দান করে, তাদেরই কাজ হয়। তাদেরই ফসল হয়।

৪৮৮। টাকাতে যদি কেউ বিস্তার সংসার করে, ঈশ্বরের সেবা—সাধু ভক্তের সেবা করে, তাতে দোষ নাই।

৪৮৯। যে বীরপুরুষ সে 'রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ'।

৪৯০। ভগবানেতে মন ঠিক রাখবে, পরিবারের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কইবে।

৪৯১। জড়ের সত্ত্বা চৈতন্য নয়, আবার চৈতন্যের সত্ত্বা জড় নয়, তাই শরীরে রোগ হলে বোধ হয় 'আমার' রোগ হয়েছে।

(ক্রমশঃ)।

রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য।

(পূর্ব্ব বর্ষের ২৩৮ পৃষ্ঠার পর)

ইষ্টনিষ্ঠা।

"সব্‌সে বসিয়ে সব্‌সে রসিয়ে সব্‌কা লিজিয়ে নাম।
হাঁজি হাঁজি কর্‌তে রহিয়ে বৈঠি আপনা ঠাম॥"

সুতীব্র ব্রহ্মচর্য্যের অব্যবহিত পরে ভক্তের প্রাণে ইষ্টনিষ্ঠার মলয়বায়ু সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ইষ্টনিষ্ঠাকে পরিচালন করিবার জন্য

একজন বিজ্ঞ নিয়ামকের প্রয়োজন। কারণ মানব প্রাণে একটা ভাব স্বতঃই উদিত হয়, যাহাতে সে আপনার যাবতীয় বস্তুর সমাদর করে এবং যাহা পরকীয় ভাবে, তাবতীয় বস্তুর হতাদর করিয়া থাকে। আমাদের সম্মুখে একদিকে প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ এবং হনুমানের ইষ্টনিষ্ঠা, অন্যদিকে ঘণ্টাকর্ণের মত গোঁড়ামীসর্ব্বস্ব মানবের ইষ্টনিষ্ঠা। প্রহ্লাদ বা অনিরুদ্ধ অপরাপর দেবদেবীর নিন্দা না করিয়া হরিনামের মালা জীবনের হার করিয়াছিলেন। পিশাচের ভয় প্রদর্শন, পিতা মাতার লাঞ্ছনা, মায়ার শত চেষ্টা তাঁহাদিগকে ইষ্টনিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। হনুমান বলিলেন, কমললোচন বৈদেহীবল্লভ রাম এবং গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ এক হইলেও আমি সেই বৈদেহীবল্লভ রামকেই চাই। ইহাকেই বলে যথার্থ ইষ্টনিষ্ঠা। ইহা নিষ্কলঙ্ক পবিত্র এবং প্রাণমনোস্পর্শী। আর সেই হরহরিতে ভেদদ্রষ্টা ঘণ্টাকর্ণের ইষ্টনিষ্ঠার যাথার্থ্য, তাহার প্রাপ্ত ফল হইতে বিচার্য্য। মানুষ এমনই ভ্রমের অধীন যে, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভগবানের বিভিন্ন মূর্ত্তি (Aspects) দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভগবানের সত্ত্বা স্বীকার করিয়া থাকে। বাস্তবিক তাহাদেরই দ্বারা এ সংসারে বহুবিধ কলহের সৃষ্টি হয়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বক্তৃতায় বার বার বলিয়াছেন যে, যাহার যে ভাব তাহা থাকুক, সে ভাবের উপর হস্তক্ষেপ করা তোমার উচিত নয়। তিনি বলিতেছেন, Do not disturb, but help every one to get higher and higher. অর্থাৎ বিরক্ত করিও না, কিন্তু প্রত্যেক লোককে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে যাইতে সহায়তা কর। আমার মনে হয়, এই ইষ্টনিষ্ঠা লইয়া আমাদের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল, লোকপাবন সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বেতা রামকৃষ্ণ তাহা ভঞ্জন করিবার জন্য এ সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সত্য বলিতে কি, আমি কোনো একপন্থী বৈষ্ণবের নিকট অপর পন্থী বৈষ্ণবের নামোল্লেখ করিয়া এমনই কর্কশ কথা শুনিয়াছি, যাহা স্মৃতিপথ হইতে কখনও লোপ হইবার নহে। হিন্দুতে মুসলমানে, হিন্দুতে খৃষ্টানেতে, বৌদ্ধতে হিন্দুতে কলহের কথা দূরে থাকুক, এক এক ধর্ম্মনিঃসৃত অসংখ্য শাখা প্রশাখার মধ্যে এমনই বিবাদ রহিয়াছে, যাহার বিষয় চিন্তা করিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সাকারবাদী নিরাকারবাদীকে উপহাস করেন। নিরাকারবাদী সাকারবাদীকে হেয়জ্ঞান করেন। এই বিবাদ মিটাইবার জন্যই রামকৃষ্ণদেব সেই অন্ধদিগের দ্বারা পরীক্ষিত হস্তীর বিভিন্নরূপ বর্ণনার

গন্ধ, এবং গিরগিটীর গল্প বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, আমরা শুধু একটীর সন্ধান পাইতে না পাইতে অপর গুলিকে মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করি; তিনিই সাকার, তিনিই নিরাকার, আবার এর অতীত যদি কিছু থাকে তাহাও তিনি। তাঁহাকে ইতি করা যায় না। তিনি শান্ত নহেন, অনন্ত। সীমাবদ্ধ নহেন, অসীম।

যথার্থ ইষ্টনিষ্ঠার শিক্ষা প্রদান করিতে গিয়া রামকৃষ্ণদেব বলিতেন 'এক ঘরে চারি ভাই আছে। সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভায়ের স্ত্রী, সেই চারিজনাকে লজ্জা করে, সম্মান করে। কিন্তু সমস্ত ভালবাসাটুকু তাহার আপন স্বামীর উপর অর্পণ করে। তাই বলিয়া অন্যান্যদিগকে বিষচক্ষে দেখে না। আমাদিগকেও সেইরূপে ইষ্ট-ভজনা করিতে হইবে। আমার নিজের ইষ্টকে মান, সম্মান, ভালবাসা ইত্যাদি সকলই সমর্পণ করিব, কিন্তু তাই বলিয়া অন্যের ইষ্টের নিন্দা বা অপমান করিতে পারিব না।' জানা এককথা, কার্য্যে পরিণত করা অন্য কথা। রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য-প্রজার সঙ্গে অন্যের পার্থক্য এই যে, অন্যে জানিয়াও ক্বচিৎ কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকেন, কিন্তু এই ভাবটী প্রকৃতভাবে জীবন-দর্পণে প্রতিফলিত করিতে না পারিলে কাহাকেও রামকৃষ্ণ-ভাবের ভাবুক বলিতে লজ্জা বোধ হয়। কারণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসর্ব্বস্ব ভক্ত, প্রভুর সেই অমূল্য উক্তিটী মনে রাখিয়া থাকেন যে "জল, বারি, ওয়াটর্, একোয়া এবং পাণি, নামেতে বিভিন্ন হইলেও বস্তু এক। সেই রূপ ভগবানের কালী, কৃষ্ণ, যীশু, মহম্মদ ইত্যাদি বিভিন্ন নাম হইলেও তিনি এক।" তিনি আরও একটী সুন্দর কথা বলিতেন, "এই কালীবাটীতে আসিতে গেলে অনেক রাস্তা দিয়া আসিতে হয়। যে কোনো রাস্তা দিয়া আসিলে কালীর দর্শন পাওয়া যায়। সেইরূপে ভগবানের নিকট যাইবার পথ বহু। সব পথ সত্য। কোনোটাই মিথ্যা নহে।" এই উক্তি গুলির অবতারণার উদ্দেশ্য মহৎ—যাহাতে ইষ্টনিষ্ঠা উপার্জ্জনেচ্ছু সংসারের বহুবিধ তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া অপরের সঙ্গে কলহে কালাতিপাত না করিয়া নিজের গম্যস্থানে, নিজের ইষ্টদেবের নিকট পৌঁছিবার জন্য সমস্ত সময় ব্যয় করিতে পারেন।

এই পবিত্র ইষ্টনিষ্ঠা কি উপায়ে লাভ করিতে হয়, রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যে তাহার অনুসন্ধান কর। দেখিবে কেমন রামকৃষ্ণ-পুষ্পগুচ্ছে বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতি বিশিষ্ট ভক্তমধুকর নিজ নিজ স্থানে বসিয়া শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে মধুপান করিতেছেন। সকলেই সমভাবে পুষ্ট হইতেছেন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি

শ্রদ্ধাবান হইয়া ঐক্যসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছেন। এই ইষ্টনিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আবার বলিতেছি—কিছুদিন নিঃসঙ্গ হইয়া আপনার ভাবের তন্ময় ভাবুক হইতে হইবে। নিজেকে নবনী করিয়া তুলিতে হইবে। তদনন্তর এই সংসার-সমুদ্রে পড়িলে আর ডুবিবার ভয় নাই। রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়াছিলেন, তাই মনে করিয়া যেন কেহ এ সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতে না করিতে আপনাকে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় কার্য্যে ব্যাপৃত না করেন। রামকৃষ্ণ-প্রণোদিত ভাবাবলীর মধ্য হইতে একটী ভাব লইয়া তাহা আচরণ করিতে করিতে তাহাতে পূর্ণ ভাবুক হইলে তবে অন্য ভাবের কথা উপস্থাপন করা, নতুবা বিষম ভ্রমে পড়িতে হয়। এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, আমি নিজের পথের পথিক হইব, অন্য পথের নিন্দা করিব না। এইস্থলে ঠাকুরের অন্য একটী উক্তির মর্ম্ম মনে পড়ে। তিনি বলিতেন যে, ছাদে উঠিতে হইলে মই দিয়েই হোক্, রজ্জু দিয়েই হোক্, বা অন্য উপায়েই হোক্, ছাদে ওঠাই মুখ্য বিষয়; রজ্জু, মই ইত্যাদি গৌণ বিষয়; সেইরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে সেই ইষ্ট প্রাপ্তিটীই প্রাণ মন অধিকার করিয়া থাকা বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন মত বা বিভিন্ন ভাব—যাহার যেমন ভাল লাগে—সে তাহাই আশ্রয় করিবে। কিন্তু যেন লক্ষ্য থাকে যে, এই বিভিন্ন উপায়গুলি প্রয়োজনীয় হইলেও গৌণ, মুখ্য নহে। কারণ ইষ্টপ্রাপ্তি একমাত্র মুখ্য বস্তু।

কামিনীকাঞ্চনের বিচার।

"মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বং।
কালঃ নিমেষাৎ হরতি সর্ব্বং॥"

"It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the Kingdom of God."

Matt. XIX 24.

যখন প্রাণ ইষ্টনিষ্ঠায় সমুন্নত এবং সম্মার্জ্জিত হয়, যখন অন্য কোনো কোলাহল প্রাণকে ততটা ব্যস্ত সমস্ত করে না, যখন জীবনস্রোত আপনমার্গে স্বতঃ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে, কিছুদূর যাইয়া তাহাকে একটী বিষম বিঘ্নের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে হয়। সে বিঘ্নটী প্রশ্নরূপী। তখন প্রাণের গম্ভীরতম প্রদেশ হইতে এই প্রশ্নটী উঠে—কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ না করিলে কি ধর্ম্ম হয় না?

বর্ত্তমান কামিনীকাঞ্চন বলিতে কি বুঝায় তাহাই সর্ব্বাদৌ আলোচ্য। 'কামিনী' বলিলে পুরুষের পক্ষে যেমন রমণীজাতি, পুত্র পৌত্রাদি বুঝায়, স্ত্রীর পক্ষেও তেমনি পুরুষজাতি, পুত্র, পৌত্র, ভাই, বন্ধু ইত্যাদি বুঝাইয়া থাকে। 'কাঞ্চন' বলিলে উভয়ের পক্ষে টাকা কড়ি, গৃহ, সম্পত্তি ইত্যাদি বুঝাইয়া থাকে।

বাস্তবিক কামিনী ও কাঞ্চন ভগবৎ পথের অন্তরায় কিনা তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, এই পরিদৃশ্যমান সংসারের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। আমরা জানি, এ সংসারে কোনও বস্তু সমান সময়ে সমান স্থান অধিকার করিতে পারে না। ভগবান রামকৃষ্ণদেব এই কথাব প্রতি উদ্দেশ করিয়া বলিতেন, 'কাশীর যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, কলিকাতা ততদূরে পড়িয়া থাকে; কলিকাতার যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, কাশী তত দূরে পড়িতে থাকে।' কথাটীর ভাবার্থ এই যে, ভগবানের যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, কামিনীকাঞ্চন তত দূরে পড়িতে থাকে; কামিনীকাঞ্চনের যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ভগবান তত দূরে পড়িয়া থাকেন। এ কথাটী জলন্ত সত্য। ইহার অপলাপ করিতে যাইয়া মানবকে শুধু অপদস্থ হইতে হয়। স্বামিজী তাঁহার কোনো বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন যে, আজকাল লোকে জনকের আদর্শানুকরণপ্রয়াসী হইয়া দিন কয়েকবাদে দুই তিনটি ছেলের 'জনক'রূপে পরিণত হইয়া থাকেন। বাস্তবিক আজকাল মন এতটা দুর্ব্বল যে, পিতা, মাতা, পরিবারের পরিচর্য্যা করিয়া, সমস্ত দিন অন্ন চিন্তায় ঘুরিয়া ভগবানের দিকে কতটুকু মন থাকে, তাহা কেবল ভুক্তভোগী মাত্রেই বলিতে পারিবেন। রামকৃষ্ণদেব এই মর্ম্মে বলিতেন যে, বিবাহ করিবার পর স্ত্রীর দিকে আট আনা মন চলিয়া যায়, কাজ কর্ম্মে চারি আনা মন লাগে, পিতামাতাদির নিকট দুই তিন আনা পড়িয়া থাকে, বাকী দুই আনা মন যদি কেহ ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারে তো ভাগ্যের কথা। তিনি আরও বলিতেন "ছেলে হ'ল না, টাকা হ'ল না বলে লোকে এক ঘটী কাঁদে, ভগবানের জন্য কাঁদে কে যে ভগবান পায়না? যে ঠিক্ ঠিক্ চায়, সেই ঠিক্ ঠিক্ পায়।" এই সব দেখিয়া শুনিয়া সুধী শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করিলে, ধর্ম্মের প্রতিরোধক বস্তুগুলি বর্জ্জন করিতে না পারিলে, ভগবানের দর্শনলাভ সম্ভবপর নহে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, তবে কি সকলকে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিতে হইবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন—তবে সংসার চলিবে কিরূপে? প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, নিশ্চয়ই সকলকে কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এইটী প্রকৃত সত্য। তুমি এ সত্যের অপলাপ করিতে পারিবে না। যদি কর, তবে জানিতে হইবে যে, শাস্ত্র এবং মহাজনবাক্য তোমার নিকট মূল্যহীন। কিন্তু সে উচ্চতম সোপানে আরোহণ করা সময় সাপেক্ষ। সময় না হইলে ভোগসমাপ্তি না হইলে কেহ সংসার ত্যাগ করিতে পারিবেন না, বা তাহা করা উচিত নহে। ঘা শুকাইয়া গেলে মামড়ী আপনি খসিয়া পড়ে, সজোরে ছাড়াইতে যাইয়া রক্তপাত করিবার প্রয়োজন কি? স্বামিজী তাঁহার বক্তৃতার একস্থলে বলিয়াছেন,—'Renunciation is the first step of religion' অর্থাৎ "ত্যাগই ধর্ম্মের প্রথম সোপান।" বাস্তবিক 'ত্যাগ' বলিতে মনেই ত্যাগ বোঝায়। কিন্তু কার্য্য ও মন, অন্তর ও বাহির, এমনি দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ যে, দুর্ব্বল মানব কাজে অসার বিষয় ত্যাগ না করিলে মনে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। মনে যদি ত্যাগ সহজ হইত, তবে রঘুনাথ, সনাতন, শুকদেবাদি সংসার হইতে একেবারে পৃথক্ হইতেন না, আপনার অতুল ঐশ্বর্য্যে এবং অনুপম রূপবতী স্ত্রী সম্ভোগে জলাঞ্জলি দিতেন না। শ্রীচৈতন্যদেব যুবতী স্ত্রী, বৃদ্ধ পিতামাতা, ভাই বন্ধুদিগকে বৃথা শোকসাগরে নিমজ্জিত করিতেন না, জ্ঞানপ্রতিম শঙ্করাচার্য্য 'কা তব কান্তা' ইত্যাদি দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সংসারের অসারতা প্রতিপাদন করিতেন না, বা পতিত-পাবন, কাঙালঠাকুর ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের কামিনীকাঞ্চন স্পর্শে অঙ্গের বিকার উপস্থিত হইত না এবং তিনি দীনাতিদীন সাজিয়া রাশি রাশি ধন প্রাপ্তিলালসার মস্তকে পদাঘাত করিতেন না। যদি কেহ আপনাকে জ্ঞানীর আসনে বসাইয়া বলিতে চাহেন যে, তাঁহাদের সংসার ত্যাগের কারণ 'লোকশিক্ষা'; তিনি একবার আপনার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া পরমজ্ঞানী শঙ্করের সেই বজ্রনির্ঘোষে উচ্চারিত শ্লোক শ্রবণ করুন, যাহা সুধীর কর্ণে প্রতিক্ষণে বলিতেছে, "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।' দ্বিতীয় প্রশ্নের শ্রীরামকৃষ্ণপ্রদত্ত উত্তর এই যে, যিনি এ সংসার রচনা করিয়াছেন, সংসার চালাইবার ভার তাঁহার উপর। আমাদের তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ এরূপ অলীক প্রশ্নও সৃষ্টি করিয়া থাকেন যে, তবে ভগবানের কার্য্যের যে বাধা উৎপাদন করা হইল, ইহা কি পাপ নহে? ইহা কি নিরয়-গমনের বন্দোবস্ত নহে? ইহাদের উত্তরে দুইটী কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ, ছেলে উৎ-পাদন করা কি ভগবানের একমাত্র উদ্দেশ্য? সংসার যন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়া নিজেকে 'মনুষ্য' বলা হাস্যাস্পদ নহে কি? তবে যাঁহারা সংসার

করিয়াও জনকের মত নিজের মনুষ্যত্ব বাজায় রাখেন, আমরা তাঁহাদের নিকট নীরব। দ্বিতীয়তঃ যদি সংসার ত্যাগ করিয়া জ্ঞানী শঙ্কর, প্রেমিক গৌরাঙ্গ এবং দীনদয়াল রামকৃষ্ণ কোনো নরকে গমন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের পথানুসারী পথিক সগর্ব্বে বলিবেন, "হে ভগবান্, দয়াময় অন্তর্যামি, আমাকেও যেন সেই নরকে জন্মে জন্মে স্থান পাইতে হয়; তেমন 'নরক' ছাড়িয়া এ সংসারবাসীর কল্পিত স্বর্গে যেন আমাকে যাইতে না হয়।" যাহাই হোক্, সকলকেই সেই ত্যাগ-তরণীতে বসিয়া ভগবানের নিকট যাইতে হইবে। সুতরাং সময়ের অপেক্ষা করিতে হইবে। বৃথা কোলাহলে কোনও প্রয়োজন নাই। মুখে 'ত্যাগ' 'ত্যাগ' করিলে ত্যাগ আসে না। মনোবাক্যে যখন প্রেমবন্যা ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন মানব আপনি ত্যাগ স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়। তখন আর বিচার বিবেকের বড় আশ্রয় লইতে হয় না। অতএব জোর করিয়া কাহাকেও ত্যাগ করিতে হইবেনা।

কেহ কেহ শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করতঃ কামিনীর উপকারিতা দেখাইয়া বলিয়া থাকেন:—'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে তত্র রমন্তে দেবতাঃ।' কিন্তু সে নারী কোথায়? সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, মিরাবাই ইত্যাদি প্রেমময়ী নারী-মূর্ত্তি আজ কয়টা তুমি দেখিতে পাও? যে দিন ব্রহ্মচর্য্য এ দেশ হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে কামুক দম্পতির কামুক সন্তান ব্যতীত কয়জন প্রেমিক জন্মগ্রহণ করিয়াছে?—এ প্রশ্নের উত্তর পাঠক পাঠিকাগণই প্রদান করিতে পারিবেন। আজকাল 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'র যাথার্থ্য কয়জনে প্রতিফলিত হয়? কাজেই 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' একটু বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, টাকার মোহিনী শক্তি দুর্ব্বল মনকে এমনই ভাবে ভুলাইয়া দেয় যে, তদ্দ্বারা পরোপকার সাধন দূরে থাকুক, পরের অপকার সাধনই মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়। সেইরূপ কামিনীর মোহিনীশক্তি দুর্ব্বল মনে প্রেমসঞ্চার করিবে কি, তাহাতে কামেরই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে। এইরূপ কাম-ক্রীতদাসদিগকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র সুমধুর কণ্ঠে বলিতেছেন:—"অমেধপূর্ণে ক্রিমিজালসংকুলে, স্বভাবদুর্গন্ধি নিরন্তরান্তরে, কলেবরে মূত্র পুরীষভাসিতে, রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ।"

রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যে এই কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগভাবের পূর্ণোন্মেষ হইয়াছে। কত ভাগ্যবান্ এই কামিনীকাঞ্চন কণ্টকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? বাস্তবিক কামিনীকাঞ্চনত্যাগী

তেজস্বী ব্যক্তিই এ সংসার সাগরের সেতু নির্ম্মাণে সুনিপুণ। যে সেতুর উপর দিয়া লক্ষ লক্ষ লোক পার হইয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রভুর কামিনীকাঞ্চনবর্জ্জন-মন্ত্র দেশে দেশে বিঘোষিত করিতে লাগিলেন, সেই জ্বলন্ত সত্যানলে কত ভক্তপতঙ্গ আসিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। আজ তাঁহাদের সে নাম নাই, ধাম নাই, সে মন নাই। এখন সবই ভগবতোন্মুখী। সেবক রামচন্দ্রের কামিনীকাঞ্চনের প্রতি অশ্রুতপূর্ব্ব নির্লিপ্ত ভাবের কথা শুনিয়া কতই সংসারী জীব এক অপূর্ব্বভাবের ভাবুক হইয়াছেন, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেবক রামচন্দ্রের নিকট যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী এবং বন্ধুগণের ভিতর সেই রামকৃষ্ণের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া—তাহাদিগকে সেবা করা দ্বারা রামকৃষ্ণদেবের সেবা করা হইতেছে, এইভাবে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন। এইটী তাঁহাদের উচ্চাদর্শ। কাঞ্চনের যথাসাধ্য—ভগবানকে মায়া মিশাইয়া যেরূপ সেবাকরি, সেইরূপ সেবায় নবেদন করিতে শিখিয়াছেন। বাস্তবিক সংসারে থাকিতে হইলে একবার শ্রীরামকৃষ্ণ-গঠিত সেবক রামচন্দ্রের জীবনছবি হৃদয়পটে অঙ্কিত থাকা যারপরনাই বাঞ্ছনীয়।

প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং প্রকৃত সংসারীর চিত্র দেখিতে যদি বাসনা থাকে, একবার স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত কর্ম্মযোগে প্রদত্ত অতুলৈশ্বর্য্যসম্পন্না রাজকন্যা-লোভরহিত সন্ন্যাসী এবং স্বার্থত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, অনুপম অতিথিপরায়ণ বিহঙ্গম-পরিবারের ছবি মানসচক্ষে দর্শন করিলে যথেষ্ট হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন গুপ্ত।

পাওহারী বাবা।

(পূর্ব্ব বর্ষের ৮২ পৃষ্ঠার পর)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব নিয়মানুসারে পাওহারী বাবা প্রতি একাদশী তিথিতে এবং কোনও পর্ব্বদিন উপলক্ষে, আশ্রম কুটীরের দ্বারদেশে বসিয়া সাধারণের সহিত সদালাপ করিতেন। কিন্তু ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি সাধন-কুটীরের দ্বার একেবারে

খুলিতেন না। প্রতি একাদশীতিথিতে এবং পর্ব্বাহে জনসাধারণ তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন মানসে আসিয়া নিরাশ মনে ভগ্নচিত্তে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন, ক্রমে সাধারণের মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে, বোধ হয় বাবা দেহত্যাগ করিয়াছেন অথবা আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া কোনও অজ্ঞাত নির্জ্জন প্রদেশে যাইয়া ধ্যানপরায়ণ হইয়া দিনযাপন করিতেছেন। কিন্তু আশ্রমবাসী অপর সকলে সাধারণকে আশ্বাস দিয়া কহিতেন যে, বাবার জন্য তোমরা উৎকণ্ঠিত হইও না, তিনি আশ্রমকুটীরে নির্জ্জন সাধনে দিন যাপন করিতেছেন। এইরূপ চারি বৎসর অতিবাহিত করিয়া বাবা পুনরায় রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে থাকিয়া সকলের সহিত পূর্ব্বমত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন এবং দেশ-দেশান্তর হইতে সাধু মহাত্মাগণকে আহ্বান করিয়া একটী ভাণ্ডারা দিবার জন্য সেবকগণের নিকট প্রস্তাব করিলেন।

তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে সকলেই প্রাণপণে এবং বিশেষ আগ্রহের সহিত নিযুক্ত হইলেন। ভক্তিমান গ্রাম্য জমিদারগণ এবং নগরবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অনেকেই ঘৃত, ময়দা, চিনি প্রভৃতি এবং প্রচুর অর্থ সাহায্য করিলেন। গ্রামবাসীগণ ভাণ্ডারার ৪।৫ মাস পূর্ব্ব হইতে জিনিস পত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল, নগরে ঘৃত দুগ্ধ পাওয়া এক প্রকার দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল। গ্রাম্যলোকেরা আর দুগ্ধ বিক্রয় করিত না, ঘৃত প্রস্তুত করিয়া ভাণ্ডারার জন্য সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিল। যাহাদের গৃহে ঘৃত, দুগ্ধ ও শস্য ছিল, তাহারা সেই সকল আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল। যে সকল দরিদ্র নরনারী কোনও প্রকার দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া সাহায্য করিতে অক্ষম, তাহারা স্বীয় কায়িক পরিশ্রম দ্বারা বিবিধ প্রকার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। রমণীগণ সাধারণের প্রদত্ত গম, যব, জাঁতায় পেষণ করিয়া ময়দা প্রস্তুত করিয়া দিল, ছোলা, মটর, অরহর ইত্যাদি ঝাড়িয়া বাছিয়া দাউল ও বেসম আদি প্রস্তুত করিতে লাগিল; শ্রমজীবী পুরুষেরা যে যাহা পারে, বন কাটিয়া, কাঠ চেলা করিয়া, রাত্রি দিন আনন্দের ও উৎসাহের সহিত খাটিতে লাগিল, প্রায় ৭।৮টী গ্রামের লোক এইরূপে দুই মাস পরিশ্রম করিয়াছিল।

এই যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বিবিধ দ্রব্যের বিপণী বসিয়াছিল। দেশ দেশান্তর হইতে কত সাধু মহাত্মাগণ যে কুর্থাগ্রামে পদধূলি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক বিজ্ঞশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিবিধ প্রকারে ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা

করিয়া সাধুমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। পাওহারী বাবা কয়েক দিবস বসিয়া বসিয়া এই সমস্ত দর্শনে পরম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। প্রায় একমাসকাল এই আনন্দমেলা হইয়াছিল। যজ্ঞ শেষে পাওহারী বাবা সাধুগণের চরণধৌত করাইয়া সেই চরণামৃত গ্রহণ করেন এবং সকলকেই বস্ত্র, পুষ্পমালা প্রভৃতির দ্বারায় বরণ করেন। দূরতার তারতম্য অনুসারে সকলকেই পাথেয় দিয়া স্ব স্ব স্থানে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

পাওহারী বাবা আবার নির্জ্জন বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে দেবদেবীর পূজা উদ্দেশ্যে অনেক গুলি পুষ্পবৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না, সেবার্থ যাহার যাহা দিবার ইচ্ছা হইত, সে তাহা একটী নির্দ্দিষ্ট স্থলে রাখিয়া যাইত, পাওহারী বাবা মধ্য রাত্রে সেই সমস্ত গ্রহণ করিতেন।

একদিন কতকগুলি তস্কর সিঁধ কাটিয়া তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করে এবং তৈজস পত্রাদি অপহরণ করিয়া পালাইবার উদ্যোগ করে, এই সময়ে পাওহারী বাবা কোনও কার্য্যোপলক্ষে সেই গৃহে উপস্থিত হয়েন, তাঁহাকে দেখিয়া চৌরগণ পলায়নপর হয়, তখন তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন যে, "বাবা সকল! কৃপা করিয়া যদি কুটীরে দর্শন দিয়াছেন, তবে নিরাশ হইয়া ফিরিতে পারিবেন না, আপনাদের ইচ্ছামত দ্রব্য সকল গ্রহণ করিতেই হইবে; আপনারা রিক্তহস্তে ফিরিয়া গেলে দাসের অপরাধ হইবে।" তস্করগণ তখন মহা লজ্জায় পড়িল, তাঁহার সেই দেবমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দৈববাণী সদৃশ তদীয় আদেশ লঙ্ঘন করিতে কাহারও সাহস হইল না। অগত্যা জিনিস পত্র সহ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া আশ্রম দ্বারে সকল দ্রব্য রাখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

আর একবার জনৈক চোর মধ্যরাত্রে আসিয়া সাধুসেবার জন্য সঞ্চিত আটা, দাল, চুরী করিতেছিল, এমন সময়ে পাওহারী বাবা গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। তাঁহার শব্দ পাইয়াই চোর সেই মোট ফেলিয়া পলাইল। বাবা, সকল বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার প্রাণে তজ্জন্য আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, আমারই দোষে আজ এ ব্যক্তির আশাভঙ্গ হইল। তিনি কাতরতাময় মৃদুস্বরে তাহাকে ডাকিলেন, বলিলেন, "বাবা! তোমার গাটরী লইয়া যাও, আমাকে পাপে ডুবাইওনা, তোমার কোনও ভয় নাই।" সে চোর—তখন কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

প্রভাতে পাওহারী বাবা সেই চোরকে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। চোর রাত্রে বাবার ডাকে ফিরে নাই, কিন্তু এবার ফিরিল—চিরদিনের জন্য ফিরিল। চোর ভাবিল—"বাবা আমাকে কস্মিনকালেও দেখেন নাই, রাত্রের ঘন অন্ধকারেও দেখিতে পান নাই, আমার ঘর দ্বার পল্লী কখনও বাবার চক্ষে পড়ে নাই, অথচ তিনি কেমন করিয়া আমাকে চিনিলেন? কেমন করিয়া আমার বাড়ী ঘর বলিয়া দিলেন?" চোর আসিয়া বাবার পায়ে ধরিয়া কাঁদিল, তাহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইল, সে সাধু হইল।

একবার তিনি কুটীরের মধ্যে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে একটা ইন্দুর তাঁহার পিঠের উপরে আসিয়া পড়ে। ইন্দুরের পশ্চাতে একটী সর্প আক্রমণ করিতে করিতে আসিতেছিল, হঠাৎ ইন্দুর লাফাইয়া বাবার ক্রোড়ে পড়িল। তিনি সর্পের আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার জন্য স্বীয় অঙ্গাবরণ আলখেল্লা দ্বারা ইন্দুরকে আবৃত করিলেন, তখন সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার স্কন্ধদেশে দংশন করিল। প্রায় ২।৩ দিন পাওহারী বাবা সর্পঘাতে অচেতন হইয়াছিলেন। পরে চেতনা হইলে কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আশ্রমবাসীসকলকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন যে, "সাপ বাবার কোনও দোষ নাই, ইন্দুর বাবাকে দাস রক্ষা করিতে গিয়াছিল, সেইজন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ।)

ফকির লালন সাঁই।

ভগবানের এ বিশ্বসংসার-রাজ্যে, যাঁহার প্রাণে ভগবৎ প্রেম, যাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তিনিই মহান্, তিনিই সাধু, তিনিই ভগবানের প্রিয়। সামান্য লোকের অন্তরও যদি, দীনাতিদীন ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ব্যক্তির হৃদয়ও যদি ভগবদ্ভক্তিরসে সিক্ত হয়, ভগবৎপ্রেমে পরিপ্লুত হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই লোক, সেই ব্যক্তি, নীচকুলোদ্ভব হইলেও বিপ্রেন্দ্রমণি, সেই ব্যক্তি কুৎসিত হইলেও শ্রীমান, রূপবান, সেই ব্যক্তি সংসারী, গৃহী হইলেও সংসারবিরাগী যতি, সেই ব্যক্তি নিরক্ষর মূর্খ হইলেও মহা পণ্ডিত।

"অষ্টবিধা হ্যেষা ভক্তি র্যস্মিন্ ম্লেচ্ছোঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্র মুনিঃ শ্রীমান্, স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ॥"

ভগবদ্ভক্ত, ভগবৎ প্রেমিক ব্যক্তি জাতিভেদ মানেন না, বিদ্যা রূপ ধনের বিচার করেন না। তাঁহার চক্ষে ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রাজা হউক, ফকির হউক, মূর্খ হউক, পণ্ডিত হউক, ব্রাহ্মণ হউক, চণ্ডাল হউক, কুৎসিত হউক, শ্রীমান্ হউক, ক্রিয়াবান হউক, ক্রিয়াহীন হউক, ভক্তিমান হউক, ভক্তিহীন হউক, এ জগতে সকলেই সমান, সকলেই এক। তাঁহার নিকট এ বিশ্বের সকলেই বিশ্বনাথের সন্তান। তাঁহার জ্ঞান—এ বিশ্বসংসার বিশ্বগুরু বিশ্বেশ্বরের পরিবার।

"নাস্তি তেষু জাতিকুলবিদ্যারূপ কুলধন ক্রিয়াদি ভেদঃ।"

যিনি এ সংসার মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, জাতিকুলাতীত অকূলকাণ্ডারী অজাত ভগবানের চারু-চরণাম্বুজে সার করিয়াছেন, তাঁহার আবার জাতিকুল কিসের জন্য? যিনি মহাবিদ্যারূপিণী জগজ্জননীর সন্তান হইতে পারিয়াছেন, তিনি আবার অন্য বিদ্যার ধার কি ধারিবেন? যাঁহার হৃদয়মন্দির বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ভগবানের বিশ্ব মনোমোহন অপরূপ রূপের আলোকে আলোকিত, তাঁহার প্রাণে আবার অন্য কোন্ রূপ দর্শনের অভিলাষ জাগিবে? যাঁহার অন্তরের গভীরতম অন্তস্তলে মহারত্ন, মহামণি পরমার্থ-ধন সংরক্ষিত, তিনি অন্য ধনের, অন্য রত্নের, অন্য মণিমাণিক্যের কি অপেক্ষা রাখেন? যিনি অহর্নিশ অষ্টপ্রহর অবিশ্রাম হৃদয়ে পরমপুরুষ পরব্রহ্ম পরমাত্মার পূজা অর্চ্চনা করেন, তিনি আবার অন্য ক্রিয়ার কি অনুষ্ঠান করিবেন? ভগবদ্ভক্ত, ভগবৎ-প্রেমিক লালনও, বিদ্যা-রূপ-জাতিকুল-ক্রিয়াদি সমস্ত মহাবিদ্যারূপ সর্ব্বরূপাধার ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া, ভগবানের নামে—ভগবানের প্রেমে, ফকির সাজিয়াছিলেন। ভক্তের এ ফকিরত্বের, এ নীচতার কাছে, প্রেমিকের এ জাতিকুল-হীনতার, এ দীনতার নিকটে, জাতিকুল-গর্ব্বিত অতি উচ্চ মস্তকও কেমন যেন নত হইয়া পড়ে; অহঙ্কারে অর্থগরিমায় অতি স্ফীত বক্ষঃস্থলও কেমন যেন একটু নম্র দীনভাব, কেমন যেন একটু সঙ্কোচিতভাব ধারণ করে। ভগবদ্ভক্তের নিকট রাজা হউক, ধনী হউক, অহঙ্কারী হউক, পাণ্ডিত্যাভিমানী হউক, রূপবান হউক, ক্রিয়াবান হউক, সকলেই যেন সঙ্কুচিত, সকলেই যেন দীনভাবাপন্ন। ভক্তের ভক্তি-জ্যোতির কাছে, প্রেমিকের প্রেমপ্রভার নিকটে, এ সংসারের সকলই যেন নিষ্প্রভ, এ বিশ্বের সমস্তই যেন হীনজ্যোতি। রাজা অপেক্ষা, পণ্ডিত অপেক্ষা, রূপবান অপেক্ষা, ক্রিয়াবান অপেক্ষা, উচ্চ জাতি কুলশীলসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তের স্থান, ভগবৎ-প্রেমিকের আসন, অনেক

উচ্চে, অনেক উর্দ্ধে সংস্থাপিত। ভগবদ্ভক্তের জীবনী সুধার সদৃশ, সাধু মহাজনের চরিত অমৃতপ্রবাহের ন্যায়। এ সুধার কিঞ্চিৎ, এ অমৃতের অতি সামান্যও যিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা, ঐকান্তিক ভক্তির সহিত পান করিয়াছেন, তিনি ধন্য, তাঁহার জীবন সার্থক; তিনিই এ সংসার-মায়াবন্ধন মুক্ত হইতে সক্ষম; তিনিই ভগবানের অমৃতরাজ্যের খবর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই ভক্তের প্রাণে, ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।

সাধুর পবিত্র জীবনী স্মরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিলেও সাধুসহবাসের ফল লাভ করা যায়, সাধুর সুধাময় চরিত পাঠ করিলেও সাধুসঙ্গের ফল—পরম শান্তি, পরমানন্দ, ত্রিতাপসন্তপ্ত অশান্ত প্রাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই আমার সাধু-জীবনী, ভগবৎ ভক্তের জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার বড় বাসনা। তাই আমার সাধু মহাত্মার পবিত্র পদচিহ্ন অঙ্কিত করিবার বড়ই সাধ। কিন্তু সাধু-জীবনের প্রকৃত ঘটনাবলী, ভক্ত হৃদয়োদ্যানের ভাবকুসুমরাজি সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন, বড়ই শক্ত ব্যাপার। মহাপুরুষ মহাজনগণ, হৃদয়ের ভাব যাহার তাহার নিকট বড় একটা প্রকাশ করিতে চাহেন না। সাধুমহাত্মগণ হৃদয়নিহিত অমূল্য ধন অন্তর-জলধিস্থিত দুর্ল্লভ রত্ন গ্রাহক ভিন্ন যাহাকে তাহাকে বিলাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন না। সেইজন্যই বুঝি মহাত্মা লালন গাহিয়াছিলেন,—

খুলবে কেন সে ধন ও তার গ্রাহক বিনে।
মুকুতা মণি, রেখেছে ধনী,
ওরে বাঁধাই করে যে দোকানে॥
সাধু সদাগর যাঁরা, মালের মূল্য জানে তাঁরা,
মূল্য দিয়ে মূল—অমূল্য রতন,
সে ধন জেনে শুনে তাঁরাই কেনে।
মন! তোর গুণ জানা গেল, পিতল কিনে সোণা বল,
গুরু সিরাজ সাঁইর বচন, না বুঝে লালন,
মূল হারালি দিনে দিনে।

সত্য সত্যই ভগবৎ-প্রেমধনে ধনী যিনি, তিনি ভগবৎতত্ত্ব-মণিমুক্তা আপন নিভৃত অন্তররূপ দোকানে বাঁধাই করিয়া রাখেন; গ্রাহক ভিন্ন সে ধন, সে মণিমুক্তা অন্য কাহাকেও দেখান না। সাধু সদাগর যাঁরা, যাঁরা ভগবত্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, তাঁহারাই সে ধন, সে মণি মুক্তার গ্রাহক। তাঁহারাই

সে মালের প্রকৃত মূল্য জ্ঞাত। তাঁহারাই অন্তরের ঐকান্তিকতারূপ হৃদয়ের ব্যাকুলতারূপ যথোপযুক্ত মূল্য প্রদান করিয়া, সেই মাল, সেই মণিমুক্তা ধনীর নিকট হইতে গ্রহণ করেন। আর আমার মত কুজন, বিষয়ী ব্যবসায়ী সদাগর যাহারা, তাহারা সে মালের খবর পর্য্যন্ত রাখে না। তাহারা বাজে মাল, তাহারা চিরকাল পিতল কাঁসা কিনিয়া সোণা বলে। বাস্তবিক শুদ্ধমতি ব্যক্তি ব্যতীত অপর সাধারণে সাধুভক্তদিগকে চিনিয়া উঠিতে পারেন না।

প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত সাধুব্যক্তিগণ প্রায়ই সদাসর্ব্বদা আপনাকে গোপনে সাধারণের চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের অধিকাংশ ধর্ম্মময় পবিত্র জীবন নীরবে নির্জ্জনে প্রকৃতির নিভৃত পবিত্র শান্তি-ক্রোড়ে অতিবাহিত হয়। তাই সাধারণে সাধুমহাত্মাদিগের বড় একটা সন্ধান বড় একটা খবর প্রাপ্ত হন না। মহাত্মা লালনও তাঁহার অধিকাংশ জীবন অতি নির্জ্জন নিভৃত আশ্রমে ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাই অল্পলোকের নিকটেই তিনি পরিচিত, অল্প লোকেই তাঁহার জীবনের প্রকৃত ঘটনা অবগত আছেন। লালনের জীবনী সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্যগণের মুখে যতটুকু শুনিয়াছি, তাঁহার পার্শ্বস্থিত সেবকদিগের নিকট হইতে যাহা কিছু জানিতে, যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই লইয়া আজ আমি সাধারণের সমীপে সমুপস্থিত।

মহাত্মা লালন নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন কুমারখালী প্রান্ত-বাহিনী গৌরী নদীর পরপারে চাপড়া নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লী গ্রামে দীন দাসপরিবারে—কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শিশুকাল হইতেই তিনি নম্র, বিনয়ী ও শান্ত ছিলেন। গ্রামের পাঠশালে তিনি যৎকিঞ্চিৎ সামান্য কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। অতি সামান্য কিছু 'ক্ষেত খোলা', যৎকিঞ্চিৎ জোত-জমা ছিল, তাহাতেই কোন প্রকারে দুঃখে কষ্টে সংসার ও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। ঘরে আহার থাকুক বা না থাকুক, তজ্জন্য বাঙ্গালীর কখনও বিবাহ-কার্য্য বন্ধ থাকে না। লালনের পিতাও পুত্রবধূর মুখদর্শনজনিত পুণ্যলাভেচ্ছায় বাল্যকালেই লালনকে বিবাহ দেন। সে সময়ে লালনের বয়ঃক্রম ষোল বৎসর অতিক্রম করে নাই।

যখন লালনের বয়স, অনুমান ১৮ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে

সঙ্গে করিয়া, স্নানযাত্রা উপলক্ষে হিন্দুর প্রধান তীর্থ ৺ জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করেন। সে সময় তথায় যাত্রীর ভয়ানক ভিড় হওয়ায়, ভীষণ মহামারী উপস্থিত হয়। বহু লোকে অকালে কালকবলে পতিত হইতে লাগিল দেখিয়া, শেষে রোগাক্রান্ত হইলেই, বন্ধু বন্ধুকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, স্বামী পত্নীকে, পিতা পুত্রকে ফেলিয়া রাখিয়া, সন্ত্রস্ত হৃদয়ে পলাইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। বালক লালন তথায় দৈববিড়ম্বনায় ভীষণ বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। লীলাময় ভগবানের লীলা, ইচ্ছাময় পরমেশ্বরের ইচ্ছা, মায়া-মোহাচ্ছন্ন সংসারাসক্ত মানব দূরে থাকুক, মহামুনি ঋষি যোগিগণও যুগ-যুগান্তর ধরিয়া, যোগতপস্যা করিয়াও বুঝিতে সক্ষম হয়েন নাই। ভগবান লালনকে কি উদ্দেশ্যে, কি নিমিত্ত যে আজ এই মৃত্যু সঙ্কটে ফেলিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে, আজ এই দারুণ ব্যাধি, লালনের আত্মা হরণ করিবে, কি আত্মার উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটন করিবে? লালনের পিতা ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! কি করিলাম! সর্ব্বমঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা ভূতভাবন ভগবানের দর্শনে আসিয়া আজ পুত্র-রত্নটী হারাইতে বসিলাম। জানি না, দয়াময় ভগবানের এ কিরূপ দয়া, করুণাময় জগদীশ্বরের এ কিরূপ করুণা, মঙ্গলাধার বিশ্ববিধাতার এ কিরূপ বিধান।" মহারোগাক্রান্ত লালন রোগের দারুণ জ্বালা যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে একেবারে জ্ঞানহীন, একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। পিতা পুত্রের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে একটী পুষ্করিণীর ধারে ফেলিয়া রাখিয়া, পাষাণে বুক বাঁধিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভোলানাথ মজুমদার।

শ্রীরামকৃষ্ণাষ্টক স্তোত্রং।*

শ্রীনাথাদি গুরুত্রয়ং গণপতিং পীঠত্রয়ং ভৈরবং সিদ্ধৌঘং বটুকত্রয়ং পদযুগং দূতিক্রমং মণ্ডলং। বীরাদ্যষ্টচতুষ্কষষ্ঠি নবকং বীরাবলিং পঞ্চকং শ্রীমন্মালিনী মন্ত্ররাজ সহিতং বন্দে গুরোর্ম্মণ্ডলং॥

প্রণমামি রামকৃষ্ণং স্বর্ণশঙ্কণ বিগ্রহং।
বিশ্বস্রাধ্যং বিশ্বত্রাতাং রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

---

* কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীশিবানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক বিরচিত ও পঠিত।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগন-সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং
একং নিত্যং বিমল-মচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

* * * *

কাশীনিবাসং যশসা প্রকাশং সর্ব্বাঘ নাশং শরণাগতানাং।
ব্রহ্ম স্বরূপং পরমাবধূতং তং শ্রীরামকৃষ্ণরহং নমামি ॥ ১ ॥
যদ্দর্শনং যৎস্মরণং যদর্চ্চা চোতোবিশুদ্ধং কুরুতে জনানাং।
ভবাপবর্গঞ্চ ততো বিধত্তে তং শ্রীরামকৃষ্ণরহং নমামি ॥ ২ ॥
চেতোযদীয়ং বিষয়েষু-সক্তং নক্তন্দিবং ব্রহ্ম সুখাব মগ্নম্।
নির্ব্বাতদীপার্চ্চিরিবা প্রকম্পং তং শ্রীরামকৃষ্ণরহং নমামি ॥ ৩ ॥
চেতশ্চরী তৃপ্তিকরী দক্ষা মক্ষোভকর্ত্রী সুহৃদাং দয়ার্দ্রা।
মূর্ত্তির্যদীয়া বুধ-বন্দনীয়া তং শ্রীরামকৃষ্ণহরং নমামি ॥ ৪ ॥
যৎপাদপদ্মদ্বয় দর্শনায় নিত্যং চতুর্ব্বগ ফল-প্রদায়।
দূরাদুপায়ান্তি নৃপাদ্বিজেন্দ্রা তং শ্রীরামকৃষ্ণরহং নমামি ॥ ৫ ॥
দিগম্বরং দিক্‌পতি-বন্দ্যমানং সানন্দমানন্দ বনৈক সিংহম্।
কৃতারি ষড়বর্গ-জয়ং শুভাশয়ং তং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসাত্মনে নমঃ ॥ ৬ ॥
ষড়দর্শনজ্ঞান-নিধান মানসং তৎ সদ্বচো নিত্য বিমর্শ তৎ-পরম্।
নৈগুণ্য নির্ধূত মনোমলং পরং তং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসাত্মনে নমঃ ॥৭॥
যস্তত্ত্বমস্যাদি বিচারদক্ষঃ স্বচ্ছান্তরাত্মা তন্ত্র-মার্গগামী।
সমং সুবর্ণং সিকতাচ যস্য তং শ্রীরামকৃষ্ণরহং নমামি ॥ ৮
শ্রীমন্মহেশাঙ্ঘ্রিচরঃ সনাঢ্যো, শিবানন্দঃ সদ্‌গুরু লব্ধবিত্তঃ।
রামকৃষ্ণাষ্টকস্তেন কৃত প্রসত্ত্যৈ শ্রীমৎ গুরুণাং করুণাকরাণাম্ ॥
ইতি শ্রীরামকৃষ্ণাষ্টক স্তোত্রং সমাপ্তং।
ওঁ তৎসৎ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অখণ্ড বোধ-রূপায় আনন্দ বনচারিণে।
নমঃ পরমহংসায় শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্ত্তয়ে ॥
পুরস্তাত্তথা পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠদেশং তথোর্দ্ধাধ এবং সদাতং নমামি।
স সচ্চিৎ-স্বরূপঃ শিবং সন্দধাতু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণরূপ প্রসন্নঃ ॥
প্রসাদার্থং যত্নাস্তব নুতিরিয়ং যদ্যপি কৃতা বিচারেহদ্য ব্যর্থা পৃথুরপি।

বিভতীশ মম তু গুণোযস্মিন্ যাদৃককথয়তি জনশ্চেত্তদধিক্ং প্রসাদঃ
স্যাৎ তস্মিন্নিহ তু নহি তস্যাস্ত্যবসরঃ ॥
অতো যচ্চাঞ্চল্যা স্তবগুণ গণানাং হি বিভব মবুদ্ধো তদনর্হাং
কৃতমিহ ময়া তৎ বিরণতঃ।
সুবধ্যাহং পানীকৃত নতশিরাঃ প্রার্থয়ইতি
কৌলেশ থস্তবাং বিতরময়ি দৃষ্টিং সকরুণাম ॥
সদাস্মে পাদাজ্জে মম কুকরতিং পাবনত মে প্রসাদস্তে
যস্মাত্তদুপদিশ মাং ত্বং করুণয়া।
ন জানে-হহং কিঞ্চিচ্চরণ রজসস্তে সমধিকং
প্রসীদত্বং তস্মাচ্ছরণদ ন চান্যচ্চ শরণম্ ॥

ইতি শ্রীশিবানন্দ সরস্বতী কৃত শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রং সমাপ্ত।

ভক্তি।

ভক্তি কাহাকে বলে? কি প্রকারে ভক্তি হয়? ভক্তি কি? ভালবাসা বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে সেই ভালবাসার সার যা; তাই ভক্তি। ভালবাসার সহিত যদি ভাবরূপ সুধা সমুদ্র মন্থন করিতে পার, তবে প্রেম বলিয়া একটী বস্তু পাইবে। আর সেই প্রেম হইতেই ভক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ভক্তি—জ্ঞান-সমুদ্র মথিত লব্ধ সুধা-বিন্দু। এই সুধার অল্প অধিক নাই, সমান ভাবে সকলেই ভক্তি সুধাপান করিয়া থাকে।

এই ভক্তিও আবার নানা ভাবে নানা নামে অভিহিত হয়। যেমন, পিতৃ মাতৃ ভক্তি, গুরু-ভক্তি, রাজভক্তি ও পরমার্থ ঈশ্বর-ভক্তি ইত্যাদি নানা ভাবে বিভক্ত হইয়াছে। সুতরাং ভালবাসাই এই ভক্তির মূল-ভিত্তি। ভালবাসার সহিত পিতা মাতার বাধ্য হইয়া, তাঁহাদের আদেশ পালন করিলে পিতৃমাতৃ-ভক্তি উচ্ছ্বাসিত হইয়া পড়ে। ঐরূপে রাজভক্তির সমাবেশ হইয়া থাকে; রাজার প্রতি কর্ত্তব্য এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই রাজভক্তি। আবার স্নেহময়, পরমকল্যাণাকর, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি লাভ করিতে হইলে অগ্রে তাঁহার নামে বিশ্বাস কর; পরে তাঁহাকে আপন ভাবিয়া ভালবাস। তাঁহাকে ভালবাসিতে বাসিতে ক্রমেই প্রেমাবেশ হইবে; তারপর প্রেমাবেশ হইতে ভক্তিসুধা লাভ করিতে পারিবে।

এই ভক্তি আবার ভক্ত ব্যতীত যার তার হয় না। যেমন সূর্য্য উদিত

না হইলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় না, তদ্রূপ ভক্ত-হৃদয় না হইলে, ঈশ্বরে ভালবাসা না জন্মিলে, ভক্তি কেহ লাভ করিতে পারে না। আশা যেমন মানবকে আশ্রয় করিয়া থাকে; ভক্তিও তদ্রূপ ভক্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তৃষ্ণাকে দূর করিতে জলের আবশ্যক, কিন্তু জলকে তৃষ্ণা অন্বেষণ করে, সেইরূপ ভক্ত ভক্তিকে অন্বেষণ করে। প্রেমে প্রেমিক প্রেমিকা মাতোয়ারা হয়; আবার ভক্ত যে, সেও ভক্তিতে মাতোয়ারা হয়; কিন্তু এরূপ ভক্ত অতি বিরল। প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক দুর্লভ। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হইতেছে, ভগবদ্ভক্তি বা ভগবান লাভ। যদি ভগবানকে চাও, তবে ভক্তিভাবের আরাধনা কর। ভক্তি হইতেই ভগবানের দর্শন পাইবে, যেহেতু ভক্তিরূপা রজ্জুতে ভগবান আবদ্ধ। ভাই ভক্তগণ! অগ্রে প্রাণপণে ভক্তিকেই ডাক, ভক্তিকেই চাও, ভগবান আপনি আসিবেন।

এই ভক্তি সাধন করিতে হইলে গৃহত্যাগ করিতে হয় না, সংসারে থাকিয়া ভগদ্ভক্তি লাভ শিক্ষা করিতে হয়। স্ত্রীপুত্র হইতে, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন ও স্নেহাস্পদগণের নিকট হইতেই ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করিবে। কেন না, তাহারা যে যেরূপ ভাবে আমাদের স্নেহ ও মমতা করেন, বা আমরা তাহাদিগকে যে ভাবে ভালবাসি, সেবা করি, সেই প্রকার ভাবেই স্নেহ ও মমতা তাঁহাকে (ভগবানকে) অর্পণ করিতে পারিলেই, প্রভুর প্রকৃত ভক্ত হইতে পারা যায়; নতুবা সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া ভক্তি ভালবাসা ও প্রেম, কিরূপে শিক্ষা করিবে?

যে ভাবে আমরা প্রিয়জনের সহিত ভালবাসার ব্যবহার, আচার পদ্ধতি করিয়া থাকি, ঐ ভাবে যদি ঈশ্বরকে ভাবিতে পারি, তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতে পারি, তবেই আমাদের ঈশ্বর ভক্তি লাভ করা হইবে। নতুবা আমরা আর কি প্রকারে ভগবদ্ভক্ত হইতে পারি?

এই ভক্তি লাভের উপায় ভগবান রামকৃষ্ণদেব একটী উদাহরণ দ্বারায় দেখাইয়াছেন যথা—"এক কৃষক জমিতে জল-আনিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া স্থানীয় নদী হইতে জমি পর্য্যন্ত জল-প্রণালী খনন করিতে করিতে মধ্যাহ্ন সময়েও ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া, আপনার কার্য্যসাধনে যত্নবান হইলে, তাঁহার স্ত্রী তাহাকে মধ্যাহ্ন-আহারের জন্য ডাকিলে, সে তাহা উপেক্ষা করিয়া স্বীয় কার্য্যে তদ্গতচিত্ত ছিল। তৎপর যখন জমিতে জল আসিতে লাগিল, তখন সে বাটী গিয়া স্নানাহার সম্পাদন করিয়াছিল।"

সেইরূপ যদি আমরাও ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করি তবে প্রথমে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই ভক্তি লাভেরই চেষ্টা করিতে হইবে। আর অনাবিষ্ট মনরূপ মৃত্তিকাকে, জ্ঞান-কোদাল দ্বারায় কাটিয়া জল-প্রণালীর ন্যায় পথ করিতে হইবে, তৎপরে সেই শান্তিবারি-সদৃশ ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়রূপ জমিতে আসিয়া প্রবেশ করিবে। তৎপরে স্ত্রী পুত্র পরিবারের মন তুষ্টি করিতে ইচ্ছা হয় কর, নতুবা, সর্ব্বাগ্রে এ সকলকে সাংসারিক ভাবে বজায় রাখিয়া ভক্তিলাভ করিতে গেলে, ভক্তিতে প্রতারণা করা হইবে।

আরও দেখ, আমরা যদি কাম্যকামনা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই, তবে দেহস্থ দশইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তির তৃপ্তিরূপ মিথ্যা শান্তিতে কখনও ভুলা উচিত নহে। নতুবা যেরূপ দুই গৃহে একজন এক সময়ে থাকিতে পারে না, কিম্বা দুই নৌকায় একসঙ্গে পদার্পণ করিলে যেরূপ বিপজ্জনক হয়, সেইরূপ বিষয়াসক্তি ও ভগবত-ভক্তি এই দুই একসঙ্গে হইতে পারে না। তবে কেন বৃথা, সংসার কূপে ডুবিয়া বিষয়রূপ মদিরা পানে উন্মত্ত হইতেছ ?

আবার দেখ, হে ভক্তগণ! পরমার্থ ধন অন্বেষণ করিতে প্রথমে যেমন কষ্টকর ;—শেষে তদনুযায়ী অপার আনন্দদায়ী। সে যে কি আনন্দ, তাহা সাধারণে কলমে আঁকিয়া জানান যায় না, অথবা মুখে বলিয়াও তাহা প্রকাশ করা যায় না। এ আনন্দ যে চায়, সেই আপনার অন্তর মধ্যেই আপনিই পাইয়া থাকে। যে কুল-কুণ্ডলিনীর চৈতন্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, সেই ঐ ভক্তিরসাশ্রিত ভগবৎ প্রদত্ত আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। তাই বলি, হে ভ্রাতৃগণ! বৃথা অনিষ্টকারক রিপুগণের বশীভূত হইয়া পরমার্থ ধনে বঞ্চিত থাকিও না।

এস, আমরাও মানুষ হইয়া ঐ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ লইয়া, বিশ্বাস, জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিতে সচেষ্ট ও যত্নবান হই। এস আমরাও তাঁহার শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া তাঁহাকেই ডাকি, ডাকিতে চেষ্টা করি। কিন্তু ভাই, এই ডাকের মধ্যে কপটতা করিও না ; চাতুর্য্য রাখিও না। তাহা হইলে আনন্দ পাইবে না। বরং তাহা হইতে নিরানন্দের উৎপাদন হইবে। যাহা হইতে নিরানন্দ হয় ; তাহা অতি যত্নের সহিত সদা পরিত্যাজ্য।

আর কেন, এস, সকলে মিলিয়া এই আনন্দময় জগতে যতদিন আছি, ততদিন, সেই পরমানন্দময় ভগবানের শ্রীচরণে ভক্তিসুধা সমর্পণ করিতে

এবং সংসার হইতে সেই ভক্তিসুধা আহরণ করিতে সচেষ্ট হই। অযথা সময়ের অপব্যয় না করিয়া, মন খুলিয়া, প্রাণ ভরিয়া "জয় রামকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করি। জগতজীবন সেই পরম-দয়াল প্রভু সদাই আমাদের জন্য, আমাদের ন্যায় মহাপাপীকে পরিত্রাণ করিতে, ঐ স্নেহহস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছেন। ঐ যে দীনবন্ধু ভক্তাধীন ঠাকুর, ভবসমুদ্রের কূলে ভক্তিময়ী তরণী লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। ঐ যে মনোমোহনরূপে রূপময় গুণময় ভগবান, আমাদের জন্য দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন। আর কেন, এস, আমরাও সেই অনাথ-নাথের শ্রীচরণাশ্রয়ে গিয়া ভগবদ্ভক্তি লাভ করি।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

(১)

তুমিই সারাৎসার, মিথ্যা এ ভব সংসার,
তোমা বিনা জগতের সকলি অসার—
অনন্ত, অব্যয় তুমি—সর্ব্ব গুণাধার।

(২)

দারা সুত পরিজন, কেহই নয় আপন,
কর্ম্মবশে ঘোরে তারা সাথে অনিবার—
পাইলে বিয়োগ-ব্যথা করে হাহাকার।

(৩)

ব্যথিতের আর্ত্তস্বরে, মায়াময় এ সংসারে,
জ্বলিতেছে কি ভীষণ—শোকের অনল—
নির্ব্বাপিছে লোকে তায় দিয়ে অশ্রুজল।

(৪)

কালের অপূর্ণতায়, খেলা ঘর ভেঙ্গে যায়,
তবুও খেলিতে সাধ কেন হয় মনে—
হারাধন কে কোথায় পেয়েছে জীবনে।

(৫)

তবে কেন ভ্রান্তিবশে, ধাই সেই সুখ আশে,
যে সুখের পরিণাম—দুঃখের কারণ—
চির বিষণ্ণতা আর ভীষণ দাহন।

(৬)

কাল্পনিক উপছায়া, তাতে করি এত মায়া,
প্রোজ্জ্বল অনলকুণ্ড নরক সংসারে—
ডুবেছি তরাও নাথ! অধম দাসেরে।

(৭)

হও ক্ষমাশীল তুমি, অবোধ সন্তান আমি,
করে থাকি যদি ভুল ক্ষম একবার—
হবে না এ ভুল কভু জীবনেতে আর।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

১। বহুদর্শী ও বিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীরাজেন্দ্রলাল সুর এল, এম, এস, সি, কৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-রত্ন। পঞ্চম সংস্করণ—পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

১ম ও ২য় ভাগ (একত্রে) প্রধানতঃ ১২শ খণ্ডে বিভক্ত ৬১৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, ছাপা ও কাগজ উত্তম এবং উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ও সোণার জলে নাম লেখা। মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

ইহাতে রোগ সমূহের নিদান, লক্ষণ, ভাবিফল—শুভ অশুভ লক্ষণ, চিকিৎসা, ঔষধ ও পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা, কোন রোগে কোন ঔষধের কোন ডাইলিউসন, আরক বা বটিকা ব্যবস্থা করা বিধি, তাপমান-যন্ত্র প্রয়োগ, মল, মূত্র, জিহ্বা, নাড়ী, বক্ষঃ প্রভৃতি পরীক্ষা ও পিপাসার কারণ ইত্যাদি যথা—১ম খণ্ড—সাধারণ রোগসমূহের চিকিৎসাদি। ২য়—ভৈষজ্যতত্ত্ব। ৩য়—ওলাউঠা চিকিৎসা। ৪র্থ—স্ত্রী-চিকিৎসা। ৫ম—শিশু-চিকিৎসা। ৬ষ্ঠ—প্রমেহ রোগ চিকিৎসা। ৭ম—কম্পাউণ্ডারি শিক্ষা অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকল প্রস্তুত করিবার সহজ উপায়। ৮ম—জ্বর-চিকিৎসা। ৯ম—চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ। ১০ম—এলোপ্যাথিক জ্বর-চিকিৎসা—ফিবার মিক্‌শ্চার, কুইনাইন মিক্‌শ্চার

ও টনিক মিক্শ্চার, আজকাল হাঁসপাতালে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়, তাহার অবিকল ব্যবস্থা, কি প্রকারে কি কি উপাদানে প্রস্তুত করা বিধি। ১১শ—অস্থি-তত্ত্ব। ১২শ—শরীর-তত্ত্ব। এ সকল বিষয় সুন্দর ভাবে ও সহজ ভাষায় বিশেষরূপে লেখা আছে। গৃহস্থগণের বিশেষ আবশ্যকীয়।

২। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাসার, ২য় সংস্করণ ১২০ পৃষ্ঠা, মূল্য ।॥০ আনা। উক্ত ডাক্তার বাবু প্রণীত। সাধারণ রোগসমূহের নিদান লক্ষণ চিকিৎসা ও ভৈষজ্যতত্ত্ব, ইংরাজীতে প্রত্যেক রোগের নাম ও বঙ্গভাষায় তাহার অর্থ এবং ঔষধ ও পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা, নাড়ী, মল, মূত্র, জিহ্বা এবং বক্ষঃপরীক্ষা, তাপমান যন্ত্র প্রয়োগ, কোন্ রোগে কোন্ ডাইলিউসন্ ব্যবস্থা করা বিধি ইত্যাদি বিষয় বিশেষরূপে লেখা আছে, যাঁহারা হোমিওপ্যাথিক জানেন না, তাঁহারাও এই পুস্তকের সাহায্যে যাবতীয় রোগের চিকিৎসা সহজে করিতে পারেন, ভাষা অতি সরল, পুস্তকখানি সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

৩। শরীর-তত্ত্ব, ৮১ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵০ আনা, উক্ত ডাক্তার বাবু প্রণীত। পীড়া সকল উৎপত্তি হইবার কারণ, কোন্ যন্ত্র হইতে কোন্ পীড়া উৎপত্তি, রক্ত কোন্ কোন পথ দিয়া সমস্ত শরীর পরিভ্রমণ করে, কোন্ যন্ত্রের উপর কোন্ ঔষধের ক্রিয়া বা চিকিৎসা, এ সকল বিষয় ভালরূপ লেখা আছে, এই পুস্তকখানি হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে।

৪। অস্থিতত্ত্ব ৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵০ আনা, উক্ত ডাক্তার বাবু প্রণীত। নর-কঙ্কালে যে সকল অস্থি আছে, তাহাদিগের বিস্তৃত বিবরণ, নাম, সংখ্যা, সংযোগ ও পেশীদিগের সংখ্যা এবং সাধারণের সুবিধার্থে প্রথম ইংরাজিতে প্রত্যেক অস্থির নাম ও তৎপার্শ্বে ঐ অস্থির বাঙ্গালা নাম দেওয়া হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বিষয় লেখা আছে। শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে।

শেষ কথা।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসারত্ন (অর্থাৎ ১ম পুস্তকখানি) তত্ত্ব-মঞ্জরীর গ্রাহক-বর্গ ৫৲ টাকা স্থলে ২॥০ আড়াই টাকা মূল্যে পাইবেন। ২য়, ৩য়, এবং ৪র্থ পুস্তক তিনখানি, মোট ১।০ পাঁচ সিকা স্থলে, মাত্র ৷৵০ ছয় আনা মূল্যে পাইবেন। তত্ত্ব-মঞ্জরী কার্য্যালয়ে পত্র লিখুন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

আষাঢ়, সন ১৩১৬ সাল।

ত্রয়োদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

চরণামৃত।

"এই ভালবাসা" ?

"এই ভালবাসা" !

"এই যদি ভালবাসা হয়, তোমায় মিনতি করি—আমায় এ বন্ধন হইতে মুক্ত কর।"

সুন্দরী ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল,—"বন্ধন ? তোমায় ভালবাসার বন্ধনে বাঁধিয়াছি, ইহা কি সত্যই তোমার বিশ্বাস হয় ? ধন্য আশা !"

যুবক একটু অপ্রতিভ হইয়া, কাতরতার সহিত বলিল,—"কেন, আমার অপরাধ কি ? আশা কার বুকে নাই ? আমি দুর্ভাগ্য বলিয়া কি ভাল-বাসায় আমার অধিকার নাই,—তুমি কি সত্যই তবে ভালবাস না ?"

সুন্দরী। ভালবাসি বৈ কি, কিন্তু ভালবাসায় বন্ধন জানি না।

যুবক। সেটা তুমি বুঝিবে কিরূপে ? বন্ধন আমার, তোমার নহে। আমি শিক্ষায় মণ্ডিত হইয়াও সুখের আস্বাদ পাই নাই, কাব্যের সৌন্দর্য্য আমায় মুগ্ধ করিয়াছে, কিন্তু প্রাণ তাহাতে পরিতৃপ্ত হয় নাই। জগতের বুকে আর কি আছে জানি না, কিন্তু তোমায় ভালবাসিয়া, ইহাই বুঝি-য়াছি,—প্রেমই এই বিশ্বের প্রাণ ! আমি তাই আর সব বিসর্জ্জন দিয়া, এই প্রেমের পূজায় প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি, ইহাই আমার বন্ধন, ইহা তুমি বুঝিবে কিরূপে ?"

সুন্দরী বড় নিষ্ঠুর ঘৃণার হাসি হাসিল, হাসিতে হাসিতে বলিল,— "প্রেম? আত্ম বিসর্জ্জন? এ সকলের তুমি কি জান, কি বুঝ?"

যুবক। সত্যই আমি কিছু বুঝি না। কিন্তু আমার প্রাণের প্রাণে এই যে শিখা তুমি জ্বালিয়াছ, ইহা তবে কি? আমি আর সব ভুলে যাই, এই বিরাট বিশ্বের বিশালমূর্ত্তি তোমার মূর্ত্তিতে পরিণত দেখি! আমি আত্মহারা হয়ে থাকি, প্রেমের সাগরে ডুবে গিয়ে শুধু তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি! আমার এ বন্ধন তুমি বুঝিবে কিরূপে?

সুন্দরী। তাই ভাল! এ বন্ধন তোমারই বটে! নিজের বাঁধন, নিজেই শিথিল কর! এ মায়া আবরণে প্রয়োজন কি?

যুবক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"হায় ভালবাসা—একি শুধু মায়া আবরণ?"

সুন্দরী। পাগল তুমি, এও কি বুঝাতে হয়?

যুবক। হায়, হায়! কেন এ মায়া-আবরণ খুলিয়া দিলে? সুন্দরী হও, পিশাচী হও, দেবী হও, রাক্ষসী হও—তুমি যাহাই হও না, আমি যে চক্ষে তোমায় দেখিয়াছি, আমার সে চক্ষের আবরণ কেন খুলিয়া দিলে? তুমি ভালবাস, ঘৃণা কর, চরণে দলিত কর, আমিত তাহা দেখি নাই, আমি ভালবাসিয়া সুখী, আমার সে সোণার স্বপ্ন কেন ভাঙ্গিয়া দিলে?

সুন্দরী। পাগল তুমি, এও কি বুঝাতে হয়, তুমি আমার কেহ নও? আমার এ ভালবাসার তুমি কি যোগ্য? তুমি কদাকার, প্রকৃতির জড়পিণ্ড— আমি তোমায় ভালবাসিতে পারি? আমার এই মধুর যৌবন, এই জ্বলন্ত রূপের শিখা, এই শত সাধে পূর্ণ প্রাণ, একি তোমারই জন্য? আমার প্রতি হাসিতে চাঁদের সুধা ক্ষরিত হয়, প্রতি নিশ্বাসে মলয় প্রবাহিত হয়, প্রতি কথায় বীণার ঝঙ্কার হয়—তুমি কি ভাব, আমি তোমায় ভালবাসিতে পারি? আমি রূপগর্ব্বিতা পাপিষ্ঠা বটে, কিন্তু এমন প্রাণঘাতী ছলনায় তোমায় ভুলাইব না।

যুবক চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। মাথার উপর অনন্ত শূন্য ঘুরিতে লাগিল, পদতলে মেদিনী কাঁপিতে লাগিল, বুকের ভিতর সমুদ্রমন্থন হইতে লাগিল। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার দেখিতে দেখিতে যুবক বসিয়া পড়িল।

নীল আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতে ছিল। অনন্ত সৌন্দর্য্য-ধারায় জগত স্নাত হইয়া হাসিমুখে ঘুমাইতে ছিল।

সুন্দরী বলিতে লাগিল,—"আর বৃথা আশার ছলনায় ভুলে থেকো না, এ মোহ আবরণে কোন সুখ নাই। আজ না হোক্, দুদিনে এ মোহ আবরণ দূরে যেত, তখন আর সব যেখানে যেমন তেমনি থাকিবে, কেবল তুমিই ভাঙ্গা-বুকে কে জানে কোথায় সরিয়া পড়িবে!"

যুবক হৃদয়-ভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। সে গভীর নিশ্বাসের তরঙ্গ, বিশ্বব্যাপী তরঙ্গে স্পর্শমাত্রও অনুভূত হইল না, কিন্তু সে দুর্ভাগ্য জীবের যদি কেহ জননী থাকেন, তবে সে করুণাময়ীর কোমল বুকে সে আঘাত, বড় বিষম আঘাত করিল!

সেই রাত্রে—গভীর নিশীথে, সেই মর্ম্মাহত যুবক, কাহার উদ্দেশে নির্জ্জন পথে চলিতে লাগিল। দূরে চন্দ্রকরোজ্জ্বল জাহ্নবী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, নির্ম্মল জ্যোৎস্না সুষুপ্ত ধরণীবক্ষে আপন সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিয়াছে—তাহার কোন দিকে লক্ষ্য নাই, যুবক আপন মনে পথ বাহিয়া চলিয়াছে। অদূরে এক উচ্চ অট্টালিকার নিকট আসিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, কি চিন্তায় একবার শিহরিয়া উঠিল। তারপর সেই অট্টালিকার এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল।

তথায় রুগ্নশয্যায় পড়িয়া, একটী বৃদ্ধ করুণস্বরে চীৎকার করিতেছিল। নিকটে কেহ ছিল না যে তাহাকে সান্ত্বনা দেয়। যুবকের পদশব্দে বৃদ্ধ স্থির হইলেন, বলিলেন—"কুমার, এত রাত্রে আসিতে হয়? আমিত মরিতে বসিয়াছি, আমার দিন ফুরাইয়া এসেছে, এখন আমার কাছ ছাড়া হয়ে থেকো না। পিপাসায় আমার প্রাণ যায়, ঔষধ পর্য্যন্ত পাই নাই।"

কুমার কিছু না বলিয়া, শীতল জল বৃদ্ধকে পান করিতে দিল, পরে ঔষধের পাত্র বৃদ্ধের মুখের নিকট ধরিল।

বৃদ্ধ সেই ঔষধ গলাধঃকরণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেহে একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করিলেন। কুমার তখন একটা বিকট হাসি হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

হায় সৃষ্টি! তুমি চির-করুণাময়ী, অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী, তুমি নিত্য-মনোহারিণী! হায়, তোমার বুকে থাকিয়া, মানুষ কেন এত মায়া-মমতা হীন, কেন এমন শ্রীহীন মলিন?

কুমার, জাহ্নবীর তৃণাচ্ছন্ন তট-প্রদেশে বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল।

সে জগতের পরিত্যক্ত, অনাদৃত, মানব-সমাজের ঘৃণ্য; তাহার অপরাধ, সে পিতা মাতার পরিত্যক্ত শিশু, সে কদাকার, তাহার পৃষ্ঠে প্রকাণ্ড কুঁজ, ললাটে চিন্তারেখা, মুখে নিরানন্দ, হৃদয়ে কঠোরতা! যে ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, ধর্ম্ম তাহার নিকট উপহাসের সামগ্রী, জীবন কেবল কতিপয় দিনের সমষ্টি মাত্র, ইহজীবনেই সুখ দুঃখের পরিসমাপ্তি! দেহের সৌন্দর্য্য যেমন, হৃদয়ের শোভাও তদ্রূপ, দু'য়ে মিলিয়া সেই হতভাগ্যকে মানব-সমাজের উপহাসের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছিল। কেহ তাহাকে ডাকিত না, কেহ তাহার আপনার ছিল না। সেও তাই অন্তরের অন্তরে জগতের প্রতি দারুণ ঘৃণা পোষণ করিত, বিষম হিংসায় তাহার দেহ জর্জ্জরিত ছিল। হৃদয় চির অশান্তিময়, জীবন একটা বিড়ম্বনা মাত্র। কুমার সেই জ্যোৎস্না প্রদীপ্ত গঙ্গা-সৈকতে বসিয়া একে একে সেই সকল ভাবিতেছিল! জুড়াইবার তাহার এক স্থান ছিল, আশার মধুর আলোকে শত দুঃখ ঢাকিবার এক উপায় ছিল, জগতের অনাদররাশি উড়াইয়া দিবার এক মহামন্ত্র ছিল, জীবন মধুময় অনুভব করিবার এক উপায় ছিল—তাহা রমণীর প্রেম! আজ সেই স্বর্গচ্যুত হইয়া, চিরদুর্ভাগ্য কুমার ভাবিতে লাগিল,—"আর কেন, সব ফুরাইল, এই জীবনের সঙ্গেইত সুখ দুঃখের সমাপ্তি! কি করিলে এ দুঃখে পরিত্রাণ পাইব! জীবন, সেত জলবুদ্বুদমাত্র, এই সুশীতল জাহ্নবীজলে এ দগ্ধজীবন ঢালিয়া দিই না কেন?—কিন্তু তাহাতেই কি জ্বালা জুড়াইবে? কে বলিয়া দিবে, ইহাই শেষ কি না? কেন এ সংশয়? আজীবন শিখিয়া আসিলাম,—ইহজীবন সব, দেহান্তে আর কিছুই নাই—তবে আজ কেন এ সংশয়? কিন্তু যদি থাকে? যদি ইহজীবনের পরপারে আর কিছু থাকে? তবে আমি জন্মের মত গেলাম, আমার উদ্ধার নাই।—না, এ সংশয় মিথ্যা, আমি আর ভাবিব না। এই সংশয় সহস্র সঙ্কল্পের সম্মুখে আসিয়া পর্ব্বত প্রমাণ বাধা দেয়! দূর হউক, আমার প্রত্যয় অপ্রত্যয়, আমার আশা নিরাশা, আমার জ্ঞান ও সংশয়—সব দূরে যাক্, স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়াছি, ভাসিয়া যাই, কূল থাকে আশ্রয় পাইব, না থাকে—দরিয়ায় ভাসিয়া যাই!—কিন্তু বুড়া কি এখনও বাঁচিয়া আছে? একবার অর্থরাশি লইয়া দেখিব, প্রকৃতি যাহাতে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছে, অর্থে তাহা পাই কি না! তারপর—তারপর এ মাটির দেহ, যে দিন ইচ্ছা আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার বুকের ভিতর একটা আগুন জ্বলিয়া উঠিল। জীবনের যেটুকু মধুরতা, তাহা সেই আগুনে পুড়িতেছিল; মানবের যেটুকু দেবত্ব, তাহা সেই আগুনে পুড়িতেছিল; সৃষ্টির যেটুকু সৌন্দর্য্য তাহা সেই আগুনে পুড়িতেছিল। সব পুড়িল, পুড়িয়া ছাই হইল, তখন সেই দগ্ধাবশিষ্ট অঙ্গার সেই জাহ্নবী-তীরে পড়িয়া রহিল।

মানবকে দেবতার আকারে গড়িয়া, এ নরকের আগুন কে তাহার বুকে ঢালিয়া দিল? এ আগুন নির্ব্বাপিত করিবার কি শান্তিধারা নাই?

তীব্র হলাহল সেবন করিয়া বৃদ্ধের দারুণ যন্ত্রণা হইল—সর্ব্বত্রই আগুন! বুক জ্বলিতে লাগিল, দারুণ পিপাসা!

ক্রমে মুখ বিবর্ণ হইল, ওষ্ঠ নীলবর্ণ হইল, দেহ নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল।

সেই অবসরে সেই মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ শুনিয়া, নিম্ন প্রকোষ্ঠ হইতে এক সন্ন্যাসী উঠিয়া, সেই মৃতপ্রায় বৃদ্ধের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আকৃতিতে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল, তাঁহার মাধুর্য্য-মিশ্রিত গাম্ভীর্য্য, নয়নে একটা অপূর্ব্ব জ্যোতি এবং সর্ব্ব অবয়বে এক পবিত্র ভাব, তাঁহাকে সর্ব্ব-লোক-পূজ্য করিয়াছিল। সেই মহাপুরুষ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহের দীপ উজ্জ্বল করিয়া দিলেন, পরে বৃদ্ধের মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইলেন।

বৃদ্ধ, নিমীলিত নেত্রে কুমারকে ডাকিলেন, পদশব্দে কুমার আসিয়াছে ভাবিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বাবা তুমি এসেছ? বৈদ্য কি সঙ্গে এনেছ? একি বিষম ঔষধ, আমার বুক জ্বলে গেল—পিপাসা, পিপাসা!"

সেই মহাপুরুষ দীপালোকে বৃদ্ধকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলেন এবং প্রকৃত বৃত্তান্ত অনুমানে বুঝিলেন। তখন তিনি নিজে এক শীতল ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

ঔষধ পান করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—"বৈদ্যরাজ, আমায় বাঁচাইলে, আমি পুড়িয়া মরিতেছিলাম, প্রাণ শীতল হইল। আমি বড়—বড় দুঃখী, সংসারে আমার কেহ নাই। আমার বলিবার কেহ থাকিলে, 'এ জ্বালায়ও সুখ পাইতাম।' সংসারে যার স্ত্রী-পুত্র নাই, তার কি কেহ আপনার হইতে পারে না?"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আপনার হইতে না পারিলে, আমি এ সময়ে আসিব কেন? তুমি জান বা না জান, ডাক বা না ডাক, তোমার আপনার জন নিত্য তোমার সহচর!—কিন্তু সে কথা থাক্‌, এখন তুমি কেমন?"

বৃদ্ধ। আমি খুব সুস্থ বোধ করিতেছি। আমার যেন বিষের জ্বালা ধরিয়াছিল, এখন তেমনি শীতল হয়েছি! কি সঞ্জীবনী-সুধা আমায় পান করাইলে, আমি জুড়াইলাম! কি এ ঔষধ?

"চরণামৃত।"

বৃদ্ধ কি বলিতে যাইতেছিলেন, সন্ন্যাসী তাঁহার দেহে পদ্মহস্ত বুলাইলেন, বৃদ্ধ নিদ্রাভিভূত হইলেন।

সন্ন্যাসী দেখিলেন, সেই সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠ মধ্যে বহুবিধ দুর্মূল্য পদার্থ সকল রহিয়াছে। সুবৃহৎ মেজের উপর রাশি রাশি গ্রন্থ শোভা পাইতেছে। বৃদ্ধ স্বাস্থ্য লাভের জন্য প্রবাসে আসিয়াও চির-সহচর গ্রন্থরাশি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর কৌতুহল হইল, তিনি এক এক খানি করিয়া অনেক গ্রন্থ দেখিলেন,—দেখিলেন যে, সকল গ্রন্থের উদ্দেশ্য এক—নিরীশ্বরবাদ! মনুষ্য-প্রতিভার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া, তিনি বিচলিত হইলেন না, অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "লীলাময়ীর এও এক লীলা! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপ-জ্যোতিতে পরিপূর্ণ করিয়া, চোখের দৃষ্টি অপহরণ করেছো! মা আমার—এ আবরণ তুমি না ঘুচাইলে, জীবের মুক্তি নাই।"

সহসা সেই গৃহের দেয়ালে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, নানা চিত্র শোভা পাইতেছে। তরঙ্গক্ষুব্ধ মহাসাগর, প্রবল ঝটিকায় তরণী সাগরগর্ভে নিমজ্জিত, তরঙ্গ-প্রতিহত হইয়া, অসহায় কোন জীব সাগরে ডুবিতেছে! বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, ঊর্দ্ধনেত্রে সে কাহাকে ডাকিল, মুখের কথা ফুটিতে না ফুটিতে প্রবল তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিল! এই চিত্রের নিম্নে, পরিষ্কার অক্ষরে কে লিখিয়া রাখিয়াছে—"ঈশ্বর কোথায়?"

আর একখানি চিত্র—রাজ্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ। দলে দলে নিরন্ন, অস্থি কঙ্কালসার নর নারী বসিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে! শিশুসন্তান জননীর বক্ষে মরিয়া আছে, মৃত শিশুর মাংস লইয়া অন্ত দল কাড়াকাড়ি করিতেছে! দূরে হৃষ্টপুষ্ট রাজদূতেরা, দেশ কম্পিত করিয়া বিবাহ-উৎসবের আনন্দ-বাজনা বাজাইয়া চলিয়াছে, পথ হইতে সেই নর-কঙ্কালগুলাকে, চাবুকের আঘাতে দূরীভূত করিতেছে! সেখানেও সেই হস্তাক্ষর—"ঈশ্বর কোথায়?"

আরও কত চিত্র—কিন্তু সন্ন্যাসী আর দেখিলেন না, তিনি প্রাণের আবেগে—"মা, মা" বলিতে বলিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তখনও প্রভাত হইতে অল্প বাকি ছিল। কুমার জাহ্নবী তীর হইতে ফিরিল। দেখিল, গৃহে প্রদীপ নাই, বৃদ্ধেরও কোন শব্দ নাই, বুঝিল কার্য্য সফল হইয়াছে।

তখন কুমার পুনরায় দীপ জ্বালিল, যে সিন্দুক ও বাক্সমধ্যে বহুমূল্য রত্নাদি ছিল, তাহা খুলিয়া অর্থ ও রত্নাদি বাহির করিল। তাহাতে একটা শব্দ হইল।

সেই শব্দে বৃদ্ধের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি একেবারে উঠিয়া বসিলেন এবং ডাকাত পড়িয়াছে মনে করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পরে চিনিতে পারিয়া, বৃদ্ধ বলিলেন—"একি, তুমি—কুমার? আমায় তেমন অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছিলে কিরূপে? এখন বা তোমায় এমন অবস্থায় কেন দেখিলাম?"

কুমার অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল,—"একি, সত্যই তুমি? তুমি তবে মর নাই? বিষপানেও তোমার মৃত্যু হইল না? অসম্ভব! অসম্ভব! নিশ্চয়ই তুমি মরিয়াছ, আমাকে ভয় দেখাইবার জন্যই তুমি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছ!"

বৃদ্ধ। বিষ? তুমি আমাকে সত্যই বিষপান করাইয়াছিলে? সত্য বল, আমার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না!

বৃদ্ধের চক্ষে জল আসিল। কুমারের হস্ত ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন,—"কেন বাবা, তোমার এ দুর্ম্মতি হইল? ধন রত্ন যাহা আছে, সে সবইত তোমার। তুমি নিজহস্তে আমায় বিষ দিয়াছিলে? অসম্ভব। সত্য বল, এমন পিশাচের কাজ কি তোমার?—আমি তোমার কি করিয়াছি? শৈশবে তুমি পিতৃ-মাতৃহীন; অনাথ অসহায় শিশু দেখিয়া তোমায় কুড়াইয়া আনিয়া মানুষ করিয়াছি। তুমি অতি কদাকার, কুঁজো, শ্রীহীন, লোকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, এই আশঙ্কায় তোমারই সুখের জন্য এই অর্থরাশি রাখিয়াছি, প্রকৃতির অভিশাপ অর্থে ঢাকিয়া যাইবে, এই ভাবিয়াই তোমারই জন্য অর্থ রাখিয়াছি। তুমি কি আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলে না? আমার কি অপরাধ?"

কুমার। তুমি আজও কেন বাঁচিয়া আছ, ইহাই তোমার অপরাধ; বিষ-

পান করিয়াও কেন তোমার মৃত্যু হইল না, ইহাই তোমার অপরাধ। আর অপরাধ—তুমি আমায় আশ্রয় দিয়াছিলে কেন?

বৃদ্ধ। হা ঈশ্বর!

কুমার। ঈশ্বর?—তোমার আবার ঈশ্বর? হাঁরে নির্ব্বোধ, তুমি কি বাল্যাবধি ইহাই আমাকে শিখাও নাই যে, ঈশ্বর নাই? দর্শনশাস্ত্রে আমাকে সুপণ্ডিত করিয়াছ, কিন্তু উঠিতে বসিতে আমায় শিখাইয়াছ—ঈশ্বর মানবের কল্পনামাত্র, ধর্ম্ম, ভীরু কাপুরুষের অবলম্বন, সমাজ নীতিই একমাত্র সত্য! তুমি কি ইহাই শিখাও নাই যে, বিরাট মানবজাতি এই বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং সেই মানবজাতির জন্য সামাজিক আচার পালনের নাম ধর্ম্ম? ইহজীবনই সব, পরজীবন অসার কল্পনামাত্র? ভালমন্দ ইহজীবনের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে, পরজন্ম বলিয়া কিছু নাই—এই কি তোমার শিক্ষা নহে? ধর্ম্ম যদি মানবজাতির জন্যই হয়, কেন তাহা আমার আবশ্যক হইবে? মানবজাতি! মানব আমার কে? আমি প্রকৃতির অভিশাপ! আমি কুঁজো বলে, কদাকার বলে, পথে বাহির হইতে পাইনা, লোকে ঘৃণার হাসি হাসিয়া প্রাণে বড় জ্বালা দেয়! প্রাণাস্তপণে ভালবাসিলাম, তাহার প্রতিদানে নিষ্ঠুর ঘৃণা পাইলাম! এই কি জীবন? এই জীবনের সুখ? তোমার কঠোর নীতিশিক্ষা সত্বেও আমার প্রাণের অতি নিভৃত-দেশে ক্ষীণ প্রেমের ধারা বহিত, অতি সন্তর্পণে তাহা বুকের ভিতর রাখিয়াছিলাম, তাহাও গিয়াছে, আমি এতই দুর্ভাগ্য যে, সকল সুখেই বঞ্চিত!

"সারাটা জীবন লোকের ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র হইয়া বেঁচে থাকার কি সুখ? তুমিই বলেছ—অর্থ আমাকে সকল সুখের অধিকারী করিবে। সেই অর্থ নিয়ে একবার দেখি, তোমার কথা সত্য কি না! আমার আর কোন সাধ, কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। ইহজীবনের দুঃখের রাশি বড়—বড় কষ্টে বহন করিলাম, যদি জানিতাম জন্মান্তরে ইহার সমাপ্তি আছে, পরজন্মে সুখী হইব, এত হাহাকার, এত অশান্তি থাকিত না! একবার ভেবে দেখ—তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ করেছ! পরজন্ম মূর্খের ভরসা হোক, দুর্ব্বলের অবলম্বন হোক্, কিন্তু এই পরজন্ম উড়াইয়া দিয়া, তুমি আমার সকল সুখ, সকল আশায় বঞ্চিত করে, এই দুঃখের বোঝা অধিকতর ভারি করে দিয়েছ! পরজন্মের আশা তুমি আমার অন্তর হইতে জন্মের মত বিলুপ্ত করিয়াছ! তার উপর—প্রাণের প্রাণ, জীবনের অমৃতধারা—ভগবানে ভক্তি, তাহাও

অন্তর হইতে বিলুপ্ত করিয়াছ! তুমি শিক্ষিত? আমি শিক্ষিত? মূর্খ তুমি! ঈশ্বরকে বাদ দিয়া যে শিক্ষা, যে ধর্ম্ম, যে নীতি—তাহার পরিণাম এই?—"

কুমারের চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল, কেন বুঝান যায় না, কিন্তু দৃঢ়হস্তে শাণিত ছুরি লইয়া বৃদ্ধের বক্ষ লক্ষ্য করিল। বৃদ্ধ প্রাণভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"বাবা রক্ষা কর। সর্ব্বস্ব তুমি লও, আমায় প্রাণে বাঁচিতে দাও। আমি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, এ বয়সে বাঁচিবার আর অন্য সাধ নাই, কিন্তু একবার ভাল করে বিচার করে দেখবো—সাধনায় কি সুখ!"

কুমার। শপথ কর, আমি যে পর্য্যন্ত এ দেশ ত্যাগ করিয়া না যাই, তুমি এ ঘটনা প্রকাশ করিবে না? কিন্তু তুমি কি বলিয়া বা শপথ করিবে? যে ঈশ্বর মানেনা—তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই।

সেই মুহূর্ত্তই বৃদ্ধের শেষ মুহূর্ত্ত হইত, কিন্তু সহসা সেই মহাপুরুষ সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কুমার ত্বরিত সে গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইল।

বৃদ্ধ তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাপুরুষের করস্পর্শে মূর্চ্ছা দুর হইল।

তিনি উঠিয়া বসিলেন, সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"যদি দয়া করেন, আমাকে আবার সেই সুধা দিন, আমার প্রাণ শীতল হইবে।"

সন্ন্যাসী কমণ্ডলু হইতে চরণামৃত পান করিতে দিলেন, বলিলেন—"মায়ের চরণামৃতে আপনি শান্তিলাভ করুন। ভবব্যাধির ইহা অমোঘ ঔষধ।"

বৃদ্ধ। আপনি আমার জীবন দান করিলেন।

সন্ন্যাসী। আমার সাধ্য কি, আমি জীবনদান করিতে পারি? মায়ের চরণামৃতই জীবের কল্যাণ সাধন করিতেছে।

বৃদ্ধ। মায়ের চরণামৃতে যদি এত গুণ, না জানি মায়ের গুণ কত!

সন্ন্যাসী। মায়ের গুণ কিছুই নাই—তিনি গুণাতীত!

বৃদ্ধ। সেই ত কথা। পূজার দালানে যে মায়ের মূর্ত্তি রহিয়াছে আমি ভাবি ঐ মূর্ত্তি হইতে বিশ্বজননীর পূজা কি সম্ভব?

সন্ন্যাসী। কেন? প্রতিমা বড় ক্ষুদ্র বলিয়া? তুমি বহুদুর হইতে মা'কে দেখিতেছ, তাই প্রতিমা অতি ক্ষুদ্র। নিকটে এস, মায়ের চরণতলে ব'স, দেখিবে ঐ ক্ষুদ্র প্রতিমা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে

তুমি আত্মহারা হবে, অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে যেমন অভিভূত হয়েছিলেন, তুমিও তেমনি হবে। এ শুষ্ক নীরস জীবন লইয়া কি হইবে?

বৃদ্ধ। যৌবনের প্রথমেই বুঝিয়াছিলাম—মনুষ্য সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ। সৃষ্টির মূলে যে কোন ঐশী-শক্তি আছে, তাহা কখন স্বীকার করি নাই। ঈশ্বরকে লইয়া জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে, তাহা বিশ্বাস করি নাই। মানবে মানবে প্রীতি, পরস্পরের মঙ্গলানুষ্ঠান,—ইহাই জীবনের সার বুঝিয়াছিলাম। এই জন্মের পূর্ব্বে জন্ম ছিল, কি ইহার পরে জন্মান্তর আছে, ইহা বিশ্বাস করি নাই—ইহজীবনই সব, এই ভাবিয়াছিলাম। সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ হই নাই, অধ্যয়ন ও পরহিতব্রত সার করিয়াছিলাম। ঐ হতভাগ্য নিরাশ্রয় জীবকে প্রতিপালন করিয়া উহাকে শিক্ষায় মণ্ডিত করিয়াছিলাম। নিজের ভাব ও চিন্তা উহারই দ্বারা শারীরি হইয়াছিল। এত যত্নে, এত কষ্টে মানুষ করিয়া তুলিয়া—এই তাহার পরিণাম হইল? এত স্নেহ, এত ভালবাসা,—এই তার প্রতিদান?

সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। ইহা আপনার কর্ম্মফল। বিধাতার কৃপা ব্যতীত কর্ম্মফল অতিক্রম করা যায় না। আপনার প্রাণে যে চিন্তা ছিল, তাহাই আপনার প্রাণ এইরূপে দগ্ধ করিত, ঐ বালক উপলক্ষ্যমাত্র ও আপনার শিক্ষার পুত্তলিমাত্র। আপনি যে শিক্ষার বীজ রোপিত করিয়াছেন, তাহা অমৃত-ফল প্রসব করিতে পারে না, ইহা আপনি যদি এখনও না বুঝিয়া থাকেন, স্বর্গের দেবতা অবতীর্ণ হইয়াও আপনাকে এ রহস্য বুঝাইতে পারিবে না।

বৃদ্ধ। ঈশ্বর ব্যতিরেকে কি ধর্ম্মসাধন হয় না?

সন্ন্যাসী। কিসের ধর্ম্ম?

বৃদ্ধ। ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝেন।

সন্ন্যাসী। ঈশ্বরই ধর্ম্ম। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া ধর্ম্ম অর্থহীন প্রলাপবাক্য। মানবের সেবা, পরহিত ব্রত—এ সকল মনুষ্য জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু ইহাই ধর্ম্ম নহে। তুমি "মা" নামের মহিমা কখন বুঝিতে চাহ নাই, প্রাণ ভরিয়া কখন 'মাকে' ডাক নাই—কাজেই এ মহারসের আস্বাদ পাও নাই। যে মহাসাগরের মহানৃত্য দেখিয়াছে, সে ক্ষুদ্র সরোবরের শোভায় বিমুগ্ধ হয় না।—এখন এস, এই নির্ম্মল উষায়, একবার জাহ্নবীতীরে বেড়াইয়া আসি। হরি-হীন জীবন অনেকদিন ত কাটাইলে, কত সুখ, কত

শান্তি পাইয়াছ, তাহা তুমিই জান। এখন এস, পূত-জাহ্নবী সলিলে অবগাহন করি; স্নানান্তে আর একবার মায়ের চরণামৃত পান করি। একবার প্রাণ ভরিয়া 'মা'কে ডাক, দেখ এ জ্বালাময় হৃদয় শান্ত হয় কি না! নিজের যে গণ্ডীমধ্যে নিজেকে এতদিন আবদ্ধ রাখিয়াছিলে, দেখ মায়ের গণ্ডী তার অপেক্ষা কত বড়!

আমি বারাণসীর পথে এই বৃদ্ধকে দেখিয়াছি। কি পরিবর্ত্তন। চোখের জলে বুক ভাসিতেছে, যে কাছে আসিতেছে, তাহার পদধূলি মস্তকে লইয়া বলিতেছেন—"ভাই, 'মা'কে ডাক, তাঁর চরণামৃত পান করিয়া ভবজ্বালা দূর কর!" কালো মেঘে মেঘে ঘর্ষণ হইয়া যেমন মনোরম বিদ্যুতের উৎপত্তি, কালো তরঙ্গে তরঙ্গে যেমন শুভ্র ফেন পুঞ্জের সৃষ্টি, সংসারের নানা ঘাত প্রতিঘাতে তেমনি সেই নিরীশ্বরবাদী বৃদ্ধের হৃদয়ে প্রেমোদয়! আমি অবাক হইয়া তাঁহার জীবনের কাহিনী শুনিতেছিলাম।

তিনি বুঝাইলেন, মায়ের চরণামৃতই তাঁহাকে প্রেমোন্মাদ করিয়াছে!

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

ফকির লালন সাঁই।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৩ পৃষ্ঠার পর।)

লালনের পিতা, গৃহে উপনীত হইয়া, নির্দ্দয় নির্ম্মম হৃদয়ে তাঁহার পুত্রবধূকে পুত্রের মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিলেন। পুত্রবধূ স্বামীর শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। বালিকার সে রোদন, সে হাহাকার ধ্বনি, শুনা দূরের কথা, মনে করিলেও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। আর্য্যশাস্ত্রের কঠোর বিধানে, সমাজের কঠিন শাসনে আজ লালনের বালিকা পত্নীকে বিধবা ব্রহ্মচারিণী উদাসিনীর বেশ ধারণ করিতে হইল। আজ হইতে সংসার যেন বালিকাকে জন্মের মত পৃথক করিয়া দিল; সংসার যেন বালিকাকে তীব্র কঠোর দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল; আজ হইতে সংসার যেন বালিকার এ জীবনের বড় একটা প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে চাহে না। অহো! বালিকার কি ভাগ্য-বিপর্য্যয়! কি দৈব-বিড়ম্বনা!

এদিকে একটী প্রৌঢ়া মুসলমান রমণী কলসীকক্ষে পুষ্করিণীতে জল

আনিতে গিয়া দেখিলেন, পুষ্করণীর ধারে মৃত্যুমুখ-পতিত এক ব্যক্তি দারুণ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে বারম্বার হা করিতেছে। স্ত্রীলোকটী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া ধীরে ধীরে তাহার মুখে প্রদান করিতে লাগিলেন। লালন পান করিয়া, যেন একটু শান্ত ও সুস্থভাবে শূন্য দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। একে রমণী স্বভাবতঃ স্নেহময়ী, দয়ার্দ্র-হৃদয়া, তাহার উপর আবার স্ত্রীলোকটী একটী সাধু মুসলমানের গৃহিণী। লালনের এইরূপ সকরুণ চাহনি, এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার স্নেহার্দ্র পবিত্র হৃদয় স্নেহে বিগলিত হইয়া গেল, তাঁহার সুকোমল সকরুণ প্রাণ ক্ষণমাত্র স্থির থাকিতে পারিল না। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি গৃহে গিয়া স্বামীর নিকট এই শোচনীয়-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার পতি দীনাতিদীন ফকিরের বেশধারী। মস্তকে রুক্ষ জটাভার, বক্ষস্থল পর্য্যন্ত শ্মশ্রু-রাশি পরি-শোভিত, কণ্ঠদেশে তজ্‌বি-মালা দোদুল্যমান, পরিধানে কৌপীন ও বহির্ব্বাস, মুখকমলে মৃদু মধুর হাসি। তাঁহার মূর্ত্তিখানি শান্ত, গম্ভীর, স্বর্গীয় পবিত্রভাব বিজড়িত। তাঁহার সে সাধকমূর্ত্তি দর্শন করিলে প্রাণে প্রেম-ভক্তি স্বতঃই সমুদিত হয়। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর কথা শ্রবণমাত্র, ব্যাধিপ্রপীড়িত মৃতকল্প লালনকে স্বীয় পর্ণকুটীরে, আপন সাধনাশ্রমে, অতি যত্নসহকারে আনয়ন করিলেন। ভাই, যাঁহারা সাধু, যাঁহারা মহাত্মা মহাজন; তাঁহাদের নিকট ত হিন্দু মুসলমান নাই, স্বজাতি বিজাতি নাই; ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ নাই; তাঁহারা যাহাকে বিপন্ন, যাহাকে বিপাকে পতিত দেখেন, তাহাকেই রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। তাহাকেই বিপত্তি হইতে মুক্ত করিতে প্রয়াস পান। তাঁহারা ভিন্নজাতি, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বিপন্নকে ক্রোড় দিতে, অনাশ্রিতকে আশ্রয় প্রদান করিতে কথনও কুণ্ঠিত, কথনও সঙ্কুচিত হ'ন না। তাঁহাদের যে সর্ব্বপ্রাণীতে সমান দয়া, সর্ব্বজীবে সমান স্নেহ, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি। বালক লালন, স্নেহময়ী মুসলমান রমণী ও তাঁহার ধর্ম্ম-প্রাণ পতির আন্তরিক যত্নে ও সেবাশুশ্রূষায় এবং জগদীশ্বর জগন্নাথের কৃপায় পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। হারাইলেন কেবলমাত্র একটী চক্ষুরত্ন।

দারুণ ব্যাধির কঠিন হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া লালন, আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ব্বক পর্ণকুটীরবাসী দীন মুসলমান সাধককে পিতা এবং তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণা পত্নীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারাই আমার প্রকৃত পিতা মাতা। আপনারাই আমার প্রতি যথার্থ

পিতা মাতার ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। আর,—আর যাঁহার ঔরসে আমার জন্ম, তিনি অন্নদাতা-পিতা হইলেও পিতার ন্যায় কার্য্য করেন নাই। ঘোর বিপদকালে যে পিতা, আপন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য, আপন জীবন-রক্ষা করিবার জন্য পুত্রকে ফেলিয়া রাখিয়া পলায়নপর হ'ন, সে পিতা হইলেও শত্রুসদৃশ। আজ আপনারা যদি আমার 'বাপ, মা' হইয়া না দাঁড়াইতেন, তবে আর আমার জীবনরক্ষা হইত না!" বস্তুতঃই আজ যদি এই মুসলমান সাধু ও তাঁহার পত্নী লালনের জীবন রক্ষার কারণ হইয়া না দাঁড়াইতেন, তাহা হইলে হয় ত আর আমরা লালনকে এ জগতে দেখিতে পাইতাম না।

লালন স্বীয় পিতার নির্দ্দয়তা, স্বীয় পিতার নির্ম্মমতা স্মরণ করিয়া এ বিশ্ব-জগতের অনিত্যতা, এ ভব-সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—সংসারের সারবস্তুকে ভুলিয়া যে জন, অসার সংসারে 'এ আমার পিতা, ও আমার মাতা, এ আমার ভ্রাতা, ও আমার ভগিনী—' বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করে, সে ভ্রান্ত; সে জানে না—এ জগৎ-সংসার স্বার্থপর, স্বার্থে এ বিশ্ব-সংসার পরিচালিত। এ সংসারে আমার বলিতে সেই একমাত্র ভগবান, একমাত্র জগৎপিতা জগন্নাথ! লালন ভাবের আবেগে ভগবানকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ভগবন! হে পরমেশ! আজ তোমার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, আজীবন তোমার সাধন-ভজন, তোমার উপাসনা আরাধনা করিব। লোকে সুখ্যাতি করুক বা নিন্দা করুক, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তুমি ত নাথ! হিন্দুরও নহ, যবনেরও নহ; তুমি তাহার—যে তোমার ভক্ত, যে তোমাকে আপন করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে।" আজ হইতে—আজ হইতে লালন সত্যসত্যই সংসার-বিরাগী, ভগবদনুরাগী হইলেন। তাই, বড় শুভক্ষণেই লালনের বসন্ত-রোগ হইয়াছিল, পূর্ণ মাহেন্দ্রযোগেই পিতা তাঁহাকে মৃত্যুশয্যায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন! পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই লালনের মনঃপ্রাণ কি এক পবিত্র উদাসভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অমৃতময় শান্তিরাজ্যের দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল; সংসার যে মায়াময় মিথ্যা, তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মর্ম্মে মর্ম্মে সংসারের এই অনিত্যতা স্মরণ করিয়াই বুঝি এক সময় লালন করুণ স্বরে গাইয়াছিলেন,—

আপন আপন, ক'র না রে মন,
যেতে হবে একদিন শমন-আলয়।

একলা যেতে হবে, কোথায় রবে সবে,
যাবার বেলা দেখ কেহ কারো নয়॥
অনিত্য এ দেহ, মিছে ধন্ধ-বাজি,
সৎকর্ম্মে মন, সদাই থেকো রাজি,
কুপথে গমন, ক'র না রে মন,
ভবে, কালের ডঙ্কা বাজে, শুনে লাগে ভয়॥
এ দেহ যে দিন মৃত্তিকায় মিশাবে,
ধনাদি রতন, কোথায় প'ড়ে রবে,
সোণার সিংহাসন, কিছুই নয় আপন,
সেদিন, খালি হাতে যেতে হবে রে নিশ্চয়॥
আসার বেলা দেখ, শুধু হাতে আসা,
ভবে এসে মিছে কতই কর আশা,
ভবে, সোরাজ সাঁইর চরণ, লালন করে স্মরণ,
আমার, এই চরণ বঞ্চিত হ'লে, কি হবে উপায়!

লালন কিয়দ্দিবস ৺পুরীধামে উক্ত মুসলমানের পর্ণকুটীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। কুটীরকর্ত্রী মুসলমান-গৃহিণী শাকান্ন যাহা রন্ধন করিতেন, তাহাই লালন, জননীর রন্ধন মনে করিয়া, অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিতেন। কিছুদিন পরে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইলে, লালন তাঁহাদের পদপ্রান্ত হইতে অতি বিনয় ও নম্রতার সহিত বিদায় গ্রহণ করিয়া, কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে স্বদেশে স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভোলানাথ মজুমদার।

বারাণসী রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম।

গৃহ নির্ম্মাণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা।

বারাণসী রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের বিষয় সংবাদপত্র-পাঠকবর্গ বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। যাঁহারা এখনও অবগত নহেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য সংক্ষেপে উহা লিখিত হইল।

উদ্দেশ্য।—স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়াদি বিচার না করিয়া সকল নিঃসহায় পীড়িত মুমূর্ষু জরাগ্রস্ত এবং অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা।

উপায়—(ক) রাস্তা ঘাট এবং বাড়ী বাড়ী অন্বেষণ করিয়া ঐরূপ ব্যক্তিদিগকে বাহির করিয়া আশ্রয়, ঔষধ, পথ্য, খাদ্য, বস্ত্রাদি যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহাকেই তাহা দেওয়া।

(খ) যাহারা গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হাঁসপাতালে যাইতে রাজি, তাহাদের তথায় আশ্রমের খরচে প্রেরণ।

(গ) নিঃসম্বল ব্যক্তিদিগের মৃত্যু হইলে জাতি ও ধর্ম্মানুযায়ী সৎকারের ব্যবস্থা।

(ঘ) মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যাঁহারা অবস্থা বিপর্য্যয়ে এককালে নিঃস্ব ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন, অথচ সাধারণের দানস্থলে গমন করা অপেক্ষা অনশনে জীবনত্যাগও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করেন, তাঁহাদের অন্বেষণ করিয়া গোপনে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান।

এক কথায়, সেবকগণের শারীরিক পরিশ্রমে এবং ভিক্ষা ও চাঁদালব্ধ অর্থে "দরীদ্র নারায়ণ"গণের যতদুর সেবাশুশ্রূষা করা সম্ভব, এই সেবাশ্রমে সেই সমুদয় সেবাই করা হয়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৯০৮ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ৮ বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ৯২০১ ব্যক্তি এই সেবাশ্রমের সাহায্য পাইয়াছে।

রামাপুরা পল্লীস্থ একটী ভগ্নবাটীতে অনেকদিন ধরিয়া উক্ত সেবাশ্রমের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু স্থানটি তত স্বাস্থ্যকর ও প্রশস্ত না হওয়ায় উত্তমরূপে সেবাকার্য্য চলিতেছে না। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে সেবাশ্রমের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। তাহার ফলে এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৮৯৩৪৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বারাণসীর লাক্সা নামক পল্লীতে চার-বিঘা জমি খরিদ হইয়া ১৯০৮ সালের ১০ই এপ্রেলে তাহার ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত হয় এবং ৭ই অক্টোবর রামকৃষ্ণ-মিশনের স্বামী বিজ্ঞানানন্দের (ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার) তত্ত্বাবধানে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সংক্রামক এবং অন্যান্য রোগগ্রস্ত ৩৫ জন রোগীকে যাহাতে স্বচ্ছন্দে স্থান দেওয়া যাইতে পারে, এরূপ স্থান-বিশিষ্ট গৃহসমূহ বর্ত্তমান বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালী অনুসারে নির্ম্মিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে যে যে রোগীগৃহ নির্ম্মাণ-কল্পে দান স্বীকৃত হইয়াছে, সে সকল রোগীগৃহের ছাদ পর্য্যন্ত গাঁথনি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ঐ সকল গৃহনির্ম্মাণ সম্পূর্ণ

হইলে উহাতে ২৩ জন মাত্র রোগীর স্থান সঙ্কুলান হইবে। এখন অভাব—আরও ১২ জন রোগীর থাকিবার গৃহসমূহ এবং আশ্রম-সেবক ও ভৃত্যদের বাসোপযোগী গৃহ, রন্ধনশালা, পাইখানা প্রভৃতি। ঐ সকল নির্ম্মাণকার্য্যে অন্ততঃ আরও ২০০০০৲ টাকার প্রয়োজন।

ভারত চিরকাল দানের জন্য প্রসিদ্ধ। সেবকগণ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া এই কার্য্যটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখন তাঁহাদের প্রাণের ইচ্ছা—যাহাতে ইহা স্থায়িত্ব লাভ করে। সেবকগণ সকলেই সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী। তাঁহাদের নিজেদের ত কোন সম্বল নাই। তদ্ব্যতীত তাঁহারা সমর্থপক্ষে নিজেদের আহারাদি পর্য্যন্ত সেবাশ্রম হইতে না করিবার চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে ইহার দায়িত্ব আপনাদের উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা পাঠকমহাশয়দিগের প্রত্যেককে অনুরোধ করিতেছি, যাঁহাদের সুবিধা হয় তাঁহারা স্বয়ং কাশীতে যাইয়া সেবাশ্রমের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া আসুন। অথবা—কাশীতে সকলেরই কোন না কোন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদের দ্বারা ইহার সংবাদ লউন। তারপর যদি আপনার ঐ কার্য্যটি যথার্থ লোকহিতকর বলিয়া ধারণা হয়, তবে আপনারা যথাসাধ্য এ বিষয়ে সাহায্য করুন এবং বন্ধুবান্ধবকে অনুরোধ করিয়া সাহায্য করান। আর এইরূপে "দরিদ্র নারায়ণ" সেবারূপ শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের সহায়তা করিয়া নিজেরা ধন্য ও দরিদ্রগণের আশীর্ব্বাদভাজন হউন। ইতি—

ভগবৎ সন্নিধানে নিয়ত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী

ব্রহ্মানন্দ (স্বামী)

(অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ-মিশন)

পুঃ। সেবাশ্রমের সাহায্যকল্পে যাঁহার যাহা কিছু দেয় অনুগ্রহ করিয়া সহকারী সম্পাদক, রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, রামাপুরা, বেনারস সিটি, অথবা অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ-মিশন, বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া, এই ঠিকানায় পাঠাইলে বাধিত হইব। দানের হার অত্যল্প হইলেও কৃতজ্ঞতার সহিত যথাযথ স্বীকার করা হইয়া থাকে।

———

প্রার্থনা।

(১)
তোমারে ডাকিতে কভু,
হইলে কাতর ;
পাপী ব'লে বুঝি আমি,
পাইনা উত্তর।

(২)
শুনি তব নামে হয়,
সুধা বরিষণ— ;
মুক্ত হয় জীব, নাম
লইলে শরণ।

(৩)
অমল তোমার কীর্ত্তি,
যুগে যুগে নর ;
গাইছে বিশ্বাসে তারা,
করিয়া নির্ভর।

(৪)
আমি তবে কেন একা,
চলেছি ভাসিয়া ;
মহাপাপ-সিন্ধু-নীরে,
তোমারে ভুলিয়া।

(৫)
লক্ষ্যভ্রষ্ট-প্রাণহীন,
জড়ের মতন ;
কেন আমি থাকি সদা,
হয়ে অচেতন।

(৬)
নিত্য এত ঘটিতেছে,
দশা বিপর্য্যয় ;
তবুও না হয়,
মম জ্ঞানের উদয়।

(৭)
কাল-বক্ষে অহরহ,
জলবিম্ব প্রায়
জন্মিতেছে সুখ দুঃখ,
পাইছে বিলয়।

(৮)
মহাকাল এইরূপে,
উল্লাসে মাতিয়া ;
করিছে তাণ্ডব নৃত্য,
সর্ব্বস্ব নাশিয়া।

(৯)
প্রকৃতি-প্রমোদ-বনে,
যা' কিছু সুন্দর ;
করাল কালের স্রোতে,
ভাসে নিরন্তর।

(১০)
এত দেখি, এত শুনি,
তবু কেন হায় ;
পাপেতে আসক্ত মন,
তোমারে না চায়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

একটী মুমুক্ষু প্রাণ।

গভীরা নিশিথিনী। সহসা একটী প্রাণ স্পন্দিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল "সর্ব্বই নশ্বর"। দেখিতে দেখিতে একখানি সুন্দরমূর্ত্তি রাজ-প্রকোষ্ঠ

পরিত্যাগ করিল। সঙ্গে অশ্ব ও অশ্বপালক। অশ্বপালক রাজপুত্রের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিল। নীরবে নিদ্রা-জড়িত নয়নে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। আর সেই মুমুক্ষু প্রাণখানি তমোময়ী রজনীর গাঢ়তমসাতিক্রম করিয়া বুঝি মানস তমো অতিক্রম করিবার জন্য আলোকের অনুসন্ধানে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

যাইতে যাইতে একটী করুণ অস্পষ্টস্বর তাহার কর্ণগোচর হইল— "অবলা নারীর বল তুমি, তাহাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া—তাহার হৃদয় রঙ্গমঞ্চে মর্ম্মভেদী অভিনয় খেলাইতে প্রয়াস পাইয়া কোনদিকে ধাবমান হইতেছ?" সেই উদাসীন প্রাণের ভিতর থেকে যেন একটা কথা বহির্গত হইল "সবই নশ্বর।"

রাজপুত্র এইবার নিরাপদে পদবিক্ষেপ করিতেছেন, সম্মুখে একখানি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন। তাহাতে লেখা আছে "রাজপুত্র, রাজসিংহাসন শূন্য করিয়া কোথায় চলিলে? পিতা বৃদ্ধ, তুমিই রাজ্যভার, রাজৈশ্বর্য্য সকল গ্রহণ করিবে।"

এবার একটু গম্ভীরতরভাবে প্রত্যুত্তর আসিল, সেই পূর্ব্বপরিচিত শব্দ-যুগল "সবই নশ্বর।"

নির্ব্বাণের অনুসন্ধানে অনুসন্ধিৎসুপ্রাণ আজ ওষ্ঠাগত। "আর ফিরিব না, চক্ষু আর মুদিব না, আর ঘুমাইব না। অরণ্যের মধ্যে শুষ্ক বিহঙ্গম-ত্যক্ত বৃক্ষরাজির যে পরিণাম, বৃদ্ধদশায় উপনীত বন্ধুবান্ধব পিতা মাতা ভাই ভগিনী পরিত্যক্ত মানবেরও সেই পরিণাম। তবে সবই নশ্বর। আর মিছে মায়ায় ভুলিব না। মানবের জন্য একটা অমৃতের সন্ধানে ফিরি। যাহা পান করিলে সে অমর হইবে। বার বার মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিবে না।" অন্তরে অন্তরে মৃদুমন্দভাবে রাজপুত্রের হৃদয়পটে এই কথাগুলি অঙ্কিত হইল।

প্রাণ মুমুক্ষু, কিন্তু মায়া ছাড়িবে না। যে কখনো যশোধরারূপে, কখনো রাজসিংহাসনরূপে, কখনো বা ভাবি-বিভীষিকারূপে, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মায়া! তত্ত্ব-পিপাসু প্রাণকে তুমি পরাজয় করিবে? সাধ্য কি?

এইবার রাজপুত্র বিচিত্র-খেলা খেলিতে লাগিলেন। অশ্বপালক মুক্তার হারগাছটী লইয়া একবার প্রসন্ন একবার বিষণ্ণ হইয়া প্রত্যাগত হইল। এদিকে মার্জ্জার যেমন ইঁদুরকে একবার ধরিয়া একবার ছাড়িয়া তাহার সহিত খেলা করিতে করিতে তাহাকে মারিয়া ফেলে, রাজপুত্রও তাহাই করিলেন।

একবার তিনি মায়ার আশ্রয় করেন—তারপর সমস্ত কাকবিষ্ঠাবৎ মনে করিয়া ফেলিয়া দেন। এইরূপে মায়া-রাক্ষসী মরিল। তিনি নিষ্কণ্টক হইলেন। যাহার সন্ধানে স্বার্থত্যাগ, তিনিই তাঁহার জীবনের নিত্য-অভাব দূর করিতে লাগিলেন। মুমুক্ষু প্রাণ শেষে যাহা লইলেন—একা একা সম্ভোগ করিলেন না। সংসারকে ডাকিলেন। ভাগ্যবান দুই হাত পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিল। হতভাগ্যগণ কর্ম্মদোষে বর্জ্জন করিল।

সেই প্রাণখানি বুদ্ধদেবের। হায় রে সংসার! একটা মড়া দেখে, একটা জরাজীর্ণ শীর্ণকায় মানব দেখে, কাহারও চেতনা লাভ হয়;—আবার শত শত কাতর প্রার্থনা, টীকা টীপ্পনি—শত সহস্র উদাহরণমালাও কাহার নিকট পরাস্ত হইয়া যায়॥

গৌতম! তুমি কোথায়? বোধ হয়, জলন্ত ত্যাগের মধ্যে তুমি লুকাইত! ত্যাগের আশ্রয়ে বুঝি মানব তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পায়? সামান্য একবিন্দু কৃপার ভিখারী আমি, জানি—তোমার কটাক্ষে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সম্ভব। তবে ত্যাগের জন্য আর ভাবিব না। তোমার কৃপাকণাতেই সেই দিব্যদৃষ্টি আপনিই আসিবে। ত্যাগ-ধন মানবের করায়ত্ত নয়। তোমার অক্ষয়ভাণ্ডার হইতে সামান্য একটু ব্যয় কর—সমুদ্রতীরবর্ত্তী উপলমালা হইতে একখণ্ড আনিলে সংখ্যার ন্যূনতা প্রতীয়মান হয় না।

যে সংসারের মধ্যে নীলগগনে নীরদমালা, মনোহারী পুষ্পে কীট, কোমল পত্রে কাঁটা, অমৃতময় মানব প্রাণে অধর্ম্ম, সে সংসার থেকে তুমি দূরে—সুদূরে লইয়া যাও। তোমার রাজ্যে একবার বাস করিয়া প্রাণখানা জুড়াই। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন গুপ্ত।

শ্মশান।

সমবেদনায় আদর্শ ধরায়—
তুমি হে শ্মশান সুখের স্থান।
যে বলে বলুক কঠোর তোমারে
আমি ভালবাসি তব বয়ান॥

প্রেমিক প্রেমিকায় ধরিয়া গলায়—
তব কোলে শেষে করে শয়ান।
পুত্র শোকাতুরা মুছে অশ্রুধারা
সুশীতল করে তাপিত পরাণ।
পতি বিয়োগিনী বিধুরা কামিনী
জুড়াইতে জ্বালা আসে শ্মশান।
স্থবির স্থবিরা বালক বালিকা
রসিক রসিকা দেখ সমান॥
বীর বেশে আসে অসি পূর্ণ কোষে
অতুবের পাশে করে শযান।
কোটীপতি ধনী কিম্বা রাজরাণী
ভিখারিণী সহ সমান স্থান॥
কত কবি আসে দেশ পূর্ণ যশে
মূর্খ দস্যু পাশে সম বিধান।
জ্ঞানময় ঠাঁই তব সম নাই
তুমি সে শিখাও নির্ব্বিকল্প জ্ঞান॥
অতি বলবন্ত দানব দুর্দ্দান্ত
এক দণ্ড এলে তোমার স্থান।
ফিরে যবে যায় বৈরাগ্য উদয়
নরক হৃদয়ে সুরভি-ঘ্রাণ॥
দুর্য্যোধন-মান শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান
ভীম-ভীমবল তুমি হরিলে।
চিতোর থর্ম্মাপলী কুরুক্ষেত্র স্থলী—
ভীষণ সমর তুমি নিবা'লে॥
যে যে ভাবে ভব— কর্ম্ম ভূমে আসি
সাধি নিজ কাজ লভে বিরাম।
ভেদাভেদ ভুলি লও কোলে তুলি
শান্তিময়ী কোলে পায় আরাম॥
দেব পশুপতি তোমাতে বসতি
সাধে কি করেছে ছাড়ি বিলাস।

এ জগতে তুমি চির শান্তি ভূমি
তব সম নহে স্বরগ-কৈলাস॥
চিতা ভস্ম রেণু মাখে গায় স্থানু
অনুমান এতে আমার হয়।
দম্ভ অভিমান ধন যশ জ্ঞান
সম পরিণাম হ'য়েছে যায়॥
সাধে কিহে বিভু রামকৃষ্ণ প্রভু
শ্মশানে প্রাসাদে সমান জ্ঞান।
সর্ব্ব পরিণাম এক কেন্দ্রে স্থান
সর্ব্ব মূল এক যাঁর বিধান॥

শ্রীবাণীকান্ত রায়।

সেবক নিবারণচন্দ্র।

ভক্তপ্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবক নিবারণচন্দ্র দত্ত আজ ৩ বৎসরকাল ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া, চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রতি বৎসর স্নানযাত্রার দিন তাঁহার পবিত্রস্মৃতি আমাদের অন্তরে জাগিয়া উঠে। এই দিনে তিনি তাঁহার গৃহে ঠাকুরের বিরাট উৎসব করিয়া, তাঁহার জানিত সমস্ত ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, ঠাকুরের প্রসাদ পরিতোষরূপে খাওয়াইতেন এবং ঠাকুরের নাম কীর্ত্তন করিয়া পল্লী মাতাইয়া তুলিতেন এবং সকলের প্রাণে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় আনন্দ ঢালিয়া দিতেন। এবারেও তাঁহার জনৈক আত্মীয় তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে এই দিনে তাঁহার বাটীতে ঠাকুরের উৎসব করিয়া কয়েকজন ভক্তকে প্রসাদ পাওয়াইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। সেবক নিবারণ যদিও ধরাধামে নাই, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি চিরদিনই থাকিবে। তিনি যে সমস্ত সংগীত রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বড়ই মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। আমরা নিম্নে কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:।

রামকৃষ্ণ সংগীত।

(৩১)

আমার রামকৃষ্ণ গুণমণি।
আমার রামকৃষ্ণ গুণমণিরে,
আমার রামকৃষ্ণ গুণমণি॥

রামকৃষ্ণ ধ্যান, রামকৃষ্ণ জ্ঞান,
(ও মন) ভাব রামকৃষ্ণের চরণ দুখানি ॥
এ সংসারে কেবল সার রামকৃষ্ণ,
সকলি অসার বিনা রামকৃষ্ণ,
ভজ রামকৃষ্ণ, জপ রামকৃষ্ণ,
(ও মন) বল রামকৃষ্ণ দিবাযামিনী ॥
লাজ ভয় মান দিয়ে বিসর্জ্জন,
রামকৃষ্ণ নাম বল অনুক্ষণ,
ঐক্য করিয়ে তব প্রাণ মন,
কর রামকৃষ্ণ নাম জয়ধ্বনি।
অতি সুধাময় রামকৃষ্ণ নাম,
রামকৃষ্ণ নামে পূরে মনস্কাম,
ওরে মন যদি যাবি নিত্যধাম,
রামকৃষ্ণ পদে মিশে যা এখনি ॥

(৩২)

বিপদভঞ্জন, অনাথশরণ,
কোথা রামকৃষ্ণ পতিতপাবন।
হ'য়ে কৃপাবান, দীনে কর ত্রাণ,
বিশ্বপতি প্রভু সত্যসনাতন ॥
তব পথে প্রভু করিতে গমন,
পদে পদে বাধা পাই অনুক্ষণ,
রিপু ছয়জন, মোরে প্রতিক্ষণ,
তোমা হ'তে দূরে করায় ভ্রমণ—
এ ঘোর শঙ্কটে করিতে উদ্ধার,
তোমা বিনা প্রভু কে আছে আমার,
তাই বারেবার, চরণে তোমার,
জানাতেছি মম দুখ বিবরণ ॥
তব কৃপায় তরে পতিত জন,
তাই তব নাম পতিতপাবন,

দাও শ্রীচরণ, অধমতারণ,
অভয় চরণে লইনু শরণ॥
মূঢ়মতি আমি অতি দীন হীন,
ভজন পূজন সাধন বিহীন,
ওহে ভক্তাধীন, তব এ অধীন,
ভরসা করে হে তব শ্রীচরণ॥

(৩৩)

রামকৃষ্ণ নাম বল অনিবার।
রামকৃষ্ণ নাম বিনা ভবে কি ধন আছে আর॥
রামকৃষ্ণ নাম বিনা সকলি ভবে অসার,
রামকৃষ্ণ নামে দূরে যাবে অজ্ঞান আঁধার॥
শোক পরিতাপ ভয়, কাম আদি রিপু ছয়,
তার না নিকটে যায়, রামকৃষ্ণ নাম ভরসা যার॥
যেই রামকৃষ্ণ ব'লে, ডাকে তাঁরে প্রাণ খুলে,
দয়াল রামকৃষ্ণ তারে করেন ভব সিন্ধুপার॥
তাই বলি মন তোরে, ডাকি তাঁরে প্রাণ ভরে,
ছিন্ন কর মায়া ডোরে, হিত যদি চাও তোমার॥
বৃথা অনিত্য বিষয়ে, কেন রে আছ মজিয়ে,
ডাক সেই প্রেমময়ে ঘুচিবে সংসার ভার॥
নিলে তাঁর পদাশ্রয়, যাবে তোর ভবভয়,
তিনি অনাথ-আশ্রয়, এ ভবের কর্ণধার॥
জয় রামকৃষ্ণ জয়, গাও রামকৃষ্ণ জয়,
বল রামকৃষ্ণ জয়, রামকৃষ্ণ সারাৎসার—
রামকৃষ্ণ সত্যসার, রামকৃষ্ণ প্রাণাধার,
রামকৃষ্ণে ডাক মন, খুলিয়ে হৃদয়দ্বার।
রামকৃষ্ণ পরাৎপর, নিরঞ্জন নির্ব্বিকার,
রামকৃষ্ণ অনন্ত অপার শুদ্ধ জ্ঞানাধার॥

(৩৪)

(নাথ) শ্রীমুরতি মনে হ'লে সব দুঃখ যায়।
নিরাশ আঁধারে আশা-রবি হয় উদয়॥

দূরে যায় শোক তাপ, ঘুচে সকল সন্তাপ,
(তব) প্রীতি-রসে মজে মন হয় মধুময় ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।
শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

শ্রাবণ, সন ১৩১৬ সাল।

ত্রয়োদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০ পৃষ্ঠার পর)

সময়ের অল্পতা।

(পৃথিবীর বহু মূল্য সময়।)

"My days are swifter than a weaver's shuttle." Job VII. 6. "Walk while ye have the light, lest darkness comes upon you." XII. 35.

কামিনী-কাঞ্চন-প্রসঙ্গের উপসংহার করিয়া পাঠকপাঠিকাগণের সমক্ষে একটী গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। আমরা সর্ব্বদাই আলস্য জড়িত। যাহা বর্ত্তমানে করিতে হইবে, তাহা করিতে আমরা মাসাবধি কালহরণ করিয়া থাকি। স্বাধীনতাপ্রিয় বিহঙ্গম কিছুদিন পিঞ্জরাবদ্ধ হইবার পর তাহার স্বাধীনাকাঙ্ক্ষার এতই ন্যূনতা প্রতীয়মান হয় যে, পিঞ্জরের দ্বার উন্মুক্ত করিলেও সে পিঞ্জরের উপরে গিয়া বসে, তবু উড়িয়া যায় না। আমরাও এই সংসার-পিঞ্জরে নিরন্তর আবদ্ধ থাকিয়া এতই পরতন্ত্রতা শিখিয়াছি যে, আমাদের বন্ধন কেহ মোচন করিয়া দিলেও আমরা সে সুযোগের অবহেলা করিয়া থাকি। পথিপার্শ্বে তমসাবৃত প্রকোষ্ঠে গৃহীতবাস পথিক সহসা কোনো প্রদীপধারীকে দেখিয়া যেমন আমোদে আত্মহারা হইয়া সাহায্যলাভাশায় তাহার অনুগমন করে, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন সংসারবাসীও আজ জ্ঞানপ্রদীপধারী রামকৃষ্ণকে সম্মুখে পাইয়া ইষ্টপ্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষায়

তাঁহার অনুগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু হতভাগ্য সুপ্তপথিক যেমন সেই প্রদীপধারীর সাক্ষাৎ লাভ করে না বা আলোকের উপকারিতা পায়না, সেইরূপ তমোগুণে জর্জ্জরীভূত, আলস্য-বিজড়িত সুপ্তপ্রায় মানবও সেই জ্ঞান ভক্তি প্রদীপধারীর সাক্ষাৎ পাইতে পারে না। এস্থলে একটী কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, পথে ভ্রাম্যমান মানব আপনার কার্য্য সাধন করিতে যাইবার রাস্তায় অজানিত ভাবে অপরের উপকার সাধন করিয়া যায়। কিন্তু যুগাবতার রামকৃষ্ণ যেমন 'পরিত্রাণায় সাধুনাম্' অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তেমনি পতিতপাবন অধমতারণরূপে ভ্রান্ত, সুপ্ত, পতিত, অক্ষম এবং অসহায় নরনারীকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনয়ন করিতেও শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। তরুবর নিজে অসহ্য রৌদ্র তাপ সহ্য করে, কিন্তু আশ্রয়ীকে অনাতপ প্রদানে বঞ্চিত হয় না। তরোরিব সহিষ্ণু রামকৃষ্ণ জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার অনুষ্ঠান করিলেন, জগৎবাসী নরনারী তাহার ফল ভোগের অধিকারী হইল। বাতি আপনি পুড়িয়া ধ্বংস হইতে থাকে, কিন্তু অপরকে আলোক প্রদান যেন তাহার ব্রত বলিয়া মনে হয়, নিজের ধ্বংসের দিকে যেন কোনো লক্ষ্য নাই। ঠাকুর রামকৃষ্ণও সেইরূপ কঠিন সাধনা করিয়া শরীর পাত করিলেন, কিন্তু যে আলোক জ্বালিয়া দিয়াছেন, বোধ হয় তাহা গভীর অন্ধকারাবৃত ভারতালয়ে—শুধু ভারতালয়ে কেন সর্ব্বত্র—আলোকমালা বিকীরণে জগৎকে আলোকময় করিয়া তুলিবে। আমরা বলিতেছিলাম যে, এই সময়টী পৃথিবীর পক্ষে বহুমূল্য সময়। কেন? পাঠক! একবার শিশুসুলভ বিশ্বাস ও সরলতার কোলে বসিয়া শুনিয়া লও যে, পর-দুঃখকাতর, কাঙালসহায়, দীনদয়াময় প্রভু রামকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন—

"আমি (জন্ম হইতে) ১০০ বৎসর পৃথিবীর উপর পা দিয়া থাকিলাম। যাহারা এর মধ্যে আমায় জানিতে পারিবে, তাহারা যথার্থ মুক্ত। এই একশত বৎসরের পর বিপ্লব আরম্ভ হইবে। তখনও একবার আসিব। তখনও যদি কেহ বুঝিতে না পারে, তাহার উদ্ধার বড়ই কঠিন হইয়া পড়িবে।"

এই তো হইল ভগবানের কথা। এখন বিশ্বাসী ভক্ত কোথায়? কে বা বোঝে, কা'কেই বা বোঝান যায়? যুক্তিজালসমাচ্ছন্ন তমোগুণ প্রধান মানবকে বুঝাইবার প্রয়াস বিড়ম্বনামাত্র। তবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, পিপাসায়

অস্থির প্রাণ পথিক মাত্রেই পিপাসা নিবারক বস্তুর অন্বেষণ করিতে করিতে রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যে উপস্থিত হইয়া অমৃত পান করিয়া অমর হইবেন। তবে যদি এরূপ কেহ থাকেন, যিনি পিপাসায় অস্থির হইয়াও জলের অন্বেষণে বীতস্পৃহ, তাঁহার ভাগ্যের নির্ণয় আমরা করিতে পারিব না। নচেৎ একথা সকলেই জানেন যে, পিপাসা পাইলে আর বসিয়া থাকা যায় না। জড়তার মস্তকে পদাঘাত করিয়া অন্ততঃ সামান্য স্ফূর্ত্তির আশ্রয় লইতে হয়। তাই আমরাও বলিতেছি সত্বর হও, আপন পিপাসা অনুভব কর। আর হে পিপাসু। একবার চাতকধর্ম্ম অবলম্বন করিও। চাতক যেমন আকাশের জল ব্যতীত অন্য জলে পিপাসা নিবারণ করিতে চায় না, পিপাসায় বুক ফাটিয়া যাক, তাও ভাল, কিন্তু সে যেমন ডোবা, নদী বা সমুদ্রের অপরিষ্কার জলে পিপাসা নিবারণাকাঙ্ক্ষী নহে, তুমিও তদ্রূপ সেই দিব্য-পদার্থের বিনিময়ে অসার সংসার-প্রসূত দ্রব্যে তোমার পিপাসা মিটাইবার প্রয়াস পাইও না। সেই দিব্য-পদার্থের অন্বেষণে কিয়ৎকাল অতিপাত কর, পাইবেই পাইবে। ধ্রুব তাঁহাকে লাভ করিল, প্রহ্লাদকে তিনি কোল দিলেন, বিল্বমঙ্গল-প্রমুখ ব্যাকুল প্রাণের তিনিই সান্ত্বনা বিধান করিলেন; আর তুমি কি তাঁর চক্ষে এতই হেয় বা অপদার্থ যে তিনি তোমায় কোলে লইবেন না? ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেই শিশুমুখ হইতে "আমি একশত বৎসর পা দিয়া থাকিলাম ইত্যাদি" কথাটী শুনিতে পাইয়া মনে হয়, যেন মা শিশুসন্তানদিগকে স্নেহ ও ধমক মিশাইয়া দুধ খাইবার সময় ডাকিয়া বলিতেছেন "তোরা এসে খাবি তো খা, না হয় আমি চলে যাবো।" আবার মনে হয় যেন রামকৃষ্ণ-মেল-ট্রেন, যাত্রীদিগকে ভবের পারে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত। বিলম্ব করিলে কেহ গাড়ী পাইতে পারিবে না। তখন পুনর্ব্বার যাত্রী-গাড়ীর (Passenger train) অপেক্ষা করিতে হইবে। যুগযুগান্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। ঘরের বাহির হইয়া, অপথে পড়িয়া অনন্ত ক্লেশের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে হইবে। অনন্ত পরিতাপ— তারপর শান্তি। বাস্তবিক ঠাকুর রামকৃষ্ণের এক একটী কথা শুনিয়া প্রাণে এতই আশার সঞ্চার হয় যে, ভগবানকে যারপরনাই নিকটবর্ত্তী মনে হয়। তিনি যখন সেই কথাটী বলিতেছেন—"মাগ ছেলের জন্য লোকে ঘটী ঘটী কাঁদে, টাকা হলোনা বলে লোকে ঘটী ঘটী কাঁদে, কিন্তু ভগবানকে পেলাম না বলে কাঁদে কে, যে ভগবানকে পায়না? যে চায়—সেই পায়," তখন কি সংসারের গুরুভারে প্রপীড়িত ভক্তমাত্রেরই মনে হয় না—হে দীনদয়াল,

আমরা কাঁদিতে জানিনা, তুমি যেমন অশ্রুসিক্তলোচনে বালকের মত 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিতে সেইরূপ একবার এ অধমদের কাঁদাইয়া তোমার কোলে টানিয়া লও? বাস্তবিক ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথার ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাই যে, তিনি জগৎবাসীকে এক দিব্যরাজ্যে যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছেন। বলিতেছেন 'হরি সে লাগি রহরে ভাই, তেরা বনত বনত বনি যাই'; 'বনত বনত' অর্থাৎ হ'তে হ'তে হ'য়ে যাওয়া; ওই কথাটা আমার ভাল লাগে না। ভগবানের দয়া হ'লে একেবারেই সব হয়ে যায়। আবার হ'তে হ'তে হয়ে যাওয়া—ওটা আমার ভাল লাগে না। হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে একবার আলো জেলে দিলে পর অন্ধকার কি একটু একটু করে যায়? না তৎক্ষণাৎ চলে যায়? সেইরূপ ভগবৎ আলোকচ্ছটা একবার হৃদয়রাজ্যে ঢুকলে পরে অজ্ঞানান্ধকার কি একটু করে চলে যায়? একবারেই সব চলে যায়! ওঃ কি কথা! কি জোর! পাঠকপাঠিকা! একবার বিমলপ্রাণে বিধাতার এ বিচিত্র বিধানের বিচারে ব্যাপৃত হইতে পারিবে কি? তিনি বলিলেন "যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই এই (আপনাকে দেখাইয়া) রামকৃষ্ণ!" এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে ভাবুক ভক্তের বেশীক্ষণ লাগিবে না। পাঠকপাঠিকা! তোমাদের বিশ্বাস ঘনীভূত করিবার জন্য এ ব্যবস্থা। যাহাতে কেবল বিশ্বাসটা আঁকড়াইয়া ধরিতে ধরিতে জীবন কাটিয়া না যায়। ঠাকুর বলিয়াছেন 'বিশ্বাসই ভগবান লাভের থেই।' এইবার থেই ধরিয়া উঠিয়া পড়। বিলম্ব করিও না। তুমি তো জান 'শুভস্য শীঘ্রং' এইবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ শিষ্যপ্রবর বিবেকানন্দের সেই তেজোময়ী বাণী ভুলিও না। তিনি আপন প্রভুর বার্ত্তা লইয়া সংসারের সমক্ষে বজ্রগম্ভীরনাদে সুপ্ত নরনারীকে বলিতেছেন—Arise, Awake and Stop not till the goal is reached. ("উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত") আমরাও কবির ভাষায় একবার বলি—"Arise, Awake or be for ever fallen."—Milton.

রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের কর্ম্মচারী।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া।"

"The harvest truely is plentious, but the labourers are few."
Matt. IX 37.

এইবার সময়ের অল্পতার কথা শুনিয়া পাঠকের মনে সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কিছু গবেষণাকাঙ্ক্ষা বলবতী হইবে। গবেষণায় নিযুক্ত হওয়া শুভ চিহ্ন

আমরা সুধু যাঁহাদিগের নিকট হইতে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে, তাঁহাদের সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া নীরব থাকিব।

যেরূপ কোন সাম্রাজ্য শাসন করিতে হইলে সম্রাট আপনার অধীনে মহারাজ রাজা হইতে চৌকিদার পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীগণ নিযুক্ত করেন, রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যেও সে সকলের অভাব নাই। এই নিত্যবসন্ত-লীলাময় রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যে নবভাব-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত রামকৃষ্ণ-গ্রন্থনিচয় ও শিষ্যবৃন্দরূপ বসন্তবল্লরী নানা দিকে বিচরণ করিয়া যেখানে সুন্দর প্রাণ-পুষ্প পাইয়াছিল, তাহাতেই উপবেশন করিয়া তাহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। আজ তাহারাই সাম্রাজ্যের তেজীয়ান কর্ম্মচারীবৃন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি ত্যাগীরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া আমার মত চৌকিদার পর্য্যন্ত সকলেই অল্পবিস্তর কার্য্যের জন্য প্রস্তত। বর্ত্তমান সাম্রাজ্য-গঠনের সময়। সুতরাং সকলেই কার্য্যে ব্যস্ত। একটু বলিয়া রাখি—এ সাম্রাজ্যের নূতনত্ব এই যে, রাজা, মহারাজাদি কর্ম্মচারীবৃন্দ লোক চক্ষুর অগোচর হইলেও তাঁহাদিগের দ্বারা আরব্ধ ও অনুষ্ঠিত কার্য্য কখনও লোপ পায় না। তোমরাও দেখিতেছ, স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর হইতে তাঁহার কার্য্যের উন্নতি ছাড়া অবনতি নাই। সকলই অবাধে চলিতেছে ও চলিবে। সেবক রামচন্দ্র দেহ রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই মানসিক বল, তাঁহার শিষ্যদিগকে আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে ও রহিবে।

এ সাম্রাজ্যে সমদর্শন ও নিঃস্বার্থপরতাই শাসনকর্ত্তাদিগের বহুমূল্য অলঙ্কার স্বরূপ। ধনী, নির্ধন, উচ্চ, নীচ; ছোট বড়, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই তাঁহাদের পানে আশাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। আমরাও সেইজন্য ভগবান রামকৃষ্ণের নিকট সরল প্রাণে তাঁহাদের সমদর্শন যাচ্ঞা করিতেছি। তাঁহারা প্লেগে, কলেরায়, দুর্ভিক্ষে যে স্বার্থত্যাগ দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন, জনসাধারণ তাঁহাদিগকে হৃদয়ের উচ্চাসন দিয়া বলিতেছেন "হে রামকৃষ্ণ, এই পর্য্যন্ত নহে। তোমার আশ্রিত প্রত্যেক নরনারীকে স্বার্থত্যাগের এক একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্তরূপে পৃথিবীর বক্ষে দণ্ডায়মান করাইও। ইহাদিগকে দেখিয়া আমরা প্রাণ মন সার্থক করিয়া লই।"

ভৌতিক জগতে আমরা সম্রাটকে সুশাসনের বিনিময়ে কর দিয়া থাকি। আধ্যাত্মিক রামকৃষ্ণসাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তাগণ জনসাধারণ হইতে কি কর প্রত্যাশা করেন? ধন মান—যশঃ? কিছুই না। তাঁহারা কিছুই চাহেন

না। তবে যদি তোমার নেহাৎ কিছু দেবার সাধ হইয়া থাকে, অন্তরের অতি গুহ্যস্থান হইতে ভক্তি-পুষ্প লইয়া সেই পুষ্পের হার উপহার দিলেই যথেষ্ট হইবে। সেখানে টাকা কড়ির খেলা নাই। তুমি যদি সেখানেও টাকা কড়ি খেলার মানস করিলে, তবে আর প্রাণ জুড়াইবার ঠাঁই থাকিল কোথায়? তাই তাঁহাদের বার বার নিষেধ, ঠাকুর রামকৃষ্ণের নিকট কাহারও প্রণামী গ্রহণ করা হইবে না। তিনি চাহেন অন্তরের অহৈতুকী ভক্তি। টাকা কড়ি তোমার বড় বোধ হইতে পারে কিন্তু তাঁর নিকট নগণ্য। তবে তাঁহাদের ভিক্ষাঝুলিতে কিছু দিতে হইবে। কেননা কলিতে অন্নগত প্রাণ। তাঁহাদিগকে যাহাতে শরীর লইয়া বেশী ভাবিতে না হয়, সে ভার গৃহস্থ সাধারণের হস্তে ভগবানের দ্বারা ন্যস্ত।

ত্যাগীগণই এ সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তা, এই শাসনকর্ত্তাগণ বিশেষতঃ ভারতে ও মার্কিন রাজ্যে (America) অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্ত্তিত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ভাব ও কার্য্য পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। পাঠকপাঠিকাগণ! সরলান্তঃকরণে এ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি কামনা করিতে থাক। অস্তমিত অদৃষ্টরবি অবিলম্বে ভারতাকাশে সর্ব্বাগ্রে উদিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে শুভ জাগরণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ফেলিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত।

দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ।

১২৫৯ সালের স্নানযাত্রার দিবস দক্ষিণেশ্বরে ৺রাণী রাসমণির দেবালয় প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের তখন কলিকাতায় ঝামাপুকুরে একটী চতুষ্পাঠী ছিল। কামারপুকুরের দেড়ক্রোশ দূরবর্ত্তী দেশড়া-গ্রাম নিবাসী রাসমণির দেওয়ান রামধন ঘোষ রামকুমারের স্বদেশবাসী ছিলেন এবং তিনি রামকুমারকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। যখন দেবালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সকল ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হইল, সেই সঙ্গে রামধনের ইচ্ছানুসারে রামকুমারের নিকটও একখানি নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হয়। রামকুমারের পিতা ক্ষুদিরাম অশূদ্রগ্রাহী ছিলেন এবং তাঁহারও অন্তরে পিতার প্রভাব বিশেষরূপে বর্ত্তমান ছিল। রামকুমার উক্ত নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াই

রামধনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কেন তাঁহাকে এরূপ পত্র পাঠান হইয়াছে, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রামধন অনেক অনুনয় বিনয় সহকারে নিবেদন করিলেন যে, "আপনাদিগের আচার নিষ্ঠা ও ব্যবহারে বিশেষরূপে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াই আমি আপনার নিকটে উক্ত পত্র পাঠাইয়াছি, এজন্য আমার যে অপরাধ হইয়াছে তাহা মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু অন্নদাতার শুভকমিনার উদ্দেশ্যে জানাইতেছি যে, আপনি উক্ত দিবসে তথায় উপস্থিত থাকিয়া দেবাদি দর্শন করতঃ আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন। বিশেষ, অপরাপর রাঢ়ীশ্রেণাস্থ বহু অধ্যাপক পণ্ডিতগণকেও নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন।"

রামধনের এই প্রকার আগ্রহাতিশয্যে রামকুমার স্নানযাত্রার পূর্ব্ব দিবস অপরাহ্নে দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিতে উদ্যোগী হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন রামকুমারের নিকট থাকিতেন, বয়স ১৯।২০ বৎসর। তিনিও যাইবার বাসনা প্রকাশ করিয়া রামকুমারের সঙ্গ লইলেন। তাঁহারা যখন দক্ষিণেশ্বরের দেবোদ্যানে পৌঁছিলেন, তখন অপরাহ্ণ ৫টা হইবে। দেবমন্দির ও অট্টালিকাদি সমস্তই নবনির্ম্মিত হইয়া যেন হাসিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির-প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়াই কহিলেন "আহা, যেন সাক্ষাৎ কৈলাস, যেন কেহ রজতগিরি উঠাইয়া আনিয়া এখানে স্থাপন করিয়াছে।" মন্দির প্রাঙ্গণ ও উদ্যান আনন্দ পরিপূর্ণ। বৃহৎ প্রাঙ্গণের চতুষ্কোণে যাত্রা, পাঁচালা, চণ্ডী ও কবি গীত হইতেছে। লোকে লোকারণ্য; আহুত অনাহুত, কত জনমানব একত্রিত হইয়া উৎসব দেখিতেছে। শত শত ব্রাহ্মণ আমন্ত্রিত হইয়া সভাধিরোহণ করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন। এই সমস্ত দর্শন করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠভ্রাতাসহ শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীভবতারিণী দর্শনে গমন করিলেন। ভবতারিণীর তখন বেশভূষা হইতেছে, বেশকারী মাতৃ অঙ্গে অলঙ্কারাদি সজ্জিত করিতেছেন, এই অপরূপ শ্যামামূর্ত্তি দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণের দেবীকে জীবন্ত বলিয়া মনে হইল, মাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইল, তিনি কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাকে দেখিতে লাগিলেন। পরে রাধাকান্ত ও দ্বাদশ শিবমন্দিরাদিও দর্শন করিলেন। মন্দিরবাটী শত শত ঝাড় ও দেওয়ালগিরিতে শোভিত হইয়াছিল, সায়াহ্নে সকলগুলি জ্বালিয়া দেওয়া হইল। ঠাকুরবাটীর দুইপার্শ্বস্থিত দুইটী নহবত বাজিতে লাগিল। গঙ্গার বক্ষে শত শত নৌকাপূর্ণ আরোহী বিরাজমান, তাহারাও এই অপরূপ অমানুষী উৎসব ব্যাপার দর্শন করিতে আসিয়াছে।

চতুর্দ্দিকে আনন্দ কোলাহল পূর্ণ। রাত্রে উপস্থিত সকলকেই পরিতোষরূপে ভোজন করান হইয়াছিল কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ দিবস তথায় কিছুই ভোজন করেন নাই। তিনি সন্ধ্যারপর মন্দিরের বাহিরের কোনও এক দোকান হইতে মুড়কী ক্রয় করিয়া আনিয়া গঙ্গার গর্ভে দাঁড়াইয়া তাহা ভোজন করিয়াছিলেন। ভোজনকালে তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, মায়ের কোলে দাঁড়াইয়া আহার করিতে কোনও দোষ নাই, কারণ এখানে রাসমণির কোনও সম্পর্ক নাই। আহারান্তে অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া ব্রহ্মবারি পান করিলেন। ঐ রাত্রে তিনি দক্ষিণেশ্বরেই অতিবাহিত করেন।

পরদিন প্রত্যুষ হইতেই উদ্যান আনন্দময়। দেবামন্দিরের সম্মুখ বিরাজিত নাট্য মন্দিরে একশত অতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন। সে অপরূপ মনোরম দৃশ্য স্মরণ করিলে এখনও শরীর রোমাঞ্চ হয়। পুণ্যবতী রাসমণি, রাঢ়ীশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ, গোস্বামীবংশসম্ভূত তাঁহার কুলগুরু দ্বারা শ্রীশ্রীভবতারিণীর এবং শ্রীশ্রীরাধাকান্তের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তাহা হইলে রাঢ়ীশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণের এবং অপরাপর সর্ব্বসাধারণের এই দেবদেবীর পূজা করিতে, ভোগ রন্ধন করিতে, বা প্রসাদ পাইতে কোনও আপত্তি থাকিবে না। দ্বাদশটী শিব তিনি নিজে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যেক শিবের এক একটী নাম আছে। প্রধান শিবের নাম যোগেশ্বর। দ্বাদশ শিবের সেবা ভার রাসমণির কুলপুরোহিত বরাহনগর নিবাসী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির প্রতি অর্পিত হয়, অদ্যাপি তৎকালীনের রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জীবিত আছেন এবং পূর্ব্ববৎ সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। এই সমস্ত দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যে শত শত ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছেন। সহস্র সহস্র দর্শক কাতার দিয়া উদ্যান পরিপূর্ণ করিয়াছে। কত কাঙ্গালী, কত ভিক্ষুক যে সমাগত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? সকলেরই অবারিত দ্বার। দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্, উৎসবানন্দের পার নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ অতি আনন্দের সহিত এই সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণকে সিদা দেওয়া হইল, তাঁহারা ভাটার সময়ে গঙ্গার গর্ভে উনান প্রস্তুত করিয়া রন্ধন করিয়া আহারাদি সমাপন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অগ্রজের সমভিব্যাহারে রন্ধনাদি করিয়া আহার করিলেন। সমস্ত দিবস এইরূপে অতিবাহিত হইলে, অপরাহ্নে একে একে সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। রামকুমার এবং রামকৃষ্ণও তাঁহাদের ঝামাপুকুরের বাসস্থানে গমন করিলেন।

যদিও দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা হইল, তথাপি শূদ্রের দেবালয় বলিয়া কোনও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীভবতারিণীর ও রাধাকান্তের সেবার ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। আবার যাঁহারা সেবার ভার লইতে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগকে পছন্দ করিলেন না। সুতরাং যাহাতে ভাল ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিতে পারা যায়, তৎপক্ষে তাঁহারা বিশেষরূপে চেষ্টিত হইলেন। রামধনের উপরেই ইহার ভারার্পণ করা হইল। রামধন রামকুমারকেই এ কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার চতুষ্পাঠীতে যাইয়া তাঁহাকে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে বারম্বার অনুনয় বিনয় ও অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামকুমার সম্মত হইয়া প্রতিষ্ঠার দিবসের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে ৺ভবতারিণীর পূজাকার্য্যে ব্রতী হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহার সহ শ্রীদক্ষিণেশ্বর ধামে গমন করিলেন এবং ভ্রাতার সহ তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

রামকুমার দেবীর সেবায় ব্রতী হইয়া রাধাকান্তের সেবার নিমিত্ত তাঁহার জ্ঞাতি-ভাই রামতারককে আনাইয়া তৎকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। রামতারক এই বংশের সকলের জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে "দাদা হলধারী" বলিয়া ডাকিতেন। হলধারীর একটী শালগ্রাম শিলা ছিল। তিনি পঞ্চবটী তলায় নিত্য তাঁহার পূজা সম্পন্ন করিয়া স্বহস্তে ভোগরন্ধন করিয়া নিবেদনান্তে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইঁহার সহিত প্রায়ই শাস্ত্রপ্রসঙ্গ তুলিয়া ধর্ম্মালাপে এই দক্ষিণেশ্বরে আনন্দ মনে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

দান।

আমাদের ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ, যাগ, যজ্ঞ, প্রভৃতি যতগুলি তরণী বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে দানও একটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, দান অতি মহৎকার্য্য। দানে একসঙ্গে ভগবানের পূজা ও পরোপকার করা হয়। এইজন্যই হিন্দুধর্ম্মের উপদেষ্টাগণ প্রত্যেক কার্য্যের সঙ্গেই দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ইহাই যে, আমাদের দেশের ধনকুবেরগণ, যাহারা দান করিবার যোগ্যব্যক্তি, তাঁহারা দানের মহিমা বিস্মৃত হইয়া বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের

ইহা নিজে নিজেই উপলব্ধি করা উচিত যে, ভগবান এ অর্থ শুধু লৌহ সিন্ধুকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য আমাদের দেন নাই, বা নানাবিধ বিলাস সামগ্রী কিনিয়া গৃহ সাজাইবার জন্যও দেন নাই। এ অর্থ, দারিদ্র্য রোগ প্রশমন করে তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন। আমরা যদি এ অর্থের দ্বারা দারিদ্র্য রোগ দূরীভূত না করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকটে মহাপাপী বলিয়া পরিগণিত হইব।

একজন দরিদ্র লোক রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। আর চিকিৎসক সে সংবাদ অবগত হইয়াও আলমারিপূর্ণ ঔষধ লইয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি যদি সংবাদ শ্রবণেও বুঝিতে না পারিলেন যে, এই ঔষধ কেবল রোগ অপনোদনের জন্যই হইয়াছে, আমি যদি এ রোগের উপযুক্ত ঔষধ প্রদান না করি তাহা হইলে এ লোক, পরমায়ু থাকিতে ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, তবে তিনি কিসের চিকিৎসক? এরূপ প্রকৃতির লোক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা না করিয়া যদি মূর্খ হইয়া ঘরে বসিয়া থাকে, তাহা হইলে কোনই আক্ষেপের কারণ থাকে না। সেইরূপ যে ধনী দরিদ্র প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ, সেই বা কেমন ধনী? তাহাকে ধনী বলে কে? তাহার যে ধন আছে, তাহার পরিচয় কিসে? তৈলাক্ত মস্তকে তৈলমর্দ্দন ততদূর কঠিন কার্য্য নহে, রুক্ষ মস্তকে তৈলমর্দ্দন করাই দুরূহ ব্যাপার। যে রোগী, তাহারই ঔষধের দরকার, আর যে নির্ধন তাহারই ধনের দরকার।

ভগবান যাহাকে যে জিনিস দিয়াছেন, বুঝিতে হইবে, সে জিনিস যাহার নাই, তাহারই উপকারের জন্য। যেমন মেঘেতে জল দিয়াছেন, বৃক্ষেতে ফল দিয়াছেন, গাভীতে দুগ্ধ দিয়াছেন, লোকের উপকারের জন্য, তেমনই ধনীরও ধন দিয়াছেন, দরিদ্রের উপকারের জন্য। ধনি! তুমি লোহার সিন্ধুকে ধন আবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছ, আর দরিদ্র লোকসকল অন্নাভাবে হাহাকার করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। তুমি ত তাহাদের সে অভাব অনায়াসে অপনোদন করিতে পার, কৈ তাহা ত তুমি করিতেছ না? তাহাদের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কি তোমার পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইতেছে না? তাহাদের অভাব দূর করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা ত ভগবান তোমাকে দিয়াছেন, তবে তুমি কেন সে শক্তির অপব্যয় করিতেছ? একবার প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া দেখ, আবশ্যক মত মেঘ জল বরিষণ করিতেছে, বৃক্ষ ফলোৎপাদন করিতেছে, গাভী দুগ্ধ প্রদান করিতেছে, এইরূপ প্রয়োজন মত তোমারও

ধন বিতরণ করা আবশ্যক, নতুবা ঈশ্বরের রাজ্য রক্ষা হওয়া অসম্ভব। যেমন, মেঘ জল বরিষণ না করিলে, বৃক্ষ ফলোৎপাদন না করিলে, গাভী দুগ্ধ দান না করিলে, লোকজগতে বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়, সেইরূপ, তোমার ধনও বিতরিত না হইয়া, যদি সিন্ধুকে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে দরিদ্র সমাজেও হাহাকার উপস্থিত হয়। তবে তুমি হয়ত মনে করিতে পার যে, আমি যদি দান করি, তাহা হইলে আমার সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যাইবে এ ধারণা তোমার ভুল, এ বুদ্ধি অবিদ্যাসম্ভূত। দেখ, মেঘ চিরকালই জল বরিষণ করিতেছে, বায়ু আবহমানকালই প্রবাহিত হইতেছে, চন্দ্র, সূর্য্য চিরদিনই আলোক দান করিতেছে; তাই বলিয়া কি তাহাদের শক্তির কোনরূপ ব্যত্যয় হইয়াছে? না সমান ভাবেই আছে? ভগবান যাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন, সে শক্তি যদি তাঁহার রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত ব্যয়িত হয় তাহা হইলে কথনই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। ত্যাগই একমাত্র অর্থ রক্ষার উপায়—

"উপার্জ্জিতানাং বিত্তানাং ত্যাগ এবহি রক্ষণম্।"

সাধুগণের উপদেশে দেখিতে পাই যে, পুরুষের যখন সুসময় উপস্থিত হয়, তখন জগন্মাতা তাহাকে দশ হস্তে অর্থ প্রদান করিতে থাকেন, তখন যদি সেই ব্যক্তি সদুদ্দেশ্যে দুই হস্তে লক্ষ লক্ষ মুদ্রাও ব্যয় করে, তথাপি তাহার অর্থ ফুরায় না; আবার যখন যাবার সময় হয়, তখন মানুষ কিছুতেই অর্থকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, কারণ জগদম্বা দশহস্তে আকর্ষণ করিতে থাকেন। যেমন বর্ষাকালে সরোবর হইতে লক্ষ লক্ষ কলসী জল উত্তোলন করিলে নিঃশেষ হয় না, আবার বসন্তকালে স্বতঃই শুকাইয়া যায়। অর্থ চিরদিন থাকিবার নহে "স্থিরতাং নাস্তি সম্পদাং" অতএব অর্থের সদ্ব্যয় করাই উচিত। আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মোপদেষ্টারা বলিয়া গিয়াছেন যে, বহু কষ্টোপার্জ্জিত, জীবনের অধিক যে অর্থ, তাহার দানই একমাত্র গতি, অন্যথা বিপত্তি—

"আযাস শত লব্ধস্য প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সঃ।
একৈব গতিরর্থস্য দানমন্যা বিপত্তয়ঃ॥"

আজ আমরা এ উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছি, তাই দেশের এত অভাব, এত অভিযোগ দেখিয়া শুনিয়াও আমরা টাকার তোড়া বক্ষে ধারণ করিয়া ঘুমাইতেছি, তাই চারিদিকে এত হাহাকার, এত আর্ত্তনাদ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে না। আমাদের দেশ এখনও ধনীশূন্য হয় নাই।

এখনও প্রত্যেক গ্রাম, নগর, পল্লীতে ধনী বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা যদি মনে করেন, তাহা হইলে অনায়াসে তাঁহারা নিজ নিজ গ্রামের অন্নাভাব, জলাভাব প্রভৃতি যত রকম অভাব আছে সমস্ত রকম অভাবই নিবারণ করিতে পারেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তাঁহারা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই যে দেশে দারুণ অন্নকষ্টে, ভীষণ জলকষ্টে লোকসমূহ নিত্য নিত্য কালের করাল বদন আশ্রয় করিতেছে, ইহা দেখিয়া আজিও যাঁহারা তৎপ্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিতেছেন না, তাঁহাদিগকে আর আমরা কি বলিব! তবে জগতের লোক বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে তাঁহাদের এইরূপ নৃশংস কার্য্য দর্শন করিতেছে, আর ভাবিতেছে—"কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।"

ধনি! তুমি মনে করিতেছ, বুঝি এই ভাবেই অর্থ বুকে করিয়া চিরকাল কাটাইবে? তাহা হইবে না, ঐ দেখ তোমার শিয়রে কাল বদন-বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সময় হইলেই তোমাকে গ্রাস করিবে, তখন তোমার সঙ্গে কেহই যাইবে না। এখানকার অর্থ এখানেই পড়িয়া থাকিবে। কেবল একমাত্র ধর্ম্মই তোমার অনুগমন করিবে—

"নামুত্রহি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ গচ্ছতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥"

তাই বলি—পরলোকে সাক্ষী দিবার জন্য যদি ধর্ম্মকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে দানরূপ মহাকার্য্য আচরণ করিয়া ধর্ম্মকে সহায় কর—

"তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ।"

এ সংসার-রাজ্য ভগবানের, ভগবানই এ রাজ্যের একমাত্র রাজা, তিনি যেমন লোকের হিতের জন্য চন্দ্র, সূর্য্য, মেঘ, নদ, নদী, বৃক্ষ, গাভী প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ দরিদ্র প্রতিপালনের জন্য ধনীর সৃষ্টি করিয়াছেন। হে ধনি! কেবল স্ত্রী-পূজা করিবার জন্য তিনি তোমাকে অর্থ প্রদান করেন নাই, বা এখানে প্রেরণ করেন নাই।

মানুষ ভগবানের স্বরূপ, মানুষকে পূজা করিলেই ভগবৎ-পূজা সম্পাদন হয়। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি উত্তম ভক্তিসহকারে আমার পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সে যেন মনুষ্যের সেবা করে, তাহা হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব—

"যশ্চমাং পরয়া ভক্ত্যা আরাধয়িতুমিচ্ছতি।
স জনোমানবাঃ পূজা এবং তুষ্টো ভবাম্যহং॥"

আমাদের প্রাচীন ব্যক্তিগণ এই সমস্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, ধন ও জীবন চিরকাল থাকিবার নহে। ইহার মমতা ত্যাগ করিয়া অবশ্যই চলিয়া যাইতে হইবে, অতএব এমন জিনিস সৎকার্য্যে ব্যয় করাই জ্ঞানী-জনোচিত কার্য্য—

"ধনানি জীবিতাঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞমুৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥"

তাঁহারা সাহিত্য-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া যতটা শিক্ষা করিয়াছিলেন, প্রকৃতি-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাহা অপেক্ষা আরও অধিকতর শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিতেন যে, পরের উপকারের জন্য যখন, গাভী দুগ্ধ দান করে, বৃক্ষ ফল প্রসব করে, নদীও অবিরাম প্রবাহিত হয়, তখন আমাদের এ শরীর এবং ধনও পরের উপকারের জন্য ব্যয়িত হওয়াই কর্ত্তব্য—

"পরোপকারায় দুহন্তি গাবঃ পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষাঃ।
পরোপকারায় বহন্তি নদ্যঃ পরোপকারায় শরীরমেতৎ॥"

আজকাল আমাদের দেশে এই সমস্ত উপদেশ দান করিলে, এ দেশবাসী ভ্রাতাগণ উপদেষ্টাকে স্বার্থপর বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি, কারণ সমস্তই শিক্ষার অভাবে হয়, আজ শিক্ষার অভাবেই দেশ অধঃপথে পতিত হইতে চলিয়াছে।

উপসংহারে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে, দান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে কাহারই বিত্তশাঠ্য করা উচিত নহে। আত্মরক্ষার উপযুক্ত অর্থ রাখিয়া উদ্বৃত্ত সমস্ত অর্থ-ই দান করা সাধুজনের অনুমোদিত। যে মহাত্মা অকপটচিত্তে নিঃস্বার্থ অবস্থায় দান করিবেন, তিনিই মোক্ষলাভে সমর্থ হইবেন। "দানাৎ মোক্ষ ভবিষ্যতি" নতুবা নরক সন্দর্শন করিয়া ভীতিবিহ্বলচিত্তে রোদন করিতে হইবে, আর বলিতে হইবে—

"আমি না করিয়া দান, করেছিনু পাপ।
তাইতে আজি এত পাই মনস্তাপ॥"

শ্রীকান্তিবর ভট্টাচার্য্য।

শ্রীধাম কামারপুকুর ও জয়রামবাটী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১ পৃষ্ঠার পর)

[কামারপুকুর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-তথ্য]

কামারপুকুর গ্রামটী বর্দ্ধমানের রাজাদিগের ছিল, তাঁহারা ইহা গুরু-বংশীয়দিগকে দান করেন। উক্ত গুরুকুলের শ্রীগোলোকচন্দ্র গোস্বামী শ্রীখুদিরামের বাটীর ঠিক দক্ষিণপার্শ্বে বসবাস করিতেন। তিনি একক ছিলেন, সংসার ছিল না। তাই কামারপুকুর সম্পত্তি উক্ত গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তি লাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া ফেলেন।

খুদিরাম ইতিপূর্ব্বে দেরেপুর গ্রামে বাস করিতেন। উহা এখান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ ব্যবধানে হইবে। তথাকার জমিদার খুদিরামকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু খুদিরাম আজীবন সত্যনিষ্ঠ ছিলেন—তিনি ইহাতে সম্পূর্ণভাবে অসম্মতি প্রকাশ করায় জমিদার তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন, তাই পূর্ব্ব বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া খুদিরাম কামারপুকুর গ্রামে উঠিয়া আসিলেন। খুদিরামের বাটী কামারপুকুরের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে, তৎপরে আর বাড়ী নাই। পশ্চিমগাত্রে একটী রাস্তা এবং তৎপরে সাদা জমি, লাহাবাবুদের পুষ্করণী ও মাঠ। বাটীর উত্তরে সদর রাস্তা, এবং ৺শান্তিনাথ নামক শিবের মন্দির। বাটীর পূর্ব্বে খাঁপুকুর এবং লাহাবাবুদিগের বাটী। খুদিরামের বাটীর জায়গা অনুমান তিনকাঠা হইবে। খুদিরামের দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহে দুইটী কন্যা সন্তান জন্মে। সেই স্ত্রীবিয়োগের পরে তিনি চন্দ্রমণি দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার, মধ্যম পুত্র রামেশ্বর দেরেগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। খুদিরাম কিছুকাল কামারপুকুরে বসবাসের পর শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন।

পৈত্রিক বসবাস ত্যাগ করায় কামারপুকুরে আসিয়া খুদিরামের অবস্থা অতি হীন হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ কিছুতেই বিচলিত হইত না। দুঃখ কষ্ট স্বীকার করিয়াও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া তিনি মনসুখে দিনযাপন করিতেন। একবার কোনও কার্য্যোপলক্ষে তিনি তাঁহার ভাগিনেয়র নিকট মেদিনীপুরে যাইতে ছিলেন। চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া তিনি পথিমধ্যে এক বৃক্ষমূলে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন একটী পঞ্চমবর্ষীয় তীর ধনু হস্তে বালক তাঁহাকে বলিতেছে, "আমি এই

মাঠে ধানবন মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছি, জনৈক সাধু আমাকে এখানে ফেলিয়া গিয়াছে, তুমি আমাকে লইয়া চল, আমি তোমার গৃহে থাকিব।” নিদ্রা-ভঙ্গের পর বিশেষ অনুসন্ধানে খুদিরাম ধান্যবৃক্ষতলে একটী শালগ্রাম শিলা দেখিতে পাইলেন, এবং আরও দেখিলেন, একটী সর্প ফণা ধরিয়া সেই শালগ্রাম রক্ষা করিতেছে। তিনি দৈবস্বপ্নবলে সাহসভরে সেই শিলা উত্তোলন করিয়া লইলেন, সর্প কোথায় অদৃশ্য হইয়া চলিয়া গেল। তিনি সেই শিলা* লইয়া পরমানন্দে বাটী ফিরিয়া আসিয়া তাহা গৃহে স্থাপনা করিলেন, আর মেদিনীপুরে গমন করিলেন না।

খুদিরাম একবার হাঁটিয়া ৺রামেশ্বর সেতুবন্ধ গমন করিয়াছিলেন, তথা হইতে একটী মাটির রামেশ্বর শিবমূর্ত্তি আনিয়া রঘুবীরের ঘরে স্থাপনা করেন। কালপ্রভাবে সেই মাটির রামেশ্বর ভাঙ্গিয়া যায়। পিতার স্থাপিত রামেশ্বর ভগ্ন হওয়ায়, ঠাকুর রামকৃষ্ণ অত্যন্ত বিষাদিত হইয়াছিলেন এবং মাতা-ঠাকুরাণীকে একটী শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নাম 'রামেশ্বর' রাখিতে বলেন। মা একটি শ্বেত-প্রস্তরের শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নাম 'রামেশ্বর' রাখিয়াছেন।

উক্ত গৃহে এক শীতলাদেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। তাঁহার সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব ঘটনা শুনিয়াছি। পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহাও লিপিবদ্ধ করিলাম। কামারপুকুর হইতে ২।৩ ক্রোশ ব্যবধানে সাতবেড়ে নামক একটী গ্রাম আছে। তথায় এক কুম্ভকার ঘট গাড়িতে ছিল। একটী ঘট প্রস্তুত হইলে, তন্মধ্য হইতে একটী ভীষণ শব্দ উত্থিত হয়। কুম্ভকার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়। এমন সময়ে সে একটী দৈববাণী শ্রবণ করিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—“আমি দেবী শীতলা, তোমার এই নির্ম্মিত ঘটে অধিষ্ঠান করিলাম। তুমি নিত্য আমার সেবা ও পূজা করিবে।” কুম্ভকার কৃতকৃতার্থ হইয়া তাহাই করিতে থাকে। কালে খুদিরামের মধ্যমপুত্র রামেশ্বরকে দেবী স্বপ্না-দেশে বলিলেন যে, “আমি অমুক কুম্ভকার গৃহে অবস্থিতি করিতেছি, তুমি তথা হইতে আমাকে আনিয়া গৃহে স্থাপনা কর” এবং দেবীর সেবক কুম্ভ-কারকেও স্বপ্ন হইল যে, “অমুক ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে লইতে চাহিবে, তুমি আমায় তাহাকে দিও।” যথাসময়ে রামেশ্বর কুম্ভকারের আলয়ে গেলে, কুম্ভকার দেবীর সেই ঘট রামেশ্বরকে অর্পণ করিলেন। রামেশ্বর সানন্দচিত্তে

* এই শিলার নাম 'রঘুবীর'। অনেকে অনুমান করেন, নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে যে 'রঘুবীর' গৃহদেবতা ছিলেন, এ সেই 'রঘুবীর'।

তাহা মস্তকে বহন করিয়া আনিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য ঘটনা! রামেশ্বর 'আমোদর' হাটিয়া পার হইতেছেন, আর রামেশ্বর নাই! এক হাত দেড় হাত জল, ডুবিবার সম্ভাবনা নাই, অথচ রামেশ্বর কোথায় গেলেন? তাইত রামেশ্বর কোথায় গেলেন! আর ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিন দিবস পরে রামেশ্বরকে সেই দেবীঘট মস্তকে লইয়া বাটীতে উপস্থিত হইতে দেখা গেল। সকলেই অবাক, রামেশ্বর কোথায় ছিলেন! তখন রামেশ্বর কহিলেন যে, তিনি যে কোথায় ছিলেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তবে আমোদরে নামিয়া তিনি কেবল দেবীর পূজা, আরোতি, নৃত্য-গীতাদি উৎসব সন্দর্শন করিয়াছেন। কত দেব, কত ঋষি, দেবীর স্তবস্তোত করিয়াছেন! ইহাই তাঁহার স্মৃতিপথে বেশ জাগিতেছে, তদ্ভিন্ন আর কিছুই তিনি জানেন না।

এই শীতলাদেবীর সেই ঘট এখনও সেই ভাবে বিরাজমান। এই দেবীর কৃপায় অনেকে অনেক প্রকার উৎকট ব্যাধি হইতে নিরাময় হইয়াছে। বসন্তরোগে কামারপুকুরে কাহারও মৃত্যু ঘটনা হয় নাই। এই দেবীকে কোনও কোনও সময়ে কেহ কেহ প্রত্যক্ষ দর্শন পর্য্যন্তও করিয়াছেন। এরূপ একটী ঘটনার এখানে উল্লেখ করিতেছি। ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে চৈত্র মাসে বারুণীর দিন কামারপুকুর গ্রামে দৈববশে অগ্নিদাহ উপস্থিত হয়। বারুণীর মেলা উপলক্ষে অধিকাংশ নরনারী স্থানান্তরে যাওয়ায়, অগ্নিদাহ হইতে গৃহাদি রক্ষা করে এরূপ লোকজন গ্রামে উপস্থিত ছিল না, সুতরাং অবাধে একের পর এক করিয়া সকল গৃহস্থেরই গৃহ দগ্ধ হইতে থাকে। যখন ঠাকুরের বাটীর সন্নিকটে লাহাবাবুদিগের বাটীতে অগ্নি লাগিল; তখন ঠাকুরের বাটীতে যাহারা বর্ত্তমান ছিলেন, তাহারা অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং জিনিস পত্র যাহা আছে, তাহা সমস্ত কোনও প্রকারে গোছ করিয়া খাঁপুকুরে ডুবাইয়া রাখিয়া পরে গৃহ-দেবদেবীগণকে মস্তকে লইয়া বাটী ছাড়িয়া মাঠে যাইয়া জীবন রক্ষার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তখন মধ্যাহ্নকাল দেবী-গৃহ বন্ধ ছিল। হঠাৎ গৃহদ্বার উন্মোচন করিয়া একটী নয় দশ বৎসরের বালিকা হাসিতে হাসিতে দাওয়ায় উপস্থিত হইলেন। বালিকার পরিধানে রক্তবস্ত্র। দেবীগৃহের দ্বার উন্মোচন শব্দে বাটীর লোক চমকিত হইয়া সেদিকে গেলেন। যাইয়া এই অদ্ভুত বালিকামূর্ত্তি দেখিয়া সকলে অবাক ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তখন সেই সুরূপা বালিকা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া হাসিমুখে বলিতে লাগিলেন—"আমি তোমাদিগের গৃহে থাকিতে, তোমাদের কোন ভয় নাই,

তোমারা নিশ্চিন্ত মনে বাটীতে অবস্থান কর। এ গৃহে অগ্নিস্পর্শ হইবে না।” এই বলিয়া পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। সকলেই অবাক ও স্তম্ভিত; এদিকে অগ্নি দাউ দাউ করিয়া চতুষ্পার্শে জ্বলিতেছে। অগ্নিসখার সহায়তায় জ্বলন্ত খড়, তাল পাকাইয়া উর্দ্ধে উঠিয়া উড়িয়া উড়িয়া ঠাকুরের পুণ্যাশ্রমের দিকে যাইয়া পড়িতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্য—সমস্তই খাঁপুকুরের পাড়ে বিরাজিত তালবৃক্ষের পাতার উপরে পড়িয়া গড়াইয়া জলে পড়িতেছে। তাহার বিপরীতে অগ্নিকণামাত্রও অন্যত্র পতিত হয় নাই। এইরূপে এই দেববাটী এবং ইহার আশপার্শ্বের কয়েকখানি বাটী সেই ভীষণ অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা পাইয়া ছিল। এই শীতলাদেবী সম্বন্ধে আরও অনেক কথা শ্রবণ করা গিয়াছে, তাহা বারান্তরে প্রকাশিত করিবার বাসনা রহিল। প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় এই দেবীর উৎসব হইয়া থাকে।

রঘুবীরের গৃহে একটী পিতলের শ্রীগোপাল-মূর্ত্তি বিরাজিত দেখিলাম। শুনিলাম, এটী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী স্থাপনা করিয়াছেন। এই গৃহমধ্যে পশ্চিমের দেওয়ালে একখানি জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি এবং উত্তরের দেওয়ালে একখানি হরগৌরী মূর্ত্তির বাঁধান পট রহিয়াছে। বাহিরে দক্ষিণপার্শ্বে একখানি দেবীগোষ্ঠ এবং উত্তরপার্শ্বে একখানি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পট বিরাজমান। এই পট কয়খানি পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের গৃহে ছিল, পরে রামলাল দাদা আনিয়া এইরূপে রাখিয়াছেন। খুদিরামের সমকালে এই গৃহ সংলগ্ন হইয়াই বাসগৃহ ছিল? কিন্তু ঠাকুর তাহা বিভিন্ন ভাবে রাখার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই দেবগৃহের উত্তরের গৃহখানি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেশে আসিলে ব্যবহার করিতেন। এই গৃহ মধ্যে ঠাকুরের ও মায়ের ছবি আছে দেখিলাম। খুদিরামের সময়ের কয়েকখানি কাষ্ঠ এখনও এই গৃহে রক্ষিত হইয়াছে। দেবগৃহের দক্ষিণে একটী জবাগাছ, একটী শিউলীগাছ, একটী টগর গাছ, একটী মনসাগাছ; একটী জাম গাছ, একটী অপরাজিতা ফুলের গাছ রহিয়াছে। এই সব ফুলে দেবদেবীগণের পূজা সম্পন্ন হয়। জবাগাছটী বহুদিনের,—এটী রামেশ্বরের স্বহস্তে রোপিত, একবার শুকাইয়া মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় নূতনভাবে গজাইয়া উঠিয়াছে। নিত্য দেবীর পূজার পুষ্প এই বৃক্ষ হইতেই পাওয়া গিয়া থাকে। এই বৃক্ষাদির পূর্ব্বে এইক্ষণ রন্ধনশালা, ঢেঁকিশালা, এবং ধান্যের হামার নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এইখানে খিড়কীর দ্বার ছিল। এই দ্বারের সম্মুখেই গোলোক গোঁসাইয়ের বাটী

ছিল।* দেবগৃহের ঠিক সম্মুখে, বাটীর প্রাঙ্গণের পূর্ব্বধারে খুদিরামের কালে ঢেঁকিশালা ছিল। এই ঢেঁকিশালে ঠাকুরের জন্ম হয়। ঢেঁকিশালা ভগ্ন হইলে, ঠাকুর তথায় ধানের হামার করিতে বলেন। এইক্ষণ তাহা স্থানান্তরিত করিয়া সেই জন্ম-স্থলের চতুর্দ্দিকে কয়েক খানি প্রস্তর বেষ্টন করা হইয়াছে এবং মধ্যস্থলে ৫।৭টী তুলসী-বৃক্ষ রোপিত রহিয়াছে। কোনও কোনও ভক্ত এই স্থলে মন্দির নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিতেছেন, হয়ত কালে তাহা পূর্ণ হইবে। এই স্থলের উত্তরে এবং ঠাকুরের ব্যবহৃত গৃহের পূর্ব্বে আর একখানি দ্বিতলগৃহ নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থলে রামকুমার ও রামেশ্বর একখানি একতালা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের জন্মস্থল এবং এই গৃহখানির মধ্যস্থলে এইক্ষণ খিড়কীর দ্বার বিরাজিত। এই দ্বারের বাহিরে আসিয়া উত্তরে বৈঠকখানা। এই বৈঠকখানা ঠাকুর রামকৃষ্ণের কালে তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের পুত্র অক্ষয়কুমারের তত্ত্বাবধারণে নির্ম্মিত হয়।

এই বৈঠকখানা গৃহের পূর্ব্বে একটী আম্রবৃক্ষ রহিয়াছে। উহা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্বহস্ত-রোপিত। যখন তাঁহার ৬।৭ বৎসর বয়স, তখন ভুরসুবা-বাসী মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে কোনও নিমন্ত্রণে গমন করেন। সেইখান হইতে আম খাইতে খাইতে বাটী আসিয়া সেই আম-আঁটিটি পুঁতিয়া দেন। যখন ইহা হইতে বৃক্ষ নিষ্ক্রান্ত হইল, তখন তিনি এই বৃক্ষটীর রক্ষণাবেক্ষণে বড়ই যত্নশীল ছিলেন। যখন রামকৃষ্ণের ১১।১২ বৎসর বয়স, তখন একদিন রাত্রে প্রবল ঝটিকা উঠে, পাছে চারা আম্রবৃক্ষটী পড়িয়া, বা ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তাই রামকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি সকলের অজ্ঞাতে উঠিয়া গিয়া বৃক্ষটীকে কোল দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বাটীর সকলে তখন আলো জ্বালিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহাকে সেই বৃক্ষের নিকটে যাইয়া পাইয়া ধরিয়া আনিলেন। চন্দ্রমণি তাঁহাকে বলিলেন যে, আমগাছে ত এত দরদ, কিন্তু ঐ আম ত ঠাকুরের ভোগে লাগিবে না, কারণ তোমার উচ্ছিষ্ট ফল হইতে এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বলিলেন যে, "মা! এই ফলের নামই ত এঁটোফল। হনুমান লঙ্কা হইতে ইহা এঁটো করিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু এঁটো সত্ত্বেও এই ফলের নাম অমৃত। এই অমৃতফল দেব-সেবায় খুব

* ঠাকুর শিশুকালে সর্ব্বদাই এই স্থলে থাকিতেন। গত ২৯এ ফাল্গুন ১৩১৫ সালে এইখানে ঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়াছিল। তত্ত্ব-মঞ্জরী ১৩১৫ সালের চৈত্র সংখ্যা দেখ।

চলিবে।" বাস্তবিকই শ্রীরামকৃষ্ণ-রোপিত ও অধরামৃত প্রাপ্ত বীজে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ফল অতীব মধুর।

(ক্রমশঃ)

অনন্ত-শয্যা।

(১)

মধুর মাধুরী ঝলসে মধুর,
বহিছে মলয় নাচিয়া,
উছলি উঠিছে ক্ষীরোদার নীর,
লহরে লহরে ভাঙ্গিয়া।

(২)

সাগর মাঝারে অহি-উপাধানে,
নিখিলকারণ "শ্রীহরি,"
শ্রীচরণ-তল সেবিছে কমলা,
ফুল্ল-কুসুম আমরি!

(৩)

নাভিপদ্মে ফুটি পদ্মযোনি ব্রহ্মা,
মধ্যাহ্ন অরুণ-ভাতি,
অনন্ত মাধুরী লভিয়া সাগর,
হরষে উছলে মাতি।

(৪)

নীলাকাশ ধরি চন্দ্রাতপ মরি,
শোভে তারা ভানু শশী,
সোণার কমল অতুলনা লক্ষ্মী,
পাদপদ্ম সেবে বসি।

(৫)

নীল তনুখানি চতুর্ভূজ বিষ্ণু,
লীলামৃত ঝরে রূপে,
বিভোর হইয়া নেহারে ভূজঙ্গ,
অনিমিষে রহে চুপে।

(৬)

শঙ্খ চক্র গদা কমল করেতে,
কৌস্তভ উরসে শোভে,
রক্ত-কোকনদ দুর্লভ চরণ,
মুনি-মন ধায় লোভে।

(৭)

সুশান্তি মলয় ধীরে নেচে চলে,
চৌদিকে আনন্দ ভরি,
বিমল প্রেমেতে মাখন প্রকৃতি,
স্নিগ্ধ-কম-কোল মরি।

(৮)

প্লাবিত জোছনা চির-মধুময়ী,
পূর্ণমাসী লক্ষ্মীসতী,
অতুলন তাহা অপরূপ রূপ,
মধুর মোহন জ্যোতি।

(৯)

ক্ষীরোদার মাঝে "লক্ষ্মী নারায়ণ,"
ভূলোকে ধূলায় পাপী,
অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ দুনয়ন,
মরম বেদনে যাপি।

(১০)

লীলাময় নাথ! নিখিলকারণ,
লীলাভূমি ধরাখানি,
খেলেন লইয়া মানব পুতুল,
কোথা হোতে সব আনি।

(১১)

খেলিতে খেলিতে বিভোর মানব,
পাতেগো সাধের ঘর,
ফুরাইলে ছুটি, মুদি আঁখি দুটি,
শয়ন চিতার পর।

(১২)

ডাকিলে নাথেরে, লন কোলে তুলে,
পরীক্ষা এ সুখ দুঃখ,
আঁধার পরাণে লুটালে চরণে,
যেন হৃদে জ্যোতিটুক।

(১৩)

অজ্ঞানতা তাপ টুটিয়া ফুটিবে,
মধুর হৃদয় হাসি,
(আমি) তাই ডাকি নাথ, অধমতারণ,
সেই লোভে ছুটে আসি।

(১৪)

কোথা সে হৃদয়রতন মোহন,
সুন্দর ধন শ্যাম!
কোথা সে মধুর উল্লাসপূরিত;
শোকতাপহারী ধাম!

(১৫)

চাহি মুখপানে কাঁদি ডেকে নাথ!
এস হে ফোটাও আঁথি,
ভব-কষ্টি পরে কসিতেছ এত,
এখন কসার বাকি?

(১৬)

তোমা পেলে রব নীরবে মজিয়ে,
তুলিবনা হাহাকার,
(আমি) পেতেছি হৃদয়, এস প্রেমময়,
নাশ এ রোদন ভার।

(১৭)

কথিত পঠিত শুনিতেছি নাথ!
হেরিব না কিগো নয়নে?
নমঃ নমঃ দেব "লক্ষ্মী নারায়ণ"[২]
ক্ষীরোদে অনন্ত-শয়নে।

শ্রীসুশীলমালতী সরকার।

প্রার্থনা।

(১)

সর্ব্বত্র তোমার দয়া আছে সর্ব্বক্ষণ,
দেখেও দেখেনা কিন্তু অবিশ্বাসী মন।
নিজ নিজ কর্ম্মফলে, পোড়ে জীব দুঃখানলে,
তাই ব'লে তোমারে কি হবো বিস্মরণ,
জীবন-ঈশ্বর তুমি হৃদয়রঞ্জন।

(২)

জ্বলিছে জীবন যার জ্বলন্ত জ্বালায়,
দাও তারে স্থান তুমি চরণ ছায়ায়।
কিন্তু সুখী সেইজন, করে সে কি আকিঞ্চন,
পাইতে ও রাঙ্গাপদ মুক্তি কামনায়,
অমরার শ্রেষ্ঠ বস্তু, দুর্ল্লভ ধরায়।

(৩)

অনিত্য সংসার ল'য়ে পুলকে মগন,
ধরামাঝে যত জীব না করে স্মরণ—
একদিন যেতে হবে, ত্যজিয়া সকলি ভবে,
ভেঙ্গে যাবে ঘুমঘোর সুখের স্বপন,
পলকে অদৃশ্য হবে মোহ-আবরণ।

(৪)

সেইদিন মনে হায় হতেছে উদয়,
আতঙ্কে শিহরি সব হেরি শূন্যময়।
তিলার্দ্ধ বাসনা আর, নাহি কিছু করিবার,
যতদিন আছি ভবে তোমারি চিন্তায়,
আত্মহারা হয়ে যেন জীবন জুড়ায়।

(৫)

আর এ জীবন-নদ শুকালে উত্তাপে,
দেখা দিও একবার নরদেবরূপে।
ঊর্দ্ধে গগনমণ্ডল, নীচে পাপ ধরাতল,
তারি মাঝে পুণ্যলোকে প্রিয় নিকেতনে,
স্থান যেন পাই প্রভো! তোমার চরণে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গুরু-গীতি।

দয়া করে মোরে বলে দাও গুরো, মম ও শ্রীপদে মিনতি,
সকল জ্ঞান স্বরূপ তুমি, করুণায় কহ, কা গতি।
জরাজীর্ণ সুখে অজ্ঞান সম্পদে
ঘুরে ঘুরে ডুবি দুঃখেরি হ্রদে,
কভু বুঝি হৃদে, কভু যাই ভুলে, বিষয়েরি মোহে সদাই মাতি।
দিয়েছিলে গুরো আমারে যে ধন
হেলাতে হারানু আমি সে রতন
কখন কখন ক্ষণিক চমকে, দেখি যবে তব দয়ার ভাতি।
কাঁদে প্রাণ মোর, কাঁদে গো হৃদয়
মনে জাগে নিজ কুকর্ম্ম নিচয়
জানি তবু হায়, উপজে সংশয়, আশ্রয় পাবে কি কুমতি।
না মানি আদেশ, গুরু উপদেশ
প্রবল করেছি কাম ক্রোধ দ্বেষ
আছে অবশেষ ভুলিতে তোমায়, তাতেও নাই'ত বিরতি।
যদি না থাকিত বৈষয়িক স্বার্থ
সহজেই প্রভু হ'ত সে অনর্থ
বিষয়েরে বুঝি, তাই তোমা বুঝি, এত তায় গুরো বেড়েছে রতি।
যা করেছি আমি, যা আছে আমার
কিছু নয় গুরো অজানা তোমার
দয়া অবতার, আপন দয়ায় হর এ তিমির দুর্গতি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

সমালোচনা।

প্রতিভাসুন্দরী। বঙ্গসাহিত্যের প্রতিভাবান লেখক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। এই পুস্তকে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের সভার প্রতিভা—রাক্ষসরাজ চন্দ্রচূড়ের আশ্রিতবাৎসল্য—ভারতে জ্যোতিষ বিদ্যার অলৌকিক মাহাত্ম্য ও তাহার ক্রমবিকাশ, বরাহ—মিহির ও খনার অমানুষী ইতিবৃত্ত, এবং জীবের অদ্ভুত ভাগ্যচক্র বা প্রাক্তনফল উপন্যাসাকারে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এই পুস্তকখানি বাঙ্গলার প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সুতরাং এই পুস্তকের বিশেষ পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। যাঁহারা জ্যোতিষ বিদ্যার আমূলবৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইহা পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

রাণী ভবানী। উক্ত লেখক প্রণীত ধর্ম্মমূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাণী-ভবানীর অলৌকিক ও বিচিত্র জীবনী পাঠ করিতে করিতে, তাঁহার আশৈশব পুণ্যময় পবিত্র চরিত্র সন্দর্শনে হৃদয় স্বতঃই পরিতৃপ্ত ও ধর্ম্মানুরাগী হইয়া উঠে। এ স্বর্গীয় দেবী-চরিত্র সমালোচনায় প্রকাশ করা দুরূহ। যাঁহারা স্বদেশের পূর্ব্বকালীন সুখশান্তির মধুর-স্মৃতি হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে চাহেন, যাঁহারা বঙ্গীয় কৃষক প্রজা ও দরিদ্রজনের দুঃখে হৃদয় কাঁদাইতে অভিলাষী, যাঁহারা ধর্ম্ম এবং সততার বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান দেখিতে চাহেন, তাঁহারা এই আদর্শচরিত্রচিত্র পাঠ করুন। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

উৎসব-আবাহন।

আগামী ২১এ ভাদ্র (ইং ৬ই সেপ্টেম্বর) সোমবার, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব। এতদুপলক্ষে ১১ নং মধুরায়ের গলি, সিমুলিয়া হইতে উক্ত দিবসে দলে দলে সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় যোগোদ্যানে যাইবে এবং তথায় সমস্ত দিবস মহামহোৎসব এবং প্রসাদ বিতরণ হইবে। তত্ত্ব-মঞ্জরীর গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকবর্গকে আমরা এই উৎসব-আনন্দে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি। সকলে আসিলে আমরা কৃতকৃতার্থ হইব। সমস্ত সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় এবং জনসাধারণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা—সকলেই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ ।

শ্রীচরণ ভরসা

[illegible]

ত্রয়োদশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা ।

রামকৃষ্ণ-লীলা ।*

ব্রাহ্মণাদির চরণে প্রণাম ।

যে প্রস্তাব লইয়া আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত, তাহা ব্যক্ত করার পক্ষে আমি যে কতদূর উপযুক্ত, তাহা বলিতে পারি না। যাঁহার কার্য্যপ্রণালী, যাঁহার মহিমা, যাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত তত্ত্বোপদেশ লইয়া আজ জগৎ মুগ্ধ, বিমোহিত ও স্তম্ভিত, যাঁহার উপদেশরাজি ও জীবন আলোচনা করিয়া কত কত বিদ্বান, পণ্ডিত ও দার্শনিকমণ্ডলী চমৎকৃত ও বিমুগ্ধ, তাঁহার লীলা সম্বন্ধে আমার ন্যায় একজন মূর্খ নরাধম অজ্ঞব্যক্তির আলোচনা করিতে চেষ্টা পাওয়া কতদূর সঙ্গত, তাহা আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তবে আমার এ ধৃষ্টতা কেন? তবে এ বাচালতা কেন? কেন যে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না। হৃদয়ের অভ্যন্তরের অভ্যন্তর প্রদেশ কেমন যে তাঁহার নাম স্মরণ করিলে গলিয়া যায়, কেমন যে প্রাণ তাঁহার মধুর নামে মাতিয়া উঠে, কেমন যে তাঁহার অমিয় চরিতের আলোচনায় প্রফুল্লতা জন্মে, তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। প্রভু বলিয়াছিলেন যে, রসগোল্লাটা যে কেমন মিষ্টি, তাহা অপরে যতক্ষণ না খায়, ততক্ষণ তাহাকে বোঝান

---

* চৈতন্য লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মজুমদার কর্ত্তৃক বক্তৃতার সারাংশ। তারিখ ৬ই আগষ্ট, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

যায় না। শুধু মিষ্টি, আহা বেশ, এইরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিলে তাহাকে তাহা উপলব্ধি করান যায় না। কিন্তু যদি তাহাকে একটু খাওয়ান যায়, তবে সে তাহার আস্বাদ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। প্রভুর নামের কি যে একটু মিষ্টতা লাগিয়াছে, ঐ যে কেমন কেমন ভাবে তাঁহার নামটী হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিবার যো নাই, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই। যিনি সে নামে মজিয়াছেন, তিনিই কিছু বুঝিতে পারেন, অথবা যাহাকে তিনি কৃপা করিয়া বোঝান, তিনিই বুঝিতে সমর্থ, নতুবা অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

রামকৃষ্ণ চরিত্র বড়ই পবিত্র, বড়ই মধুর। আমরা হিন্দুশাস্ত্রে যে সমস্ত অবতারাদির গুণানুকীর্ত্তন দেখিতে পাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহ গুণে, কেহ বিদ্যায়, কেহ ঐশ্বর্য্যে, কেহ বীর্য্যে, কেহ রূপে, জগত-সাধারণকে বিমোহিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব লীলাক্ষেত্রে সেরূপ কোনও বাহ্যিক পরিচয় সাধারণকে অবগত করান নাই। তিনি নির্জ্জনে, নিভৃতে, অতি গুপ্তভাবে দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায়, কোথায় লুকাইয়া থাকিয়া, কি করিয়া গেলেন, তাহা কেহই জানে না। কিন্তু এইক্ষণ কালে তাঁহার সেই চরিত্র যতই জনসমাজে বিস্তৃত হইতেছে, ততই তাঁহার চরিত্র লইয়া সকলে আন্দোলন করিতেছেন, এবং ততই সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতেছেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের ন্যায় মূর্খ লোকে বিনা যুক্তিতে, বিনা তর্কে, যাহা নয় তাহা, বিশ্বাস করিতে পারে, কিন্তু মহা মহা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দার্শনিক ও বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণ তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া জগতে ঘোষণা করিতেছেন। মহা মহা দার্শনিক পণ্ডিতগণ তাঁহার উপদেশরাজি আলোচনা করিয়া বলিতেছেন যে, ভারতে এই একজন (Original Man) অসাধারণ মনুষ্যের আবির্ভাব। যাঁহাকে লইয়া বড় বড় মহাজন ব্যক্তিরা এরূপ আলোচনা ও আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে আমরা আমাদের বুদ্ধিমত যতটুকু আলোচনা করিতে পারি, সে বিষয়ে চেষ্টা পাওয়া আমি কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করি। কাঠবিড়ালীর শক্তি, সাধ্য, চেষ্টা ও যত্নে কখন সমুদ্র বন্ধনে সক্ষম হওয়া যায় না। তথাচ রামচন্দ্র তাহাদিগের সেই ধূলিকণা নিক্ষেপেও আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের গাত্রে শ্রীহস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। অদ্য এ কাঠবিড়ালীর এ ক্ষুদ্র প্রয়াস, তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র হইলেও আশীর্ব্বাদ অতীব মহীয়ান।

কাঠবিড়ালী ধূলিকণা দিয়া আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিল। আমরা না দেখিয়া, না জানিয়া, না কিছু করিয়া, তাঁহার কৃপাকণা প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা আমাদের কার্য্যের পুরস্কার নহে, তাঁহার অপার কৃপার পরিচয়।

প্রভুর স্বগণ শিষ্যদিগের দ্বারায় তাঁহার যে সমস্ত জীবনী ও উপদেশরাজি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া এবং তাঁহাদের মুখে প্রভুর চরিত্র ও গুণগান শ্রবণ করিয়া, যাহা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই কথঞ্চিৎ অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করাই, এই বাগাড়ম্বরের উদ্দেশ্য।

১২৪১ সালের ১০ই ফাল্গুন, বুধবার, রামকৃষ্ণদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন। তিনি তাঁহার পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁহার জন্মভূমি কামারপুকুরে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, রামকৃষ্ণদেবের পিতা খুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরম তাপস ছিলেন। তিনি নারায়ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য তাঁহার গৃহাধিষ্ঠিত রঘুবীর ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। রামকৃষ্ণদেবের জন্মকালে খুদিরাম পিতা মাতার কর্ম্মোপলক্ষে গয়াধামে গমন করেন এবং তথায় স্বপ্ন দেখেন যে, শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী এক পুরুষ তাঁহাকে কহিতেছেন যে, আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব। তৎপরে তিনি বাটী আসিয়া তাঁহার স্ত্রীর নিকটও এক অলৌকিক ব্যাপার শুনিলেন। তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিওনা, আমিও এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। ক্রমে ক্রমে রামকৃষ্ণদেব ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাঁহার শারীরিক এমন কোনও বিশেষ রূপ ছিল না, কিন্তু বালককাল হইতেই তাঁহার প্রতি তাঁহার স্বদেশস্থ সকলেই এরূপ বিমুগ্ধ ছিলেন যে, তাঁহাকে যিনি একবার দেখিতেন, তিনিই বিমোহিত হইয়া যাইতেন। পল্লীপল্ল্যন্তর হইতে তাঁহাকে রমণীগণ দর্শন করিতে আসিতেন এবং তাঁহার দর্শনে তাহারা এমন মোহিত হইয়া যাইতেন যে, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দর্শন না করিয়া মন প্রাণ স্থির রাখিতে পারিতেন না। বাল্যকাল হইতেই তিনি সকলের প্রিয়, যে তাঁহাকে সাদরে ডাকিত, তাহারই নিকট ধাইয়া যাইতেন, এবং যে যাহা দিত আনন্দে আহার করিতেন।

তিনি সাধু সাজিতে এবং রামলীলা, কৃষ্ণলীলার ছলে খেলা করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। রামকৃষ্ণের বয়স যখন অনুমান পাঁচ বৎসর সেই সময়ে সন্নিকটস্থ লাহাদের বাটীতে এক সাধু আসিয়া অতিথি হয়েন, তিনি তাঁহার সহিত সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিলেন, তাঁহার নিকট আহারাদি করিলেন, অবশেষে তাঁহার অঙ্গে যে নববস্ত্রখানি জড়িত ছিল, তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া

কৌপীন পরিয়া মাতার নিকটে হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রায় ১৬৷১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বদেশে অতিবাহিত করেন। সেই কাল পর্য্যন্ত তিনি কেবল নানাবিধ দেবদেবীর লীলার অনুকরণে খেলা, কথনও স্বহস্তে তাঁহাদের মূর্ত্তিগঠন করিয়া পূজাদি করিতেন। তিনি যথন কৃষ্ণ বা শিব সাজিয়া ক্রীড়া করিতেন, তখন যে কি অদ্ভুত দৃশ্য হইত, তাহা কেহ বর্ণনা করিতে সক্ষম নহেন। কথন সেইভাবে অভিভূত হইয়া কতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় থাকিতেন। তিনি যাত্রা, পাঁচালীর গান ও ছড়া, যাহা একবার শুনিতেন, তাহাই মুখস্থ করিয়া যাহাদের নিকট হইতে শুনিতেন, তাহাদের শুনাইয়া পরাস্ত করিয়া দিতেন। তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—"যে বিদ্যার সহিত কেবল চালকলার সম্বন্ধ সে বিদ্যা আমি শিখিব না।" সামান্য বালক, এই সামান্য কথায়, যে গভীরতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা সামান্য বুদ্ধির অগোচর। আজকাল সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, লোকে যে কোনও প্রকার বিদ্যা বা বুদ্ধি উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করুক না কেন, তাহার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত আর কিছুই নহে। অর্থের দ্বারা চালকলা (আহার সংস্থান) হয় এবং তাহাই সকলের উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও ঐ চালকলা (ভাল ভাল বিদায়ের) প্রয়াসী হইয়া শাস্ত্রাদি ব্যবসায়ী হইয়া বসিয়া আছেন। বিদ্যা শিখিয়া পরমার্থ লাভ করিবার জন্য কয়জন লালায়িত! তাই বলিয়াছেন যে, চালকলা এখন যে বিদ্যার উদ্দেশ্য হইয়াছে, তাহা আমি শিখিব না। ব্রহ্মবিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা, বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যাহাতে সেই আদিবিদ্যাতত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়, সেই বিষয়েই চেষ্টা পাওয়া সকলের কর্ত্তব্য। যাহারা বড় বড় পণ্ডিত, তাহাদের শাস্ত্রাদি পাঠ কেবল তর্ক করিবার জন্য এবং বিচারে জিনিয়া ভাল ভাল বিদায় পাইবার উদ্দেশ্যে। তিনি বলিতেন যে, চিল শকুন প্রভৃতি অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে কিন্তু তাহাদের নজর থাকে গোভাগাড়ের দিকে, সেইরূপ যাহারা শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করেন, তাহাদের নজর সামান্য অর্থ ও সামান্য বিদায় এবং যশ লাভে পড়িয়া থাকে, সুতরাং আর উচ্চে উঠিতে পারে না। তাঁহার কথার তাৎপর্য্য এই—যাহাতে আমরা কিছুতেই পরমতত্ত্ব বিস্মৃত না হই, তৎপক্ষে সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত। প্রায় ১৭ বৎসর বয়সে তিনি

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কলিকাতায় ঝামাপুকুরে আসিয়া বাস করেন। তথায় তাঁহার ভ্রাতার এক চতুষ্পাঠী ছিল। উহার কিছু দিবস পরে, রাসমণি ১২৫৯ সালে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় রামকুমার পূজাকার্য্যে বরিত হইয়া প্রেরিত হয়েন। রামকৃষ্ণও তাঁহার সহিত তথায় গিয়াছিলেন। তদীয় ভ্রাতার পরলোক গমনের পর তিনিই কালীপূজায় ব্রতী হন।

যখন প্রায় ২২ বৎসর বয়স, তখন রামকৃষ্ণদেবের স্বদেশে বিবাহ হয়। বিবাহ কি? কেন প্রয়োজন? তিনি তখনও তাহা কিছুই বুঝিতেন না। বিশেষ ঈশ্বরানুরাগীর পক্ষে সম্ভাবনায় নহে। বিবাহের পর তিনি অতি সত্বরেই পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন।

কালীপূজায় ব্রতী হইয়া অবধি তিনি সাধনাকার্য্য আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার সাধনার ধারাবাহিক কোনও ইতিহাস পাইবার উপায় নাই, এবং তিনি পর পর কিরূপ সাধনা করিয়াছেন তাহাও কেহ অবগত নহেন। তিনি উপদেশকালে যাহা কিছু বলিতেন, তাহাই সকলে অবগত, এবং লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কালীপূজায় ব্রতী হইয়া তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পূজা করিতে লাগিলেন। কখন কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বলিতেন—"মা আমায় দয়া কর মা! আমি পণ্ডিত নহি, শাস্ত্রজ্ঞ নহি, স্তবস্তুতি জানিনা মা, তুই আমায় দয়া করবি কিনা বল, আমার প্রাণ যায় মা, দেখা দাও, আমি অন্য কিছুই চাই না মা, মান চাইনা মা, যশ চাইনা মা, দশজনে গণ্য মান্য এমন সাধ নাই মা, তুমি আমায় দয়া কর।" লোকে দেবদেবী দর্শন করিতে গেলে, অথবা পূজায় ব্রতী হইলে, কেবল তাঁহাদের নিকট 'দেহি দেহি' করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। কেহ ধন দাও, কেহ মান দাও, কেহ কন্যা দাও, কেহ পুত্র দাও, এই 'দাও দাও' করিয়া লোকে পাগল। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের সে ভাব একেবারেই ছিল না। তিনি জানিতেন যে, জগতের ক্ষণিক সুখের আশায় লোকে যে পরিশ্রম, কষ্ট ও প্রার্থনা করে, তাহা চকিতের তরে সুখদান করিয়া অপসৃত হয়। বাসনা বিনাশই সমস্ত সুখের মূল, বাসনাপূর্ণ হৃদয় হইলে নানারূপ কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তজ্জন্য তিনি মায়ের নিকটে তাঁহার দর্শন ও শ্রীচরণ লাভ ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করিতেন না, বা করেন নাই। তিনি বলিতেন যে, যদি কেহ কোনও ধনী ব্যক্তির নিকট যায়, সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি চাও, যে কেহ যাহা চায়, তাহাকে তাহাই কিছু কিছু দিয়া বিদায় করিয়া দেয়, কিন্তু যে বলে, আমি কিছুই চাহিনা,

আপনার সহিত পরিচয়ই একমাত্র প্রার্থনা, সেই ব্যক্তি ক্রমে তাহার বন্ধুরূপে পরিণত হইতে পারে, এবং সে ইচ্ছা করিলে পরে নিজেও যাহা ইচ্ছা লইতে পারে, এবং অপর দশজনকে সেই ধনীর দ্বারায় দেওয়াইয়াও দিতে পারে। এ শিক্ষা আমাদের অতীব প্রয়োজনীয়। কি ঐহিক সুখ, কি পারত্রিক মঙ্গল, ইহা লাভের ইচ্ছা থাকিলে, তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর ভিন্ন প্রকৃত সুখশান্তি লাভ করা যায় না। তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিলে, তাঁহার সদিচ্ছার উপর প্রকৃত বিশ্বাস থাকিলে, সাধনার দ্বারায় লোকে যে সমস্ত শম দম তিতিক্ষার উপযোগী হইয়া জগতের সুখ দুঃখ সমভাবে, বিনা মানসিক কষ্টে সহ্য করিয়া যান, তাহারই উপযোগী হইয়া মানব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে সক্ষম হয়েন। যে কোনও অবস্থাতেই থাকুন, তাহার মন কমলাকান্তের ন্যায় বলিবে—

যখন যেরূপে তুমি রাখিবে আমারে।
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে॥
বিভূতি বিভূষণ, রতন মণি কাঞ্চন,
বৃক্ষমূলে বাস কি রতন-সিংহাসনপরে॥

তিনি অহঙ্কার বা অভিমাননাশের জন্য মায়ের চরণপ্রান্তে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন। গঙ্গার তীরে পড়িয়া বালকবৎ 'মা মা' রবে ক্রন্দন করিতেন। এই অবস্থায় তিনি একদিন মায়ের দর্শন পাইলেন। এই দর্শন লাভের পর তিনি ছয় মাস অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন, আহারাদি করিতে পারিতেন না, শৌচপ্রস্রাবাদি কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। হৃদয় মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে এই সময়ে সর্ব্বদা শুশ্রূষা করিতেন।

ফুল না হইলে ফল হয় না, কিন্তু অলাবু ও কুমড়ার আগে ফল হয় এবং পরে ফুল বাহির হয়। রামকৃষ্ণদেবের সেইরূপ সাধন করিয়া ঈশ্বর দর্শন করিতে হয় নাই, মায়ের দর্শনের পর তিনি সাধন কার্য্য আরম্ভ করেন। যদ্যপি তিনি সামান্য মনুষ্য, জীব বা সাধু হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার আর সাধনার কি আবশ্যক ছিল? যে জন্য সাধনা তাহাই যদ্যপি হইল, তবে আর কে পরিশ্রম করিয়া থাকে? রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত অথবা অপরাপর সিদ্ধ মহাপুরুষেরা কে কবে তাঁহাদের ইষ্ট দেবদেবীর দর্শনলাভের পরে সাধনা করিয়াছেন? এরূপ ঘটনা আর কোনও জীবনে পরিলক্ষিত হয় না। তিনি ইহার পর গোকুল ব্রত হইতে আরম্ভ করিয়া, বেদ, পুরাণ,

তন্ত্রপ্রভৃতি পূর্ব্বপ্রচলিত প্রক্রিয়া সকল একে একে সাধনা করিয়াছিলেন। এই সকল সাধনের ভাব আপনি তাঁহার মনে উদয় হইত, এবং সাধনকালে ঠিক সেই সেই ভাবের এক একজন গুরু তাঁহার নিকটে আপনি আসিয়া জুটিতেন। দক্ষিণেশ্বরে যে পঞ্চবটী ও বিল্বতল আছে সেই তাঁহার সাধনার স্থল। যখন রাজযোগ, হটযোগাদি করিয়া বৈদিক সমাধি লাভের সাধনা করিলেন, সেই সময়ে তোতাপুরী নামক একজন সাধু আসিয়া তাঁহাকে সেই সমস্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব কোনও সাধনা তিন দিনের অধিক করেন নাই। রামকৃষ্ণদেব তিনদিনে সমাধি অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তোতাপুরীর এই সাধনায় ৪১ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণের এই অসাধারণ অবস্থা দেখিয়া তিনি আত্মদুঃখে গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জ্জনের ইচ্ছা করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় গঙ্গায় তিনি হাটুজলের অধিক আর কোথাও জল পাইলেন না। তিনি একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রায় এগার মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যখন সাকার পূজার সাধনা করেন, তখন অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন। তিনি একদিন তাঁহার কোনও আত্মীয় পণ্ডিতের নিকট তিরস্কৃত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে জানাইলেন— 'মা অমুকে বলে যে, আমার মাথা খারাপ হইয়াছে, যাহা কিছু দর্শন করি, তাহা চক্ষের দোষ, মায়া মাত্র, মা সত্য করে আমায় ব'লেদে, আমার কি হ'লো। অভয়া অভয় দিয়া বলিলেন 'তুমি যেমন আছ, তেমনি থাকো।' মাতা এই বলিয়া অদৃশ্য হইলেন। রামকৃষ্ণ তদবধি আর কাহারও কথায় কর্ণপাত বা দৃক্‌পাত করিতেন না। হিন্দু-ধর্ম্মের সমস্ত সাধনার পরে তিনি মুসলমান, শীক, খৃষ্টীয় প্রভৃতিও সাধনা করিয়া তিন দিনে তাহাদের সাধনার চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। তিনি সমস্ত ধর্ম্মসাধনার ফল, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিতেন, পৃথিবীতে লোকে ধর্ম্ম লইয়া এত কলহ ও বিবাদ করে কেন? সংসারের মধ্যে যেমন এক ব্যক্তি কাহারও পিতা, কাহারও মামা, কাহার শালা, কাহারও খুড়া, কাহারও জেঠা, কাহারও শ্বশুর, কাহারও জামাই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে যদিও প্রত্যেকের ভাব স্বতন্ত্র, কিন্তু সেই ব্যক্তি যেমন এক অদ্বিতীয় থাকে, সেইরূপ এক ঈশ্বর কাহারও হরি, কাহারও আল্লা, কাহারও দুর্গা, কাহারও কালী, কাহারও ক্রাইষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। যেমন এক জলকে কেহ পানি, কেহ বারি, কেহ ওয়াটার, কেহ একোয়া বলিয়া

থাকে, কিন্তু যেমন এক জলই বোঝায়, সেইরূপ যে কোনও নামে ঈশ্বর উদ্দেশে ডাকা হউক না কেন, সেই নামই তাঁহাকে নির্দ্দেশ করে। যেমন কেহ একটী বড় মৎস্য ক্রয় করিল, বাটীর কেহ তাহার ভাজা, কেহ তাহার চড়চড়ি, কেহ মাথার অম্বল, কেহ তাহা পোড়া খাইতে চাহে, ও খায়, সেইরূপ এক ঈশ্বরকে বহুলোকে বহুভাবে ডাকে ও সাধনা করে, কিন্তু সেই অদ্বিতীয় মৎস্যের ন্যায় সেই ঈশ্বরের পরিবর্ত্তন হয় না। অনেকে বলেন যে, রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত প্রভৃতিও তাঁহাদের সংগীতে রামকৃষ্ণের ন্যায় ধর্ম্মভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা একটু বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে বহুপার্থক্য দেখিতে পান। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"কালী হলি মা রাসবিহারী নটবরবেশে বৃন্দাবনে", "মন করনা দ্বেষাদ্বেষী, যদি হবিরে কৈবল্যবাসী। রামরূপে ধর ধনু, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী" ইত্যাদি বলিয়া বলিয়াছেন—"সবই আমার এলোকেশী।" রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহাদের ইষ্টদেবী লাভের পর সেই ভাবে দাঁড়াইয়া সকলের প্রতি দর্শন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের সেই আপন ভাবের মধ্যে অপরাপর ভাব দেখা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। সাধক বা সিদ্ধ পুরুষেরা এই ভাবের অধিক যাইতে পারেন না। তাঁহাদের একটী সাধনা করিতেই জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়, কেহ সিদ্ধাবস্থা লাভ করেন, কেহ বা তাহাতেও অশক্ত হয়েন। যাঁহারা সিদ্ধ হইয়া আপন ভাব লাভ করেন, তাঁহাদের সেই আপন ভাব দিয়াই অপরাপর ভাবগুলিকে দেখিতে হয়, সুতরাং তাঁহারা যে তাঁহাদের ইষ্ট-মূর্ত্তিকেই সকল মূর্ত্তির আদিকারণ মনে করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নাই।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

এই সময়ে, ভারতে এক হিন্দুধর্ম্মেরই অখণ্ড প্রতিপত্তি ছিল সুতরাং, তখন এই বাক্য দ্বারায় বোধ হয় যে, তৎকালীন লোকের শান্ত দাস্য ইত্যাদি ভাবের যে পার্থক্য ছিল, তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। অথবা সেই সময়ে বৈদিক ও পৌরাণিক ভাবের যাহা কিছু পার্থক্য ছিল, তাহা তাঁহার 'বিশ্বরূপ' রূপ প্রদর্শনের দ্বারায় এক বলিয়া সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য তাঁহাকে কিছু বিশেষ ক্রিয়ার দ্বারায় মনুষ্য সমাজে পরিদর্শন করানের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু আজকাল ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাভাবের নানামতের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, তাহাতে

রামকৃষ্ণের ন্যায় একজন ধর্ম্মসংস্কারকের যে কি প্রকার প্রয়োজন, তাহা ধর্ম্ম বিষয় লইয়া যাঁহারা আন্দোলন করেন, তাঁহারাই বুঝিতে সক্ষম, অন্যে নহে। তিনি সকল ধর্ম্মসাধন বা ভাবের মধ্যে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে মেরুদণ্ডস্বরূপ দেখিয়া গিয়াছেন এবং দেখিতে উপদেশ করিয়াছেন। আমার কালী হইতেই তোমার যীশু হইয়াছেন, ইহা বলিলে, খৃষ্টানের সহিত বিবাদের অব্যাহতির উপায় নাই, কিন্তু যেখান হইতে তোমার খৃষ্ট, সেখান হইতে আমার কালী; তোমার পক্ষে তোমার রাম যেমন, আমার পক্ষে আমার দুর্গা, কিম্বা গৌরাঙ্গ তাহাই, ইহা বলিলে আর বিবাদ কোথায়! তোমার ঘি ভাত খাইয়া যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, আমার মুড়ি মুড়কি কিম্বা শাক ভাতেও সেইরূপ ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, সুতরাং ক্ষুধা নিবৃত্তি সম্বন্ধে আর কোনও ব্যতিক্রম রহিল না। কাজে কাজেই দেখা যাইতেছে, যে, যেদিক দিয়াই যেমন করিয়াই ভগবানকে ডাকে, তাহার তাহাতেই প্রাণের তৃপ্তি লাভ হয়। সন্দেশটা যে দিক দিয়াই ভাঙ্গিয়া খাও, মিষ্ট লাগিবেই লাগিবে।

সাধন ভজনের দ্বারায় এই কার্য্য সমাধা করিয়া পরে রামকৃষ্ণদেব মথুরবাবুর সহিত তীর্থযাত্রায় বহির্গত হয়েন। তিনি কখনও সাধুর বেশ অর্থাৎ গৈরিক ইত্যাদি পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন না। বলিতেন, উহা পরিলে আমি সাধু বলিয়া মনে একটা অভিমান আইসে এবং উহাতে ছাপ মারা বা বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজ করে, অর্থাৎ আমি সাধু, একথা মুখে না বলিয়া, তাহা প্রকারান্তরে লোকের কাছে পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি সাধারণ মনুষ্যের বেশে মথুরবাবুর সহিত গিয়াছিলেন। মথুরবাবু তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন, তাঁহার তাঁহাকেই সাক্ষাৎ কালী বলিয়া বিশ্বাস ছিল। এ বিষয়ে তিনি অনেক পরীক্ষা করিয়া পরিচয় পাইয়াছিলেন। যখন তাঁহারা কাশীধামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রামকৃষ্ণদেব একমাত্র ত্রৈলঙ্গস্বামীর দর্শনে পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবনে যাইয়া তিনি আক্ষেপ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তথায় ওষ্ঠলোম-ফেলা বামারূপধারী পুরুষদিগের প্রেমবৈচিত্র্য দেখিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশেষে এক দিবস নিধুবনে ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গামাতা নাম্নী এক অতি প্রাচীনা বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ হয়। বৃদ্ধা তাঁহাকে দেখিয়াই "আরে দুলালী, আরে দুলালী" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া ধরিলেন। 'দুলালী' শ্রীমতীর এক নাম।

পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। চৈতন্ত লাভ হইলে কেবল নয়নধারা বহিতে লাগিল। গঙ্গামাতা তাঁহাকে কত স্তবস্তুতি ও বিনয়াদি করিলেন—তাহা অব্যক্ত, বুঝিবার উপায় নাই। এইরূপে তাঁহারা নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা।

(১)

কোথা হতে আসি আমি
কোথা চলে যাই,
কে দিবে উত্তর তার
কাহারে সুধাই?

(২)

পাপে ভরা বসুন্ধরা
জীব স্বার্থপর,
না শুনে পরের কথা
থাকে নিরুত্তর।

(৩)

সকলেই সমভাবে
উদ্দেশ্যবিহীন,
উদ্দাম বিলাসপ্রিয়
পাপেতে মলিন।

(৪)

বারেক দেখেনা চেয়ে
অনিত্য সংসার,
জড়শক্তি সীমাবদ্ধ—
শেষ আছে তার।

(৫)

তমোময় কাল-গর্ভে
এই গম্যস্থান,
জীবনের পরপারে
নভঃ জ্যোতিষ্মান।

(৬)

এইথানে প্রাণীগণ
ত্যজি কলেবর,
হইলে বিগতপ্রাণ
যায় লোকান্তর।

(৭)

দৈবী আভা উদ্ভাসিত
সূক্ষ্ম দেহীগণ,
নীরব-গাম্ভীর্য্যে হেথা
করে বিচরণ।

(৮)

চিরানন্দময় পুরী
শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়,
দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত স্থান
সুখের আলয়।

(৯)

দুর্ব্বলের বল যিনি
সেই পরমেশ,
মহিমা প্রভায় যাঁর
উজলে সে দেশ,

(১০)

উদ্দেশে চরণে তাঁর
কর প্রণিপাত,
বিপদে সম্পদে পাবে
দেব আশীর্ব্বাদ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পুতুল পূজা।

প্রতিমা-দ্বেষীগণ ও তাহাদেব শিষ্যগণ আমরা পূজা করি বলিয়া আমাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর মানুষ যে, পুতুল পূজার উপকারিতা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন না, সে কথা লিখিয়া বোধ হয় দুরদর্শী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আর বিশদরূপে বুঝাইতে হইবে না।

পুতুল পূজায় লাভ আছে কিনা, উপকার আছে কিনা, আত্মার উন্নতি হয় কিনা, সে কথা যাঁহারা পুতুল পূজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন, আর যাহারা সেই মহাপুরুষদিগেব সৃষ্ট, পুতুল পূজা করিতেছে, তাহারাই বুঝিতে পারিতেছে। যে, যে বস্তুর ব্যবহার করে, সেই সে বস্তুর উপকারিতা অনুপকারিতা বুঝিতে পারে, আর যে, না করিয়াই সমালোচনা করে, তাহার মত নির্ব্বোধ আমরা সংসারে আর দ্বিতীয় দেখিতে পাইনা। আমরা অবিদ্যাচ্ছন্ন মানব, আমরা সাধনপথে এখনও উঠি নাই, এ সময়ে আমাদের পুতুল পূজাই আবশ্যক, পুতুল পূজা ব্যতীত আমাদের শান্তিদায়ক কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না।

ছেলে মেয়েরা শৈশবকালে, ধূলা, কাদা, লতা, গুল্ম, বৃক্ষপত্র প্রভৃতি লইয়া খেলা করে, মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে, ঐ সংসারানভিজ্ঞ ছেলে মেয়েদের বৃথা কার্য্যের ভিতরে সত্যের আভাস পাওয়া যায়। তাহারা কখনও স্নান করে, কখনও আহার করে, কখনও পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া আনন্দলাভ করে, কখনও তদুপলক্ষে জ্ঞাতি বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করায়, ভাত না লুচি দিব কিনা, জিজ্ঞাসা করে, জল দেয়, পান দেয়, কেহ উহার ভিতরে ঝগড়া করে, বিবাদ করে, আবার কেহ উহার ভিতরে প্রবীণা সাজিয়া সে বিবাদ ভঞ্জন করে। ইত্যাদিরূপ তাহারা কত কি করিয়া থাকে।

ইহার দ্বারা কি বুঝা যায়? ইহাতে নিশ্চয়ই তাহাদের ভবিষ্যত জীবনের উন্নতি হয়। সংসারে তাহারা যে ভাব লইয়া প্রবেশ করিবে, যে সমস্ত কার্য্য তাহাদের জীবনের একমাত্র সার হইবে, সেই সমস্ত ভাবই, সেই সমস্ত কার্য্যই শৈশবকালে তাহারা হৃদয়ে আবদ্ধ করে, এবং শিক্ষা করে।

হে বিতর্কিন! ভাব দেখি, দশ, বার বৎসরের মেয়ে যখন চির অপরিচিত শ্বশুরের ঘর করিতে যায়, তখন তাহার বাল্যকালের কৃত অসত্য কার্য্য সাহায্য করে কি না? সে যদি বাল্যকালে ঐ অসত্য কার্য্য না করিত, তাহা হইলে আজ তাঁহার প্রকৃতকার্য্য শিক্ষা করিতে কত কষ্ট হইত! আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন বালিকা বিবাহের পরই উদ্বন্ধনে বা বিষপান করতঃ আত্মহত্যা করিয়া সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছে। ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া, অনেক জ্ঞানীজন নিরূপণ করিয়াছেন যে, বাল্যকালে সাংসারিক কার্য্য শিক্ষা না করিবার ফলই—এই ভীষণ আত্মহত্যা।

ছেলে মেয়েদের বৃথা খেলা যেমন তাহাদের সংসারের প্রকৃত কার্য্যের সহায়তা করে, পুতুল পূজাও সেইরূপ আমাদের ভগবানের প্রকৃত পূজার সাহায্য করে। বাহ্য উপকরণের দ্বারা পুতুল পূজা করিয়া, আমরা ভগবানের অধ্যাত্মিক পূজা ও মানসিক পূজা শিক্ষা করি। পুতুল পূজা না করিলে, আমরা যে পূজা করিয়া মুক্তি লাভ করিব, যে পূজা করিয়া আমরা চির-শান্তি লাভ করিব, যে পূজা করিয়া আমরা জগতে ধন্য হইব, সে পূজা কখনই শিক্ষা করিতে পারি না। যাঁহারা ঘৃণাপূর্ব্বক পুতুল পূজা পরিত্যাগ করিয়া, লম্ফপ্রদানে বৃক্ষাগ্রে উঠিবার ন্যায় চরম পূজা করিবার জন্য প্রস্তুত হন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মূর্খ। সন্তরণ শিক্ষা না করিয়া, যিনি অনন্ত সমুদ্রে সন্তরণ দিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিতান্তই ভ্রান্ত, তাঁহাকে বাতুল ব্যতীত অন্য কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যাইতে পারে না।

যাঁহার বহু জন্ম জন্মান্তরের তপস্যার প্রভাবে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল, তিনিই হয়ত বলিয়াছিলেন যে "সাকারমনৃতং বিদ্ধি"। কিন্তু তাই বলিয়া, তোমার আমার ন্যায় জ্ঞানান্ধ ব্যক্তির সাকারকে মিথ্যা মনে করিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ ব্যক্তি যে স্তরে দাঁড়াইয়া ঐ কথা বলিয়াছেন, তুমি, আমি তাহার বহু নিম্নে অবস্থিত। অতএব আমাদের ঐ কথার অনুসরণ করা, কখনই উচিত নহে। একজন কোটিপতি হয়ত, একজন সহস্রপতিকে

উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া, অর্থশূন্য দীনদরীদ্র আমি, আমার ঐ লোকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, প্রগল্‌ভতা ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে।

বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এখনও আমাদের প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় নাই, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে এখনও আমরা অতি শিশু, এখনও আমাদের প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের পথে আরোহণ করিবার অনেক বাকী, এরূপ অবস্থায় আমাদের মধ্যে কাহারও মনে করা উচিত নহে যে, আমি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী, আমার আর পুতুল পূজার কোন আবশ্যক নাই। আমরা যখন প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিব, তখন হৃদয় সিংহাসনেও যেমন ভগবানকে দেখিব, পুতুলের ভিতরেও তেমনই দেখিব। ব্রহ্ম অসীম পদার্থ, আমাদের অসীম পদার্থ ধারণা করিবার ক্ষমতা নাই, তাই জ্ঞানীজন, অসীম পদার্থকে সীমাবদ্ধ করিয়া সাধনা করিবার জন্য, পুতুল পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; তাই বলিতেছি যে, পুতুল পূজা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার একটী সহজ পন্থা। আজকাল আমরা কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হইয়া যেরূপ হীনশক্তি হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে পুতুল পূজা ভিন্ন ভগবানের নিকটে পৌঁছিবার আর আমাদের সহজ উপায় বা পথ নাই।

পুতুল পূজার বিরুদ্ধে যিনিই যাহা বলুন না কেন, যে ব্যক্তি পুতুল পূজার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, যে ব্যক্তি পুতুল পূজার উপকারিতা অনুভব করিতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি আর কিছুতেই পুতুল পূজা পরিহার করিবে না। পুতুল পূজাতে আত্মার উন্নতি, আত্মার উৎকর্ষ সাধনই হয়। পুতুল পূজা, ব্রহ্ম-সেবা ব্রহ্মপূজা ভিন্ন আর কিছুই নয়। সিদ্ধ মহাপুরুষ সাধুজন মুখে শুনা গিয়াছে যে, সূক্ষ্মকার্য্য করিবার পূর্ব্বে স্থূলকার্য্য করাই জ্ঞানীজনোচিত কার্য্য।

যাঁহারা বলেন যে, পুতুলের ভিতরে কিছুই নাই, কি পূজা করিব? তাঁহাদের জন্য একটী গল্পের অবতারণা করিলাম। এক অনাথা স্ত্রীলোকের একটী অবোধ সন্তান ছিল, সে কিছুই বুঝিত না, বা কোন কার্য্য করিতে জানিত না, তাহার যত কার্য্য, সে সমস্ত কার্য্যই তাহার জননীর করিতে হইত। একদিন তাহার প্রসূতীর ভয়ঙ্কর জ্বর হইল, উঠিবার শক্তি নাই, এমন সময় সে অত্যন্ত পিপাসিত হইয়া মায়ের নিকট আসিয়া বলিল মা! জল দাও। মা সন্তানের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া রুগ্নস্বরে বলিলেন, বাবা! ঐ ঘরে কলসীর মধ্যে জল আছে, যাও খাওগে, আমার উঠিবার শক্তি নাই।

অবোধ ছেলে, তাহা শুনিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কলসী কামড়াইতে আরম্ভ করিল। কামড়াইতে কামড়াইতে দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, শোণিত বহির্গত হইতে লাগিল; তথাপি কলসী মধ্যস্থ বারি লাভ করিতে সমর্থ হইল না। তখন আর কি করিবে; অবশেষে অসমর্থ হইয়া রোদন করিতে করিতে মায়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। মা সন্তানের ঐরূপ ভাব দেখিয়া নিজের অদৃষ্টের ধিক্কার দিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা পুতুলের ভিতরকার বিষয় বুঝিতে না পারিয়া বাহিরে দংশন করিতেছেন, তাঁহাদেরও কেবল পরমায়ুরূপ দাঁত ক্ষয় হইতেছে। তাই বলি ভাই! আর কালবিলম্ব না করিয়া, আর সন্দেহ শৈবালাচ্ছন্ন হৃদয়-সরোবরে তর্ক-জাল বিস্তার না করিয়া, সরল বিশ্বাসালোক হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করতঃ ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া পুতুলকে ভগবানের স্বরূপ ভাবিয়া পুতুলরূপী ভগবানের পূজা কর, আর হৃদয়-সিংহাসনে সেই মূর্ত্তি স্থাপন করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলেই ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিবে, তাহা হইলেই সেই অনন্তরূপময়ের জ্যোতির্ম্ময়রূপ সন্দর্শন করিয়া মহাভাবে বিমুগ্ধ হইতে পারিবে। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে দূরে রয়।"

আমরা জ্ঞানহীন, শক্তিহীন, আমরা কামিনীকাঞ্চনের দাস, আমরা মায়া মুগ্ধ মূঢ়জীব, আমরা কাল যাহাকে দেখি আজ তাহার কথা আমাদের মনে থাকেনা, এরূপ অবস্থায় কি আমরা সেই নামরূপবিহীন চিরাদৃষ্ট বস্তুকে কেবল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখিতে পারি? না, আমরা মাটিতে দাঁড়াইয়া হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক উচ্চবৃক্ষের অগ্রদেশস্থিত ফলগ্রহণরূপ অসম্ভব কার্য্য করিতে পারিব না—ভাবিয়াই, আমাদের মহানুভব পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রহ্মফল লাভ করিবার জন্য পুতুল পূজারূপ সোপান সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

মধু, ফুলের উপরে থাকে না, ভিতরে থাকে, যে মূর্খ ভ্রমর, সেই উপরে মধু না দেখিয়া ফুলকে ব্যঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়; আর যে, সুচতুর, সেই ফুলে বসিয়া মধু আকর্ষণ করিয়া পান করিতে থাকে। যিনি বাস্তবিক জ্ঞানী, বাস্তবিক পণ্ডিত, তিনিই পুতুল পূজায় আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। আর যিনি নির্ব্বোধ, তিনিই পুতুলের ভিতরে কিছু নাহি বলিয়া, অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, সকলের ভিতরেই তিনি অবস্থিত, "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ"

অতএব তিনি পুতুলের ভিতরেও আছেন, এরূপ অবস্থায় পুতুল পূজা করিলে কেন ভগবানের পূজা সিদ্ধ হইবে না? কেন তিনি প্রসন্ন হইবেন না? কেন তিনি তাঁহার চিনিবার শক্তি আমাকে প্রদান করিবেন না? অবশ্য করিবেন।

যেমন প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে তরঙ্গের উদয় হয়, সেইরূপ পূজকের হৃদয়ে ভাবের হিল্লোল উত্থিত হইলে সম্মুখস্থ প্রতিমার ভিতরে নিশ্চয়ই দেবতার আবির্ভাব হয়—

"অর্চকস্য তপোযোগাৎ অর্চনস্যাতিশায়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমিচ্ছতি॥"

দীনবৎসলে মা! আমি তোমার জ্ঞানবিদ্যা বিহীন নিষ্কিঞ্চন সন্তান,—তোমাকে চিনিবার শক্তি আমার নাই। দয়াময়ি! তুমি দয়া করিয়া আশীর্ব্বাদ কর যে, তোমার স্বরূপ যে, এই পুতুল, এই পুতুলের শ্রীচরণ অর্চ্চনার দ্বারাতেই যেন তোমাকে জানিতে পারিয়া আমি সংসার সমুদ্র মহানন্দে উত্তীর্ণ হইয়া যাই—

"সংসারাব্ধিং সুখেন প্রতরতি।
গিরিজাপাদপদ্মাবলম্বঃ॥"

শ্রীকান্তিবর ভট্টাচার্য্য।

বারাণসী রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম।

বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অষ্টম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী পাঠ করিলে, একদিকে যেমন সেবাব্রতীদের উদার প্রেম, নিঃস্বার্থ শ্রমশীলতা ও হৃদয়ের মহত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়, অপরদিকে তেমনি এই নীরব সাধনার সুচারু ব্যবস্থা, নিখুঁত কার্য্যপ্রণালী ও আশ্চর্য্য সফলতা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী সেবাব্রতের দ্বারা মানুষের সেবাকে এমনভাবে নারায়ণের পূজায় পরিণত করিবার হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত জগতে একান্তই বিরল।

গত বৎসর (১৯০৮-১৯০৯) সর্ব্বশুদ্ধ ৩০৪৪ সংখ্যক ব্যক্তি আশ্রমের সেবা গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের সমস্ত প্রদেশের সকল ধর্ম্মের এবং প্রায় সকল জাতিরই স্ত্রীপুরুষ, জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আর্ত্ত দরীদ্রের সেবায় যে আশ্রম ব্রতী হইয়াছেন, তাহা কার্য্যবিবরণী ১ম, ২য় ও ৩য় তালিকা দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা

যায়। সেবাশ্রমের হাঁসপাতালে গতবৎসর ১৪৫ জন রোগীর সেবাশুশ্রূষা করা হইয়াছে। বারাণসীর ম্যাজিষ্ট্রেট ই, সি, র্যাডিস্ মহোদয় এই হাঁসপাতাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, "যদিও "এখানে অল্পই স্থান সঙ্কুলান হয়, তথাপি এমন অনেক রুগ্ন ব্যক্তি এখানে আশ্রয় পাইয়া থাকে, যাহাদের অন্য কোথাও আশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা বা ভরসা নাই। "বারাণসী সেণ্ট্রালহিন্দু কলেজের" সহকারী অধ্যক্ষ আরাণ্ডেল সাহেব বলেন :—"আর্ত্ত-দরীদ্রের সেবাশুশ্রূষা বিষয়ে গৌরব করিবার মত কাশীধামের যাহা কিছু আছে, তন্মধ্যে এই সেবাশ্রমই শ্রেষ্ঠ।" বিবরণী পাঠে বাস্তবিকই এমন মনে হয় যে, সেবাশ্রমের কার্য্যকলাপ স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলে কেহই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

নিরাশ্রয় আতুর দরীদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি সহকারে ৩৮ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী বৃহত্তর হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সেবাশ্রম একথা কিছুকাল হইতে সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়া আসিতেছেন। ইহার ফলে সহৃদয় ব্যক্তিগণ এ পর্য্যন্ত যতদূর অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে একটী দাতব্য ঔষধালয়, একটী অফিস ঘর, পাঁচটী সাধারণ রুগ্নাগার এবং তিনটি সংক্রামক রুগ্নাগার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এখনও একটী ছোট সাধারণ রুগ্নাগার, একটী রন্ধনশালা, সেবকদের বাসস্থান, চাকরদের শয়নাগার, পাইখানা, স্নানাগার, শবপরীক্ষার ঘর, ফটক ও দ্বারপথ নির্ম্মাণার্থে ১৪ হাজার টাকা আবশ্যক। এই অর্থের জন্য সেবাশ্রম জনসাধারণের দ্বারস্থ। বারাণসীর মত নগরে যে সেবাকার্য্যের এতদূর উপকারিতা, যে সেবাকার্য্যের মহদ্দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের পক্ষে এতই দরকার, অর্থাভাবে সেই কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিতে দেওয়া কোনমতেই সঙ্গত নহে। এমন উদার, সুমহান্ সেবাব্রতের সাহায্যে একটী পয়সা ব্যয় করিলেও সে ব্যয় সার্থক। সেইজন্য আমরা আজ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের আবেদনে যোগদান করিয়া সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিতেছি যে, যিনি যতটুকু পারেন, ততটুকুই এই পুণ্যকর্ম্মের সাহায্যার্থে অবিলম্বে যথাস্থানে প্রেরণ করিয়া বিধাতা ও সাধুমহাত্মাদের আশীর্ব্বাদভাজন হউন। সেবাশ্রমের সাহায্যকল্পে যাঁহার যাহা কিছু দেয়, অনুগ্রহ করিয়া সহকারী সম্পাদক, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, রামপুরা, বেনারস্ সিটি, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

মানবের বাসনা।

বাসনার ডোরে আবদ্ধ যেজন
সে জন কখনো বলিতে নারে,
"এই বাসনাটী মিটাইয়া শুধু
যাইবো সত্বর তাহার পারে।"
কুয়াসার মত আসে বিস্তারিয়া
পুনঃ তারি মত না যেতে চায়,
হোক্ মহাজ্ঞানী—কি করিতে পারে?
অজ্ঞান-আবর্ত্তে পড়িয়া যায়!
(কিন্তু) কুয়াসা যেমন প্রভাকরে হেরি
মৃদু মৃদু যায় সমীরে মিলি,
বাসনা তেমন দেব-কৃপা রবি-
কিরণ লভিয়া যায়গো চলি।
অন্ধকার কভু যায় অন্ধকারে—
আলোক সুমুখে না এলে তায়?
বাসনা-তিমির জাগে তারি মাঝে
বিচার-আলোক নাহিক যার।
বাসনার যদি দাসত্ব করিতে
পরাণ সতত আকুলে ধায়,
সুধীবর! তবে যাওহে ছুটিয়া
বিশ্রাম লভিতে বিভুর পায়।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।*

কৃপা কর কৃপাময়! জুড়ি দুটী পাণি—
মাগি ভিক্ষা; হৃদে ধরি শ্রীপদ দু-খানি।
দ্বাপরেতে রামকৃষ্ণ ছিলে দুটী ভাই,
বৃন্দাবনে নাম ছিল কানাই বলাই,

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব উপলক্ষে লিখিত।

কলিযুগে তুমি প্রভু রামকৃষ্ণ নামে—
অবতীর্ণ হয়েছিলে ইহ-বঙ্গ ধামে ;
নররূপে শ্রীঅঙ্গের অপরূপ জ্যোতি—
হেরিয়ে সবার হ'তো পুলকিত মতি ;
যোগেতে পরমহংস, দেব অবতার,
আমি কি বর্ণিব দেব, মহিমা তোমার।
দানিয়া পরমজ্ঞান ভক্ত-জনগণে,
চরিতার্থ করিয়াছ অমিয় বচনে ;
সংসারের অসারতা করিয়া জ্ঞাপন,
সমভাবে বুঝায়েছ মৃত্তিকা কাঞ্চন ;
চর্ম্মচক্ষে যে দেখেছে তব শ্রীচরণ,
জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়াছে তাহারি তখন।
তখনি তোমারি প্রেমে মজায়েছে মন,
ভুলিতে নারিবে কভু, যাবত জীবন ;
জানিয়াছে ঘুচিয়াছে ভবের বন্ধন,
বৈতরণি তরিবার ভেলা ও চরণ ;
বুঝিয়াছে মনে জ্ঞানে করুণা অপার,
এ ভীষণ ভবার্ণবে তুমি কর্ণধার।
লীলা সারি, মায়াময় দেহ পরিহরি,
পশিয়াছ নিত্যধামে আপনি শ্রীহরি।
চক্ষের অন্তরে প্রভু গিয়াছ চলিয়া,
অদৃশ্য অমরপুরে রহিয়াছ গিয়া ;
গিয়াছ গিয়াছ দেব, ত্যজিয়াছ ভূমি
জানি আমি, সর্ব্বময় সর্ব্বব্যাপী তুমি।
যে দিকে যখন প্রেমে ফিরাই নয়ন,
পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি করি দরশন ;
স্বপনে কি জাগরণে কিম্বা নিদ্রা ঘোরে,
ওই তেজোময় রূপ চারিদিকে ঘোরে,
তোমার উৎসবে দেব, অতুল উৎসব,
সর্ব্ব মুখে রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রব।

জয় জয় রামকৃষ্ণ পতিতপাবন,
ভক্তি-ভাবে হৃদে ধরি রাতুল-চরণ,
নামামৃত পান করি, নাম করি গান,
ভাবেতে বিভোর হই, স্নিগ্ধ হয় প্রাণ।

সেবক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

গত ২১ ভাদ্র, জন্মাষ্টমীর দিন কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে ঐ দিবস ১১ নং মধুরায়ের গলি সিমুলিয়া হইতে দলে দলে সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় যোগোদ্যানে যাইয়া কীর্ত্তনাদি করিয়া উৎসব ক্ষেত্র পুণ্য ও আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমাদের অনুমান, প্রায় পঞ্চদশ সহস্র লোক উৎসব ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া শ্রীপ্রভুর গুণগানে তাঁহার পাদপদ্মে হৃদয়ের ভক্তি ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তথায় সমস্ত দিবস প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল, প্রায় ৫০টী সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা নিম্নে কয়েকটী সম্প্রদায়ের গীত উদ্ধৃত করিলাম।

গীত।

(১)

অপরূপ সাজে, শ্রীপ্রভু বিরাজে, হেরিয়ে নয়ন জুড়াল রে।
(কেবল ফুল-আভরণেই ভুবনমোহন)
(ওরূপ দরশনে নয়ন জুড়াল রে)
পতিতের হিতে, পাতকী তারিতে, নবভাবে ভবে প্রকাশ রে॥
(রামকৃষ্ণ রূপে)
শ্রীপদ যুগলে, শতদল দলে,
(কিবা কমলে কমল মিশায়েছে)
শ্রীপদ-কমলে
(সেই কমলা-সেবিত সুকোমল শ্রীপদ-কমলে)
বসি কমল-আসনে মোহন বেদী-পরে॥
(এই বিশ্ব হিতে) (জীব উদ্ধারিতে)

আজানুলম্বিত বাহু-সুললিত, শ্রীঅঙ্গে সুবাস চন্দন চর্চ্চিত,

(সদা বরাভয়-করে অভয়দাতা রূপে)

সুবিশাল বক্ষে, ফুল-হার সুখে, কিবা দোলে মৃদুল বায়ু-ভরে ॥

(মৃদু মধুর মধুর)

করুণায় মাখা অধরেতে লেখা, কভু উজলিত সুহাসির রেখা,

(হেরে দীন অভাজনে করুণা নয়নে)

[illegible] নাম, যায় দুঃখ রাশি, কত আশা জাগে হৃদি-পরে ॥

(কল্পতরু নামে)

মাতি প্রেমানন্দে, যত ভক্তবৃন্দে,

(মধুর রামকৃষ্ণ জয় রবে) (যে নামে ত্রিতাপ-জ্বালা যাবে)

(ভাবে চল চল রামকৃষ্ণ প্রেমে) (দয়াল রামচন্দ্রের বিলান নামে)

আজি নাম তরঙ্গে ভেসে যায় রে।

(প্রভুর গুণ-গানে) (রামকৃষ্ণ ব'লে)

সেবকমণ্ডলী।

---

(২)

কীর্ত্তন—একতালা।

কত দেশ বিদেশে, ঘুরিয়ে নৈরাশে,

(শেষে) আইনু তব দুয়ারে।

ভাবিনু চরণে, লভিয়ে শরণ,

অনায়াসে যাব পারে ॥

(পদ-ভেলা ভাসিয়ে ভবে)

জনমে মরণে (তব) সেবক হইয়ে,

ভেবেছিনু ভবে যাবে দিন ব'য়ে,

(আমি) পূজিব দুখানি চরণ রাখিয়ে

(এই) দীন হৃদয় কুটীরে ॥

(আমার সে আশা পূরিল কৈ)

(আমার সাধে বাদ কে সাধিল)

নিয়তি আমার অন্ধকারময়,

তাই কি লুকালে ওহে দয়াময়,

(আমি) একাকী অনাথ, ওহে অনাথনাথ,
পড়ে আছি ভব প্রান্তরে ॥
(তুমি পরম দয়াল শুনেছি হে)
(তোমার দেখে কি দয়া হয় না হে)
শুনি দীন তরে, এলে দেহ ধ'রে,
বিজনে কাঁদিলে কাঙ্গালের তরে,
এ গতিহীনের কথা, পশে নাকি সেথা,
তোমার কর্ণকুহরে ॥
(আমার গতি কি হবে হে) (ওহে অগতির গতি)
দীনের তরে শুনি, কালী মায়ের কাছে তুমি,
পূজা দিতে দেব কত ভাব চিনি,
(এমন দয়াল দেখিনারে)
সে সব দীনের ভার, কে লবে তোমার,
(আজ) পথে পথে তারা ফেরে ॥
(অনাথের মত হয়ে) (তোমার বিহনে হে)
তুলে লও কোলে, তোমার কাঙ্গালে,
স্থান দাও পদে আপনার ব'লে,
(আমার তুমি বিনে কে আর আছে)
আর রেখোনা ভুলায়ে, চোখে ঠুলি দিয়ে,
এই জনম দুঃখীরে ॥
(আর জ্বালা সহিতে নারি)

সালিখা—ভক্তমণ্ডলী।

---

(৩)

(এই) দীন-হীনে দয়া কর, দয়ার সাগর।
আমি নাহি জানি স্তুতি ভক্তি অধম বড়ই পামর।
অপার তব মহিমা, কে করিবে তব সীমা,
(তুমি) জীবের দুঃখে দুঃখী হয়ে,
দেশ কাল বিচারিয়ে,
ভিন্ন ভিন্ন যুগে ধর ভিন্ন ভিন্ন অবতার।

তুমি মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ, হ'লে পুনঃ নরসিংহ,
(আবার) হরিতে বলির গর্ব্ব,
(প্রভু) ধরিলে আকার খর্ব্ব,
পুনঃ সংহারিতে ক্ষত্র সর্ব্ব হৈলে হে পরশুধর।
রঘুকুল গৌরব, সীতাপতি রাঘব,
(তুমি) বৃন্দাবনে নন্দ-সুত,
পুনঃ হৈলে তথাগত,
নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ দুলাল শচী-মাতার।
এবার দীনের বেশে আসিলে, নবভাব শিক্ষা দিলে,
(ব'লে) শুন ওরে অন্ধ জীব,
(তোমরা) কেন আর মিছে ভাব,
যে যেভাবে ভাব ভবে পাইবে চরণ তাঁর।
জীবের প্রত্যয় কারণ, কৈলে সর্ব্বধর্ম্ম সাধন,
কভু যীশু যীশু যীশু ব'লে,
কভু মুখে ঈশা ব'লে,
কভু চরণ দে মা দে মা ব'লে উথলে প্রেম পাথার,
তাইতে রামকৃষ্ণ পদারবিন্দ করিয়াছি ভবে সার,
মুখে রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ অনিবার।

উল্টাডাঙ্গা সেবকসমিতি—শ্রীপুলিনবিহারী নস্কর।

---

(৪)

কীর্ত্তন।

সুন্দর মন-রঞ্জন তুমি নন্দন-ফুল-সার।
তুমি রাম, তুমি কৃষ্ণ, তুমি রামকৃষ্ণ অবতার।
বল রে বদন ভোরে, ঐ নামে যে অমিয় ঝরে,
পাপী তাপী তরে, অবহেলা ভরে, যায় রে ভবের পার।
দলে দলে ফুল ফুটিছে,
আজি দলে দলে অলি যুটিছে,
প্রকৃতি সাজিছে, পাপিয়া ডাকিছে,
কেন গো এমন হইছে ?

কেন গো এদের উন্মাদ ভাব,
কেন গো এসুরে আজি আলাপ,
কেন গো পবন, আকুল মতন,
সুরভি মাখিয়া লুটিছে ?
এরা কি সকলে গাহিছে গান, এদের কি আজ বিভোর প্রাণ,
পুণ্য-বাসরে, পুণ্য-আসরে,
পুণ্য-মহিমা গাহিছে।
ঝরিছে দেখনা অমৃতধারা, পিয়ে নাম ভক্ত আকুলপারা,
গাও ভোরে প্রাণ, রামকৃষ্ণ নাম,
ঘুচিবে ভবের ভার ॥

ভক্ত—শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ভবকিঙ্কর।

—

(৫)

(রূপক)

এই কি ছিল মনে গুণমণি।
সাধে সাধি বাদ, হানিলে হে অশনি ॥
এলে তাপিতে নিতে কোলে,
দেখ দেখ হে অনলে—
হৃদয়-কমল জ্বলে দিবা-রজনী ॥

(ধামার)

হৃদয়-বিহারি, হৃদি শূন্য করি,
রয়েছ পাশরি, দীনে পরিহরি,
তাপিত চিত, প্রেম-বারি বিতরি,
রাখ রাখ হরি, মনাগুনে মরি ॥

(লোফা)

ওহে প্রেমাধার, হর দুঃখ ভার,
আমার ব্যথার ব্যথী কে আছে আর,
এস বস হে হৃদয়-আসনে আমার,
ভাসি নয়ন-জলে দেখ একবার ॥
(ওহে দীননাথ) (ওহে দয়াময়)

(একতালা)

হের করুণা-নয়নে, সন্তাপিত জনে,

রাখ তাপহারি এই দীনে, (

প্রেম-সুধাকণা বিতরণে,

(মেল্‌তা)

নিরাশায় তমোময় হেরি ধরণী ॥

সেবক—শ্রীঅমৃতলাল দত্ত (হাবু বাবু)।

সমালোচনা।

শ্রীরামকৃষ্ণনামামৃত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সুমধুর স্তুতিগাথা ও গীতাবলী। এরূপ সুমধুর প্রাণস্পর্শী প্রেমভক্তিভাব-উদ্দীপক গান অতি বিরল। গীতগুলি ঈশ্বর প্রেমিকের পরমতৃপ্তি ও আনন্দদায়ক, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। তদ্ভিন্ন ইহাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মনোহারী দুইখানি চিত্র আছে। মূল্য।০ চারি আনা মাত্র। ৫৪ নং ক্ষেত্র মিত্রের গলি, সালিখা পোঃ, হাওড়ায় প্রকাশকের নিকট পাওয়া যায়।

পুস্তক প্রাপ্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী। ইংরাজী পুস্তক। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থভাগ পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। আরও দুইটী ভাগে এই পুস্তক সম্পূর্ণ হইবে। এই পুস্তকে স্বামীজীর বক্তৃতাবলী, তাঁহার লিখিত সমস্ত প্রবন্ধাবলী, পত্রাবলী প্রভৃতি স্বামীজী যাহা কিছু লিখিয়াছেন, এমন কি বাঙ্গালা লেখাগুলিও ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ছাপা হইয়াছে। ইহা যে অমূল্য গ্রন্থ, সে বিষয় আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। স্বামিজীর সমগ্র গ্রন্থ একত্রে আর কোথাও পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ভাগের মূল্য ২৷৷০ টাকা, মায়াবতী, হিমালয়, প্রবুদ্ধ ভারত আফিস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

কনখল সেবাশ্রম রিপোর্ট। গত বৎসরের কার্য্যের বিবরণ এই পুস্তকে ছাপা হইয়াছে। সেবাশ্রমে যক্ষ্মারোগীর জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ আবশ্যক হওয়ায়, সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। যিনি যাহা প্রেরণ করিবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন। স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কনখল পোঃ, সাহারাণপুর জেলা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীচরণ ভরসা।

আশ্বিন, সন ১৩১৬ সাল।

ত্রয়োদশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা।

রামকৃষ্ণ-লীলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০২ পৃষ্ঠার পর)

এই ভ্রমণের পর কলিকাতায় আসিয়া তিনি একমাত্র দক্ষিণেশ্বরে আবদ্ধ থাকিতেন না, সময়ে সময়ে স্থানান্তরে গমন করিতেন। একদা আদি-ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়া তথায় কেশবচন্দ্র সেনকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই যুবকটীর ফত্না নড়িতেছে। এখানে মনের সহিত ফত্নার তুলনা হইয়াছে। সেই সময়ে কলুটোলায় একটী চৈতন্য-সভা ছিল, তথায় সভ্যেরা চৈতন্যদেবের আসন মধ্যস্থলে সংস্থাপনপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেন। পরমহংসদেব তথায় যাইয়া ভাবাবেশে সেই আসনে বসিয়াছিলেন। অনেকে প্রথমে এই ব্যাপার দেখিয়া অভিযোগ করিতে লাগিলেন, পরে তাঁহার মহাভাবের লক্ষণ সমস্ত দেখিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে সার্থক মনে করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বৈষ্ণবচরণ নামে এক মহা পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণী নাম্নী কোন অসামান্যা রমণী, তাঁহার এই মহাভাব দেখিয়া তাঁহাকে চৈতন্যের অবতার বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণি কালনায় ভগবানদাস বাবাজী জীবিত ছিলেন। তিনি কলুটোলার এই ব্যাপার শুনিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। পরে এক সময় মথুরবাবুর সহিত ঠাকুর কালনায় যাইয়া, তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হয়েন। তিনি তথায় যাইবা মাত্র ভগবানদাস বলিয়া উঠেন—'কোন্ মহাপুরুষ আমায় কৃতার্থ করিতে

আসিয়াছেন ?' পরমহংসদেব তথায় যাইয়া ভাবাবেশে বিভোর হইয়া পড়িলেন। তখন বাবাজী শুনিলেন, ইনিই তিনি, যিনি কলুটোলার সভায় আসনে বসিয়াছিলেন। পরে তিনি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বার বার তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক স্থলে তাঁহার মহাভাবের লক্ষণ অনেকে দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী কিম্বা মার্চমাসে তিনি প্রথম কেশববাবুকে দর্শন করিতে বেলঘরিয়ায় যান। তখন বেলা প্রায় নয়টা। কেশববাবুকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন—"তোমার নেজ খসিয়াছে"। কেশবের সহিত যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা এ কথায় হাসিয়া উঠিলেন। কেশববাবু বলিলেন, উনি কি বলেন, তোমরা শুন। পরমহংসদেব বলিলেন—যে পর্য্যন্ত বেঙ্গাচির নেজ্ থাকে, তাহারা জলে বাস করে, নেজ্ খসিলে তাহারা ডাঙ্গায় আসে। অর্থাৎ তোমার মন, সংসার হইতে চৈতন্যরাজ্যে দৃষ্টিপাত করিয়াছ, কিন্তু কামিনী কাঞ্চন রূপ কালভুজঙ্গ হইতে যতক্ষণ না নিস্কৃতি পাইতেছে, ততক্ষণ কোনও আশা ভরসা নাই। কেশববাবু তাঁহার দর্শনে বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, পরে তিনি মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবের নিকট যাইতেন। কেশববাবু একমাত্র পরমব্রহ্মের উপাসক ছিলেন, পরে প্রভুর নিকট যাইয়া তাঁহার ভাব কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। যাহার ফলে নববিধান নামক এক নব-প্রণালী সৃষ্টি হয়। নববিধানে প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ভাব সমস্ত একত্র সম্মিলিত করিয়া, সেই পরব্রহ্মের উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। খৃষ্টের প্রেম, চৈতন্যের ভক্তি, বুদ্ধের জ্ঞান সমস্ত মিলাইয়া এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। খৃষ্টের ন্যায় জীবন যাপন না করিলে, খৃষ্টের উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য প্রণালী না করিলে, সে প্রেম কোথা হইতে আসিবে ? এইরূপ প্রত্যেক ভাব সাধন করিলে তবে সে ভাব লাভ হইতে পারে। কেবল মুখের কথায় কি কোনও কার্য্য হয় ! যাহা হউক, তাঁহার ধর্ম্ম ভাব লইয়া যদিও কেশব বাবু কিছু বিকৃত অবস্থা করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তথাচ তাঁহার উপর তাঁহার যে শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, তাহা অতুলনীয়। পরমহংসদেবের পরম প্রিয় সেবকগণের নিকট শুনিয়াছি যে, কেশব বাবুকে তাঁহার প্রতি তাঁহারা যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সেরূপ কেহ করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। হিন্দুগণ দেবদেবী দর্শনে যাইবার সময় যেরূপ ফলমূলাদি লইয়া যান, সেইরূপ কেশববাবু কিছু না কিছু লইয়া তাঁহারা চরণপ্রান্তে রাখিতেন। ঠাকুর একদিন কেশববাবুকে কিছু উপদেশ দিতে

বলেন, তাহাতে কেশববাবু বলিয়াছিলেন যে, কামারের দোকানে কি ছুঁচ বেচা সাজে ?

রামকৃষ্ণদেব ধনী ব্যক্তিদিগকে একেবারেই গ্রাহ্য করিতেন না। কৃষ্ণদাস পাল ও অনেক রাজা বাহাদুরাদি তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মকথা প্রসঙ্গে নানারূপ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কেশববাবু যদিও রামকৃষ্ণের ভাব বিকৃত করিয়া ফেলিয়া ছিলেন, তত্রাচ প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, তাঁহার দ্বারাই রামকৃষ্ণদেব প্রথম প্রচারিত হয়েন। তিনি সেই সময়ে সংবাদ পত্রে তাঁহাকে সাধু বলিয়া এবং তাঁহার উপদেশাদি কিছু কিছু ছাপিতে লাগিলেন। তাহা দ্বারায় সাধারণে তাঁহাকে সেই সময়ে জানিতে সক্ষম হয়েন। ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় সাধুমহাত্মা প্রভুকে বিদিত ছিলেন। তদ্ভিন্ন আরও অনেকানেক লোক তাঁহাকে জানিতেন, কিন্তু ১৮৭৯ খৃঃ হইতে তাঁহার ভাবের প্রকৃত কার্য্য হইতে আরম্ভ হইল। এই সময়ে কয়েক ব্যক্তি সংসারের বিভীষিকায় বিরত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করেন। ভগবান আছেন কি না, ইহাই জানিতে যাওয়া তাঁহাদের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা যাইয়া যখন তাঁহার ঘরে ঢুকিলেন, তিনি যেন কত পরিচিতের ন্যায় আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিবার পূর্ব্বেই, প্রভু তাঁহাদের উত্তর বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, ভগবানকে চায় কে ? বিষয় হইল না বলিয়া লোকে দশ ঘটী কাঁদিবে, পুত্র হইল না বলিয়া পাঁচ ঘটী কাঁদিবে, অর্থ হইল না বলিয়া দশ ঘটী কাঁদিবে, কিন্তু ভগবান তুমি কেমন, তোমাকে কিসে পাইব, ইহা বলিয়া কি কেহ এক ফোঁটা চখের জল ফেলে ? যে ফেলে, যে তাঁহার জন্য কাঁদিতে পারে, সেই তাঁহাকে পায়। তাঁহারা এই কথা শুনিয়া পরম পুলকিত হইলেন। গৃহে ফিরিবার সময় দেখেন যে, ভগবানের জন্য তাঁহাদের অন্তরে যে স্থান শূন্য ছিল, তথায় রামকৃষ্ণদেব উপবেশন করিয়াছেন। সর্ব্বনাশ ! তাঁহারা গৃহে আসিয়া এই সমস্ত বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন, এ তাঁহাদের কি হইল, বলিয়া আক্ষেপ হইতে লাগিল। বন্ধুবান্ধবদিগের নিকটেও তাহা দুর্ব্বলতা জ্ঞানে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেভাব হৃদয় হইতে দূর হওয়া অপেক্ষা আরও বদ্ধমূল হইয়া যাইতে লাগিল। যে সমস্ত লোক তাহা শুনিতেন, তাঁহারাও অবশেষে রামকৃষ্ণ দর্শনে গিয়া, তাঁহাদের পথের পথিক হইয়া পড়িলেন। এইরূপ তাঁহার প্রায় শতাধিক ভক্ত হইয়া দাঁড়াইল।

পরমহংসদেব গুরুগিরি একবারে ভালবাসিতেন না। তাঁহাকে গুরু বলিলে

তিনি বিরক্ত হইতেন। কেহ সাধুজ্ঞানে প্রণাম করিলে, অথবা পদধূলি লইতে অগ্রসর হইলে, তিনি অগ্রে প্রণাম করিয়া বসিতেন। তবে যাহারা আপন মনের টানে, তাঁহার প্রতি পারলৌকিক শুভাশুভ নির্ভর করিত, তিনি তাহাদের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইতেন। কেহ তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র লইবার ইচ্ছা করিলে, তিনি তাহাকে কুলগুরুর নিকট হইতে দীক্ষিত হইতে বলিতেন। যদ্যপি কেহ তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিতেন, তাহা হইলে তিনি বলিতেন—

আমার গুরু যদি শুঁড়ী বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

যাহারা একান্তই ছাড়িতেন না, তাহাদিগকে কালীর ইচ্ছা যাহা তাহাই হইবে, এই বলিয়া নিরস্ত করিতেন। যাহারা জপ তপ সাধন ভজন করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে তিনি বকলমা দিতে বলিতেন। কাহারও জন্য তিনি নিজে দায়ী হইতেন। কাহাকেও পরিত্রাণ করিলাম বলিয়া অভয় দিয়াছেন। তিনি যাহার যেরূপ ভাব ও ধারণা, তাহাকে তদ্রূপেই গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে পাপী সাধুর ভেদাভেদ ছিল না। যত নাস্তিক, পাষণ্ড, দুরাচার, পতিতগণই তাঁহার ভালবাসার বস্তু ও কৃপাপাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

সাধারণ সাধুদিগের নিকট একটী ধারাবাহিক নিয়ম আছে, তাঁহাদের নিকট সেই ভাবে পরিচালিত হইতে হয়। তাঁহার নিকট তাহা ছিল না। যে ব্যক্তি যে ভাবে আপনাকে গঠন করিতে চাহিয়াছে, তিনি তাহাকে সেই ভাবেই গড়িয়া দিয়াছেন। অনেককে তিনি প্রকারান্তরে সন্ন্যাসী করিয়াছিলেন, আবার অনেকে সন্ন্যাসী হইবার জন্য ইচ্ছা করিলে, তিনি বলিতেন, সংসার ছাড়িয়া যাইবে কোথায়? সংসারের সহিত কেল্লার তুলনা দেওয়া হয়, কেল্লার মধ্যে থাকিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা সহজ, কারণ তথায় রসদ ও গোলাগুলি অধিক পরিমাণে জমা করা থাকে। মাঠে যাইয়া যুদ্ধ করা তেমন নহে, তাহা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চলিতে পারে না। এইরূপে সংসারে সংসারের কার্য্য চারি আনা মনে করিয়া, অবশিষ্ট বার আনা মনে ঈশ্বর সাধনা করিতে হয়। তাহা না হইলে শেষে 'এক কৌপীনকা আস্তের' ন্যায় হইতে হয়। তৎযথা—একজন সাধু এক বৃক্ষমূলে বাস করিতেন। তাহার কৌপীন বৃক্ষশাখায় থাকিত, ক্রমে মূষিকে সন্ধান পাইয়া কাটিতে লাগিল। তিনি ঐ মূষিক দমন করার উদ্দেশ্যে একটী বিড়াল আনিয়া, তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বিড়াল দুগ্ধ ভিন্ন বাঁচে না দেখিয়া, তিনি পাঁচজনের পরামর্শে একটী গাভী প্রতিপালন আরম্ভ

করিলেন। তাহাতে তাঁহার এবং বিড়ালের দুগ্ধ সংস্থান হইতে লাগিল। এই গাভীর যখন ২।৩টী বৎস হইল, তখন কয়েকজন পরামর্শ দিল, আপনি চাষের ব্যবস্থা করিয়া ঐ ষাঁড়গুলিকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখুন। সাধু এইরূপে চাষবাস করিয়া ঘোর সংসারীর অবস্থায় উপনীত হইলেন। তাঁহার ষোলআনা মনই সংসারের কাজে চলিয়া গেল।

পরমহংসদেবের অনেকগুলি স্ত্রীলোক ভক্ত ছিল। তাহাদের জীবন ও চরিত্র অদ্ভুত; তাহা অল্প কথায় বলিতে চেষ্টা পাওয়া বিড়ম্বনা।

এইরূপে তাঁহার একটী সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল। সম্প্রদায় বলিতে ঠিক যাহা বুঝায়, তাহার মধ্যে যদিও ঠিক সেইভাব নহে, তত্রাচ তাহারা মিলিয়া প্রভুকে লইয়া পরম আনন্দে দিনাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা সকলে মিলিয়া ঠাকুরের জন্মোৎসব আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া পরম আনন্দ করিতেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে, তাঁহার ভাবাবেশ হইয়া যাইত। তখন ভক্তেরা তাঁহাকে চন্দনাদি ও পুষ্পমালা দিয়া সজ্জিত করিয়া দিতেন। ভাব অবসান হইলে তিনি গলার মালা, কপালের চন্দনাদি মুছিয়া ফেলিতেন, কিন্তু চরণের চন্দন মুছিতে পারিতেন না। ভগবান ভক্তাধীন, চরণে তাঁহার অধিকার কি? এই উৎসবের পর ভক্তেরা তথায় প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। তিনি জাতি নির্ব্বিশেষে বিভাগ করিয়া সকলকে আহার করাইতেন। এইরূপে তিনি কিছুকাল ভক্তদিগকে লইয়া পরম আনন্দে দিনাতিবাহিত করিলেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, একদিন অপরাহ্ণে কয়েকজন শিষ্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—"দেখ, আমি মাকে বলিতেছিলাম যে, মা! এদের একটু শক্তি দে, এরা উপদেশ দিয়া তৈয়ারী করিবে, আমি একবার স্পর্শ করিয়া দিব।" তখন তাঁহার এ কথার মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারিল না। ইহার কিছুদিন পরে তিনি গলদেশে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। বেদনা বৃদ্ধি হইলে, ক্রমে অন্নাদি ভোজন বন্ধ হইয়া গেল। সুজি ও দুগ্ধাদি তরল দ্রব্য ভোজন করিতেন। ক্রমে ঐ স্ফোটক বর্হিদেশে ফোঁড়ার ন্যায় হইয়া উঠিল। কত ডাক্তার, কবিরাজ, তাহা আরোগ্য করিতে চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহার ব্যারাম সারাইবার জন্য তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে কলিকাতা শ্যামপুকুর নামক স্থলে আনিয়া রাখেন। তাঁহাকে ব্যারাম সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতেন, এ দেহ একটা

কাগজের খাঁচা, তাহাতে একটা ছিদ্র হইয়াছে, তাহার জন্য চিন্তা কি ? কখন বলিতেন—দেহ জানে, দুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক। এই শ্যামপুকুরে কালীপূজার রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা হয়।

তিনি কোনও ভক্তের নিকট ঐ দিন প্রাতে প্রকাশ করেন যে, অদ্য একটী বিশেষ দিন। তিনি অপরাপর ভক্তগণের নিকট উহা বলিলে, শ্যামপুকুরস্থিত বীরভক্ত শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ শ্যামাপূজার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রায় আটটা, তখন সকলে দেখিলেন যে, সকলই আনা হইয়াছে, কিন্তু প্রতিমা সংগৃহীত হয় নাই। তখন রামকৃষ্ণের সম্মুখেই সকল দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখা হইল। ভক্ত শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় রামবাবুর উদ্দীপনায় ফুলচন্দন বিল্বপত্রাদি লইয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে সকলেই একে একে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া অঞ্জলি দিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ ভাবাবেশে বরাভয়করে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। সকলে 'জয় রামকৃষ্ণ' রবে হাততালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুকাল এইরূপ চলিলে, প্রভুর ভাব উপশমিত দেখিয়া, রামবাবু সুজি, লুচি ইত্যাদি তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। রামকৃষ্ণ একে একে সকলই আহার করিলেন। তাঁহার পীড়ার পর তিনি সুজি ভিন্ন আর কিছুই খাইতে পারিতেন না, কিন্তু এইক্ষণ আর সেই ভাব কিছুই দেখা গেল না। এই দিনের ঘটনা স্মরণ করিয়া, ভক্ত বিভোর প্রাণে গাহিয়াছেন—

দেখি মা তোর রূপের ছবি, (ওমা) এমন রূপ ত আর দেখিনি।
ভয়ঙ্করা, রুধিরধারা, নয় অসিধরা ত্রিনয়নী। (আমার মা)
রণবেশে ডরে ছেলে, সে সাজ কি তাই লুকাইলে,
সন্তানে অভয় দিলে, ওমা বরাভয়-প্রদায়িনি !
কি দোষে ভোলারে ভুলে, (ওমা) রাখনি আজ পদতলে,
শিবকে ফেলে বুঝি শিবে, (আজ) দিলে আমায় চরণ দু'খানি॥

এইখানে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য কলিকাতার জন-সাধারণের সমাগম হইত। একদা কোনও সাধুপুরুষ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আপনি এত সোজা হইয়াই লোকের পক্ষে বড় পেঁচ হইয়াছে। লোকে কত কষ্ট, কত পরিশ্রম, কত অর্থব্যয় করিয়া, দেশে দেশে ঘুরিয়া সাধুদর্শন করিয়া বেড়ায় ; কাহার নিকট এক আনা, কোথাও দুই আনা , কোথাও বড় জোর চারি আনা

দেখিয়া আসিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে; কিন্তু এখানে বিকালে পান চিবাইতে চিবাইতে বেড়াইতে আসিয়া ষোল আনা দেখিয়া যায়, সুতরাং তাহারা আপনাকে ধারণা করিতে পারে না।

শ্যামপুকুরে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া, তিনি কাশীপুর অঞ্চলে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চিকিৎসা রীতিমত চলিতে লাগিল। দুই দিন ভাল থাকেন, আবার বাড়িয়া উঠে। একদা শশধর তর্কচূড়ামণি বলিলেন, সমাধির সময় ঐ স্থানে একটু মনোনিবেশ করিলেই, উহা সারিয়া যায়। তিনি বলিলেন, সমাধি করিয়া রোগ আরাম করিতে হইবে? এ অতি রহস্যের কথা!

ক্রমে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী আসিল। সেই দিবস তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছিলেন। ঐ তারিখে ছুটী থাকায় অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। তিনি অপরাহ্নকালে সকলের নিকটে আসিয়া বলিলেন, আমি আর তোমাদের কি বলিব, তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক। এই বলিয়া তাঁহার ভাবাবেশ হইয়া গেল। ভক্তেরা পুষ্পচয়নপূর্ব্বক 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া তাঁহার চরণে দিতে লাগিলেন। একটু ভাবাবসান হইলে, তিনি উপস্থিত মণ্ডলীর বক্ষে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন, কেহ হাসিতে লাগিলেন, কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ নাচিতে লাগিলেন, সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! হায়! তৎপরে আর তাঁহাকে সেরূপ আনন্দ করিতে দেখা যায় নাই। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার সন্ন্যাসী সেবকগণ প্রাণপণে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। গৃহীরাও সযত্নসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তত্রাচ কেহ গেলে উপদেশ দানে বা ঈশ্বর প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র কাতর ছিলেন না। তিনি মহাপুরুষ, তাঁহার এ ভোগ কেন? জীবের পাপের ভোগ তিনি ভুগিলেন। শত শত নাস্তিক পাষণ্ড যে তাঁহার উপর পাপের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইল, তাহাদের ভোগ তিনিই গ্রহণ করিলেন। ইহা তিনি শ্রীমুখেও কয়েকবার বলিয়াছেন।

সন ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, রবিবার, প্রাতেঃ তিনি ভক্তদিগকে ডাকিয়া পঞ্জিকা দেখিতে বলিলেন। সেই দিনকার সকল বিবরণ শুনিয়া যেই ১লা ভাদ্র কহিলেন, তিনি বন্ধ করিতে বলিলেন। সেই দিন তিনি কেমন এক রকম হইয়া উঠিয়াছিলেন। অপরাহ্নে ডাক্তার নবীন পাল আসিলে হাত দেখাইলেন। নাড়ী দেখিয়া তাঁহারি চক্ষু স্থির হইল। রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, উপায় কি? ডাক্তার আর কথা কহিলেন না। তৎপরে তিনি কোন ভক্তকে

ডাকিয়া বলিলেন, এতদিন বাদে এবা বলে কি? অতঃপর কহিলেন, দেখ আমার, হাঁড়ি হাঁড়ি দাল ভাত খাইতে ইচ্ছা করিতেছে। সেইদিন রাত্রি ১টার সময় উঠিয়া সুজি ভক্ষণ করিলেন। পরে কোন সেবককে ডাকিয়া কহিলেন, ইহাকে 'শ্বাস' বলে। সেই ভক্ত মনে মনে কহিলেন, এই সময়ে যদি ইনিই তিনি, একথা বলিতে পারেন, তবে বুঝি যে সব ঠিক। অমনি তিনি বলিলেন, যে রামচন্দ্র ধনু ধরিয়া রাবণকে বধ করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সখা হইয়াছিলেন, সেই ইদানী ইহার মধ্যে রামকৃষ্ণরূপে রহিয়াছে। পরে ১টা ৬ মিনিটের সময় তাঁহার সমাধি হইয়া গেল। সকলেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ সহরে তাঁহার ভক্তদিগকে সমাচার প্রদান করা হইল। ১লা ভাদ্রের প্রাতঃ সমীরণ রামকৃষ্ণের লীলাবসান ঘরে ঘরে প্রচার করিয়া দিল। সকলে যে কি মর্ম্মান্তিক বেদনায় অস্থির হইলেন, তাহা ব্যক্ত করিতে কে সক্ষম।

অপরাহ্ণ ৫টার সময় তাঁহার দেহ পুষ্পচন্দনাদির দ্বারায় সুসজ্জিত করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে কাশীপুরের ঘাটে আনিয়া দাহ করা হইল। তাঁহার দেহাবশেষ অস্থিপুঞ্জ একটী তাম্র পাত্র করিয়া আনিয়া কাশীপুরে রাখিয়া ভক্তেরা তাঁহার দৈনিক পূজা করিতে লাগিলেন। পরে ৮ই ভাদ্র, জন্মাষ্টমীর দিন, তাহা কাঁকুড়গাছীর যোগোদ্যানে সকল ভক্ত একত্রিত হইয়া সমাধি প্রদানে তথায় মহোৎসবাদি করিয়াছিলেন। এইক্ষণ তথায় সেবকমণ্ডলী তাঁহার সেবায় নিযুক্ত আছেন। বর্ষে বর্ষে তথায় এই সময়ে উৎসব হইয়া থাকে। আগামী মঙ্গলবার জন্মাষ্টমীর দিন তথায় সেই উৎসব হইবে। আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তথায় সেই দীনবন্ধু পতিতপাবনের শ্রীমন্দির ও উৎসব দর্শন করিতে যাইবেন, ও প্রসাদ ধারণ করিবেন, অদ্য এই প্রার্থনা।

মাতৃ আগমনে।

আজ সহসা কেন এরূপ পরিবর্ত্তন হইল! কাল যাহাদিগকে মলিনবেশে দেখিয়াছি, যাহাদিগকে লজ্জাভয়ে মেঘাবরণে বদন আবৃত করিয়া অবস্থান করিতে দেখিয়াছি, যাহাদিগকে দীঘি সরোবরে নয়ন মুদিয়া নিদ্রা যাইতে দেখিয়াছি, যাহাদিগকে চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইয়া হাবু ডুবু করিতে দেখিয়াছি, আজ আবার তাহাদের এরূপ দেখি কেন? কোথায় গেল তাহাদের সে সব ভাব? বিদ্যুচ্চকিতের ন্যায় নিমেষের মধ্যে কেন এরূপ পরিবর্ত্তিত হইল?

ইহাদের বর্ত্তমান ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, ইহারা যেন কাহার অভ্যর্থনার জন্য পুরাতন মলিন বেশ সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন বেশ নূতন ভূষণ পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে।

কাল যে সেফালীবৃক্ষ, যে স্থলপদ্মতরু মলিন বেশে উদ্যানের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, আজ তাহারা নূতন পাতায় নূতন ফুলে সুশোভিত হইয়া সুন্দর বেশ ধারণ করিয়া মানবহৃদয়ে মহা আনন্দের তরঙ্গ উৎপন্ন করিতেছে। কাল যে শশধর জলদজাল সমাবৃত হইয়া গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, আজ সে, মেঘমুক্ত নীলাকাশের এক কোণে উপবেশন করিয়া স্মিতমুখে জগৎবাসী সকলকেই হাসাইতেছে। কাল যে তারকামণ্ডলী মেঘাবগুণ্ঠনাবৃত হইয়াছিল, আজ তাহারা সে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া মন্ত্রমুগ্ধিতের ন্যায় পৃথিবীর দিকে এক ভাবে তাকাইয়া ধরাবাসী প্রাণীগণকে যেন কি এক অভিনবভাব জ্ঞাপন করিতেছে। কল্য যে পদ্মিনীমোহন ক্ষীণ তেজবিশিষ্ট হইয়া ম্লানবেশে অম্বরপথে বিচরণ করিতেছিল, আজ সে নূতন তেজে তেজীয়ান হইয়া ধরার সৌন্দর্য্য বিধানে একাগ্রচিত্ত হইয়াছে। কল্য সরসী গর্ভে, যে সূর্য্যপত্নীগণ নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল, আজ তাহারা নয়ন উন্মীলন করিয়া সরোবরকে হাসাইতেছে এবং জগতের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে। কল্য যে ছায়াপথ গগনের কোন অজ্ঞাত স্থানে লুক্কায়িত ছিল, আজ সে লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া ধরাবাসীকে কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ দান করিতেছে এবং বলিতেছে যে, আমারই বক্ষের উপর দিয়া মা আসিবেন, তাই আমি পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। কল্য যে সমীরণ সকলের নিকটে অগ্নিতাপের ন্যায় অনুভব হইতেছিল, আজ সেই প্রভঞ্জনের মৃদু স্নিগ্ধ হিল্লোলে মর্ত্ত্যবাসী প্রাণীকুলের চিত্তে যেন কি এক অননুভূত আনন্দের উদয় হইতেছে। কাল যাহারা ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হইয়া হাহাকার করিতেছিল, আজ তাহারা প্রকৃতি-দেবীর আনন্দ জনিত হাস্যচ্ছটা পরিদর্শন করিয়া ত্রিতাপজ্বালা বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতির হাসির সঙ্গে হাসি মিশাইয়া আনন্দে মাতিতেছে।

মা আসিতেছেন, মায়ের আগমনের সময় অতি সন্নিকটস্থ হইয়াছে, তাই প্রকৃতি দেবী, মহাপ্রকৃতি মায়ের পার্থিব রাজ্যের সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধনের জন্য, তাঁহার চিত্ত প্রফুল্লিত করিবার জন্য, পক্ষান্তরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার আশায়, যেন তাড়াতাড়ি চীর সাজসজ্জা পরিহার করিয়া, নূতন সজ্জায় সজ্জিত হইতেছেন। আমরা যাহাদের অচৈতন্য পদার্থ বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকি,

আজ সেই জড়পদার্থেরা প্রকৃতির শাসনে শাসিত হইয়া দেখ, মায়ের পূজার জন্য কত উদ্যোগ, কত আয়োজন করিতেছে।

ঐ দেখ, উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা অবলোকন করি..। যেন বোধ হইতেছে যে, মায়ের মস্তকোপরি সুবিস্তৃত নীল চন্দ্রাতপতললগ্ন ঝালর সমূহ ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। চন্দ্র সূর্য্যকে দেখিয়া যেন তন্দ্রাতপতলাবস্থিত দোদুল্যমান দিব্য দুইটী আলোকাধার বলিয়া অনুমিত হইতেছে। শারদীয় মলয়, কুসুম-সৌরভ আহরিয়া আনিয়া মায়ের বিধিবিষ্ণুপূজিতপদপ্রান্তে ঢালিয়া দিবার জন্য যেন মৃদুমন্দ ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। বায়ু-বিকম্পিত শ্যামলাম্বর দেখিয়া জ্ঞান হইতেছে যে, প্রকৃতি-সুন্দরী যেন বাহুদ্বারা রাজরাজেশ্বরী মাকে স্বর্গরাজ্য হইতে এ ধরাধামে আসিবার জন্য আবাহন করিতেছেন। নদীসমূহের ধীর প্রবাহ দেখিয়া অনুভব হইতেছে যে, দ্রুতবেগে গিয়া চরণ স্পর্শ করিলে মায়ের ত্রিলোকসেবিতপদে আঘাত লাগিতে পারে, তাই তাহারা মন্দাকিনী-জলবিধৌত মাতৃপদ ধৌত করিবার জন্য যেন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। দীর্ঘিকা, সরোবরসমূহ পদ্ম-নেত্র বিকশিত করিয়া নিরুপমা মায়ের অপরূপরূপ দর্শন করিবার জন্য যেন প্রতীক্ষা করিতেছে। ঝিল্লিক-গণের একপ্রাণে একতানে স্তব করিতে দেখিয়া মনে হইতেছে যে, প্রকৃতি দেবী স্বীয় দোষ অপনোদনের জন্য যেন, বিশ্ববিধাত্রী মায়ের নিকটে ক্ষমা চাহিতেছে। মেঘমণ্ডলের গুড় গুড় শব্দ শ্রবণ করিয়া বোধ হইতেছে যে, কাদম্বিনী যেন আমাদের মায়ের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। এইরূপ যাহার দিকে চাহিতেছি, তাহাকেই বিশ্বেশ্বরীর কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতেছি, তাহাকেই প্রফুল্লিত দেখিতেছি।

আনন্দময়ী মায়ের শুভাগমনে, আজ ত্রিজগৎবাসী সকলেই আনন্দিত, সকলেই প্রফুল্লিত। ত্রিজগৎপ্রসবিনী মায়ের অর্চ্চনার জন্য আজ সকলেই উৎসাহিত, সকলেই লালায়িত। কিন্তু কৈ, তুমি আমি ত মায়ের পূজার জন্য কোন উদ্যোগ, কোন আয়োজনই করিতেছি না। তুমি আমি না জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী! তুমি আমি না সংসারের সকলের কাছেই জ্ঞানের গর্ব্ব করিয়া থাকি! এই কি ভাই! তোমার জ্ঞানের পরিচয়? এই কি ভাই! মায়ের সন্তানের পরিচয়? যাহারা মায়ের প্রকৃত সন্তান, দেখ, তাহারা মায়ের আগমনে কতদূর পুলকিত হইয়াছে। কিন্তু কৈ, তুমি আমিত এ শুভ মুহূর্ত্তে পুলকপূর্ণ হৃদয়ে মায়ের পূজা করিবার জন্য লালায়িত হইতেছি না।

অহো! আমাদের হৃদয় কি কঠিন! কি মস্মর নির্ম্মিত! আজ এই শুভদিনে দেখ জড়পদার্থ পর্য্যন্তও মায়ের মহিমায় সচৈতন্য হইয়া উঠিতেছে, আর আমাদের এই যে, চির-অসাড়, সংসার-ভাবনা-রৌদ্র বিশুষ্ক বক্ষস্থল, সে আজ, ত্রিতাপহারিণী মায়ের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়াও পুলক-স্পন্দিত হইতেছে না, বা অসত্য, অনিত্য পদার্থ দর্শনরত নয়নতটে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতেছে না। এইরূপ অবস্থা দেখিয়াই বোধ হয় মাতৃভক্ত সাধক গাহিয়া ছিলেন—

"সদা মা মা ব'লে ডাকিবে।
পরতে পরতে হৃদয়ের সাথে মার নাম গেঁথে রাখিরে।
ফুল্ল কুসুম সুবাস হরিয়া, যে পদে মলয়া দিতেছে ঢালিয়া,
পিককুল কানে ঢালিছে অমিয়া—
যে নাম সদা গাহিরে—
কিসের লাগিয়া এ দেহ ধরিয়া
সে নাম ভুলিয়া থাকিবে।
গগনে চন্দ্র ধরিছে দেউটী,
ঝিল্লিকা ঝিঝিট স্তবে পরিপাটী,
পরিয়া প্রকৃতি শ্যামল সাটী
সদা যে পদ লাগিরে—
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত, হরি-আরাধিত,
কেন সে পদে ম'জে না থাকিরে।
মার নামে কঠিন পাষাণ গ'লে যায়,
মরুমাঝে উৎস প্রবাহিত হয়,
কি মহিমা মার নামেরে—
কি জানি কি দিয়া গঠিত এ হিয়া,
তাই মা নামে ঝরেনা আঁখিরে।"

সত্য কথা, দেখ, মাতৃনামে কঠিন পাষাণ বিগলিত হয়, মরুভূমে উৎস প্রবাহিত হয়, শুষ্কতরু পল্লবিত হয়, আর তোমার আমার হৃদয় পাষাণ হইতেও কঠিন, মরুক্ষেত্র হইতেও শুষ্ক, তাই, এই মাতৃ-আগমনে মায়ের চরণ যুগল দর্শন করিবার জন্ম আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তির উৎস উচ্ছ্বসিত হইতেছে না।

ভাই! তুমি আমি ঘোর অবিদ্যান্ধকারে নিপতিত, তাই মায়ের মহিম

আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। দেখ, পুত্রগণ বারমাস বিদেশে প্রবাস করিয়া অবসর মত জননীর চরণযুগল দর্শন করিবার আশায় স্বীয়বাসে আগমন করে। আর আমাদের দয়াময়ী দয়া করিয়া নিজেই চির-প্রবাসী পুত্র আমরা, আমাদের দেখা দিতে আসেন। কথাটা ঠিক হইল না, তিনি আমাদের দেখা দিতে আসেন না, দেখিতে আসেন। আমাদের মধ্যে কত জনের বা মায়ের কথা স্মরণ আছে, আর কতজনের বা হৃদয় হইতে মায়ের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাই মা দে[illegible], তাঁহার চিরসাধের অমরধাম পরিহার করিয়া, এ মরধামে আগমন করেন। মায়ের নাম স্মরণে আমাদের মুক্তি, বিস্মরণে বন্ধন, তাই মা, আমাদের তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া, এ ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য, ভূতভাবনকে ভাবনার সাগরে নিমগ্ন করিয়া আমাদিগকে তিনদিনের তরে দেখা দিবার জন্য, এ মর্ত্ত্যভূমে আগমন করেন। এমন দয়া, মা না হইলে কি অন্যেতে সম্ভবে?

তাই বলি ভাই! এ শুভ মুহূর্ত্ত ত্যাগ করিও না। যাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ধ্যাননিমগ্ন হইয়া কত যুগযুগান্তর অতিবাহিত করিতেছেন, যাঁহার দর্শন লালসায় মুনিঋষিগণ সংসারের সকল আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নয়ন মুদিয়া অনন্তকাল ক্ষেপণ করিতেছেন, তিনি আজ দয়া করিয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত; হে মানব! তুমি সংসারের মোহে ভুলিয়া তাঁহাকে অনাদর করিওনা, তুমি এই শুভ অবসরে ভক্তিভরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মাদি দেবতারাধিত মাকে তারস্বরে আহ্বান কর—

"আগচ্ছ বরদে দেবি চণ্ডিকে সর্ব্বমঙ্গলে।
দুঃখ হন্ত্রি মহাদেবি দেহিমে বরমুত্তমং॥"

আর ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার সুরাসুর-মুকুটতট-বিঘৃষ্ট চরণাম্বুজে—মস্তক স্থাপন করিয়া বল—

"ব্রহ্মাদি মাতরং দেবীং ঈশ্বরীমীশ্বর প্রিয়াং।
প্রণতোঽস্মি সদা দুর্গাং সংসারার্ণবতারিণীং॥
সর্ব্বরূপময়ী দেবী সর্ব্বং দেবীময়ঃ জগৎ।
অতোঽহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীং॥"

শ্রীকান্তিবর ভট্টাচার্য্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ-গোষ্ঠ-গীতি।

পাঠ সমাপণে ছুটী পেলে শিশুগণে।
সকলে মিলিল তবে গদাধর সনে॥
(তারে সকলে যে ভালবাসে)
পুঁথিপত্র পাঠযোত্র ফেলি নিজ ঘরে।
আনন্দে মিলিল সবে খেলিবার তরে॥
খুদিরাম-গৃহ কাছে আছে এক মাঠ।
তথায় খেলন-মেলা আনন্দের হাট॥
(সবে আনন্দে খেলা করে—আনন্দময়ে লয়ে)
হাডু-ডুডু দৌড়াদৌড়ি খেলিছে গদাই।
সঙ্গীগণে রঙ্গী সবে সুখ সীমা নাই॥
বাঁধি আঁখি কভু সেথা সাজে কেহ 'চোর'।
'বুড়ি' সাজি বসি হাসে গদাধর মোর॥
পরশি গদাই অঙ্গ 'চোর' নহে আর।
খেলাছলে মুক্তিদান করে কর্ণধার॥
কখন মিলিয়া তথা রাখালের ছেলে।
ব্রজখেলা গোষ্ঠলীলা কৃষ্ণভাবে খেলে॥
শ্রীদাম সুদাম কেহ, কেহ বলা (১) ভাই।
আপনি সে গদাধর, প্রাণের কানাই॥
দাম বসুদাম কেহ সুবল সাজিল।
গদাধর-চিতে কিবা ভাব উপজিল॥
(বুঝি পূরব পড়ল মনে)
আবা দিয়ে বনে বনে গোধন ফিরায়।
ধেনু-বৎস কোলে তুলি কভু গীত গায়॥
'ভাইরে কানাই' বলি কেহ বা ফুকারে।
ভুতিখালে(২) খেলে যেন যমুনা বিহরে॥
কালিয় দমন কভু নাশে বা অসুর।

(১) বলরাম।
(২) ভুতির খাল, রামকৃষ্ণের বাটীর সন্নিকটে।

খেলিতে খেলিতে কিবা আনন্দ প্রচুর ॥
গদাধরে মাঝে লয়ে কভু সবে নাচে।
সঙ্গে সঙ্গে ফেরে দাস কাঁটা-খোঁচা বাছে ॥
(রাঙ্গাচরণে বাজে বা পাছে)

গুরু ও শিষ্য।

জগন্ময় জগদীশ্বরের এ বিশ্বসংসারে সকলেই কিছু না কিছু জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া জন্ম-পরিগ্রহ করে বটে, কিন্তু গুরু ব্যতীত তাহার বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি হয় না। গুরুদেব আমাদের ধর্ম্মপথের একমাত্র সহায়, পথপ্রদর্শক; তাঁহার সুশিক্ষায় আমাদের ধর্ম্মজীবন সংগঠিত হয়, তাঁহার সঞ্জীবনী সুধা মন্ত্রে আমাদের অজ্ঞান জড়বৎ জীবন উজ্জীবিত হইয়া উঠে, অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইয়া আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের দীপ্তি প্রতিভাত হয়।

যাহার গুরুকরণ হয় নাই, যিনি পবিত্র গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হ'ন নাই, তাহার জীবন বৃথা; তাহার জীবন অজ্ঞান-সমাচ্ছন্ন পশুজীবন সদৃশ। ভারবাহী পশু যেমন স্বীয় পৃষ্ঠস্থাপিত বোঝার মর্ম্ম বুঝে না, তিনিও সেইরূপ শুধু পূতিগন্ধময় জীবন ভার বহন করেন মাত্র, কিন্তু দুর্লভ মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বুঝেন না।

আর যাঁহারা গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, যাঁহাদের গুরুকরণ হইয়াছে, তাঁহাদেরও প্রকৃত গুরুর অভাবে, আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টার বৈগুণ্যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির যথোপযুক্ত মার্জ্জিত, সংশোধিত ও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না। গুরুদেবের ধর্ম্মোপদেশ বারির সিঞ্চন অভাবে তাঁহাদের জ্ঞান-তরু ভালরূপ পল্লবিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

পুরাকালে গুরুদেব প্রেমশান্তি সুধাবারিবর্ষণে মানবের নীরস হৃদয় সরস করিতেন, জ্ঞানহলকর্ষণে জীবের মনমাটি পরিপাটি করিয়া পরমতত্ত্ব জ্ঞানের বীজবপন করিতেন। আর বর্ত্তমান যুগের গুরুদেব—কেবল নামে গুরুদেব। তিনি শিষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে পরমার্থ বীজবপন করিবেন কি, তিনি যে স্বয়ংই অহর্নিশি সংসারচক্রে ঘূর্ণমান, বিষয় ভোগ লালসায় ঘোর সমাসক্ত, প্রলোভনের প্রলোভনী-শক্তির আকর্ষণে বিকলচিত্ত, স্খলিতপদ।

পুরাকালে গুরুদেব, শিষ্য আধ্যাত্মিক-পথে কতদূর অগ্রসর হইল না

হইল, তাঁহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ও লক্ষ্যপাত করিতেন, কিন্তু আজকাল আমাদের গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ঠিক রাজা প্রজার সম্বন্ধের ন্যায়। রাজা যেমন প্রজার নিকট হইতে করগ্রহণ করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ দায়িত্বপরিশূন্য বোধ করেন, প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের, ন্যায়ান্যায়ের প্রতি বড় একটা মনঃসংযোগ করেন না, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট গুরুদেবও সেইরূপ শিষ্যের নিকট হইতে গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করিয়াই নিরস্ত, সন্তুষ্ট। শিষ্যের ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করেন না।

শিষ্য যদি দরিদ্র, অবস্থাহীন হয়, তাহা হইলে গুরুদেব অমনি তাহাকে নানারূপ প্রবৃত্তির ইন্ধন দ্বারা যাহাতে তাহার প্রাণে অর্থোপার্জ্জনের লিপ্সা বলবতী হয়, যাহাতে তাহার হৃদয়ে বিষয়বাসনাবহ্নি উদ্দীপিত হইয়া উঠে, তাহারই বিশেষ চেষ্টা করেন। আর সেকালের গুরুদেব, শিষ্য যাহাতে বিষয়চিন্তা হইতে বিমুক্ত পারেন, যাহাতে অধিকাংশ সময় ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে পারেন, সেইরূপ ভাবে তাঁহাদের মন, তাঁহাদের হৃদয় সংগঠিত করিতেন, তাঁহারা শিষ্যকে সেইরূপই উপদেশ দিতেন। শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন,——Think less of worldly enjoyment and more of spiritual enjoyment যিশুখৃষ্টও তাঁহার শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন——Take no thought, saying, what shall we eat ? or what shall we drink ? or where withal shall we be clothed ? for your Heavenly Father knoweth that ye have need of all these things But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness, and all these things shall be added unto you"

শিষ্য ধনী বা সঙ্গতিসম্পন্ন হইলে ত কথাই নাই, গুরুদেব তখন তাঁহার কুটিল বিষয়বুদ্ধির সুখ্যাতি, ধনৈশ্বর্য্যের প্রশংসা, তাঁহার মান, সম্ভ্রম, যশ, প্রতিপত্তির নানারূপ গুণানুকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। গুরুদেবের মনের মতলব, হৃদয়ের ভাব, এইরূপ প্রশংসাবাদে, এইরূপ যশোকীর্ত্তনে শিষ্য আপ্যায়িত ও পরিতুষ্ট হইয়া যদি দক্ষিণার মাত্রাটা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করেন।

বড়ই অনুশোচনার বিষয়, অধুনা গুরুগিরি একরূপ পেশা বা ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। যেমন অফিসে কোন পদখালি হইলে, পদপ্রার্থীগণ স্বস্ব প্রশংসাপত্র সহ সমাগত হয়; সেইরূপ যদি নিঃসন্তান অবস্থায় গুরুদেবের

লোকান্তর ঘটে, তাহা হইলে তাঁহার আত্মীয় ও জ্ঞাতিগণের মধ্যে অনেকেই পরলোকগত গুরুদেবের শিষ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া তদ্‌পরিত্যক্ত কুলগুরুপদ যে তাঁহাদেরই প্রাপ্য, তাহা কুলপঞ্জিকা বা কুলপত্রিকা (Geneological table) প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রমাণ করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অফিসের পদপ্রার্থীগণের মধ্যে আর গুরুপদপ্রার্থীগণের মধ্যে বিশেষ একটু পার্থক্য, বিশেষ একটু বিভিন্নতা রহিয়াছে। অফিসের পদপ্রাপ্তি সম্বন্ধে যেরূপ পদপ্রার্থীগণের কোন দাবী দাওয়া নাই, তাঁহাদের নির্ব্বাচন কেবল গুণানুযায়ী, যোগ্যতানুসারে হইয়া থাকে, গুরুপদপ্রার্থী ব্যক্তিগণের পক্ষে কিন্তু সেরূপ কোন গুণের বা যোগ্যতার বিচার নাই। যে গুণে বিভূষিত হইলে, যে ধর্ম্মপরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইলে, গুরুপদবাচ্য হওয়া যায়, সে গুণ না থাকিলেও, সে মহাধর্ম্ম পরীক্ষায় কৃতকার্য্য না হইলেও কুলগুরু বংশোদ্ভব প্রজ্ঞাহীন ভোগসুখপরতন্ত্র ব্যক্তিগণ শিষ্যভবনে উপনীত হইয়া উত্তরাধিকারীসূত্রে অবলীলাক্রমে শূন্য গুরুপদ দাবী করিয়া বসেন। তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে কোনরূপ ধর্ম্মভীতের সঞ্চার হয় না, পরন্তু ঈপ্সিত পদপ্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ্বাস বা হতাশ্বাস হইলে শিষ্যকে অভিশপ্ত করিতেও ত্রুটি করেন না।

সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বলিতে হইলে, বলিতে হয় যে, যদি কেহ অভিশাপের আশঙ্কায় অথবা কুলগুরু কুলোদ্ভব বলিয়া, গুরুপদপ্রার্থী, জ্ঞান হীন ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ বা অভিষিক্ত করেন, তাহা হইলেই বা তাঁহার আত্মোৎকর্ষ, তাঁহার অধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? যিনি নিজেই অন্ধ, তিনি কেমন করিয়া অপরের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করিতে সমর্থ হইবেন! বাইবেলে লিখিত আছে——"Can the blind lead the blind? shall they not both fall into the ditch?"

এ সংসারে অনেকে স্বীয় পত্নীর প্ররোচনায়, লোকনিন্দার ভয়ে, সমাজের খাতিরে দীক্ষাগ্রহণ করেন বটে, কিন্তু রসনায় একদিনের তরেও সে মন্ত্রের উচ্চারণ করেন না। তাঁহাদের ধারণা হিন্দুসমাজে যেমন অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, পাণিগ্রহণ প্রভৃতি কতকগুলি অবশ্য পালনীয় ক্রিয়া কলাপ আছে, গুরুকরণও যেন তেমনই একটী।

ভগবানের এ সংসার চিড়িয়াখানায় এরূপ লোকের সংখ্যাও বিরল নহে, যাহারা গুরুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া দৈনিক একবার মাত্র, মন্ত্র জপ কর্ত্তব্য মনে করিয়া, জপ করেন; কিন্তু সেটাও প্রায় স্নানান্তে, আহারের অব্যবহিত

পূর্ব্বেই কোন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় অসংযমী লোকের মনের গতি স্বাভাবিক যে দিকে ধাবিত হইবার কথা, সেই দিকেই প্রধাবিত হইয়া থাকে।

কেহ বা নির্জ্জন, নিভৃত স্থানে যথারীতি উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রসাধন কার্য্যে নিরত হন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অব্যবস্থিত চিত্ত, অসংযত মন পড়িয়া থাকে,—কোলাহলপূর্ণ, পূতিগন্ধময়, ধনজনসঙ্কুল সংসারকূপে। হায়! এমনই দুঃসময়, এমনই দুর্দ্দিন পড়িয়াছে যে, অধুনা ইঁহারাই ধার্ম্মিক ধুরন্ধর, ইঁহারাই গুরুদেবের সর্ব্বোত্তম শিষ্য বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত ও পরিপূজিত।

আমরা সমস্ত গুরু ও শিষ্যকেই লক্ষ্য করিয়া যে এ সকল কথা বলিতেছি, তাহা নহে, তবে যে দেশে, যে সমাজে, এরূপ গুরুশিষ্যের সংখ্যাই সমধিক, সে দেশ, সে সমাজ, সে স্থান, অধঃপতিত ও ভগবানের অভিশপ্ত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

শ্রীজগদীশচন্দ্র সান্ন্যাল।

সংসার।

সংসার! তোমার পায়ে প্রণতি আমার,
ভাল নাহি লাগে তব বীণার ঝঙ্কার,
মধুর না লাগে কাণে,
শেল সম বিঁধে প্রাণে,
আকুল, উদাস হিয়া করে হাহাকার,
তোমার এ ভালবাসা স্বার্থের বিকার।

তোমার সোণার হার পরিব না গলে,
বাঁধিওনা তুমি মোরে মোহের শৃঙ্খলে,
দিবানিশি শ্রম ক'রে,
বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরে,
প্রাণের বেদনা তুমি বুঝনা আমার,
"দেহি দেহি" রবে পূর্ণ তব চারিধার।

তোমার আকুল ডাকে বধির শ্রবণ,
মরুভূমি হবে বুঝি সারাটী জীবন,

জীবন প্রভাত বেলা,
মাঝে এত মেলা খেলা,
সুখের স্বপন তুমি ভাঙ্গিছ আমার,
না জানি করাবে পরে কত হাহাকার।

হতে পারে জীবনের মধ্যাহ্ন বেলায়,
প্রবল ঝটিকাঘাতে, দারিদ্র্য-প্রভায়,
অবসন্ন শুষ্ক প্রাণ,
ভয়ে হৃদি ম্রিয়মান,
কি করে আবদার তব মিটাব তখন,
কি করে প্রার্থনা তব করিব পূরণ।

রবি অস্তাচল কাল-সায়াহ্ন যখন,
দুর্ব্বহ-জীবন ভার করিয়ে বহন,
ঘৃণিত, লাঞ্ছিত হয়ে,
জীর্ণ শীর্ণ দেহ নিয়ে,
তোমার দুয়ারে বসে করিতে রোদন,
চাহিনা সংসার,—আমি চাহিনা তখন।

শ্রীরেবতীমোহন চৌধুরী।

মা দুর্গার বস্ত্রদান।

কোন এক দুঃখিনী রমণীর কন্যা, তাহার মায়ের কাছে দুর্গোৎসব উপলক্ষে নূতন বস্ত্র চাহিল। বালিকার মাতা অতিশয় দুঃখিনী, তাহার দিনান্তে অন্নও জুটিত না। কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া যাহা কিছু পাইত, তাহাতে তাহার উদর পূরণও হইত না।

কাঙ্গালিনী এক সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির পরিবার ছিল। সেই গ্রামের মধ্যে সেও এক সময় দশের গণ্য ছিল। কিন্তু কালের কুটিল-চক্রে এক্ষণে তাহাকে অনাথা করিয়াছে। পল্লীর লোকেরা কেহই তাহাকে সাহায্য করে না, বরং দুঃখী বলিয়া সকলেই [illegible] থাকে।

বালিকা যখন তাহার নিকট নূতন কাপড় চাহিল, দুঃখিনী তাহার কথায় নীরবে অশ্রুপাত করিল। বালিকা তাহাকে নীরব দেখিয়া বার বার বস্ত্র চাহিতে লাগিল।

দুঃখিনীর অর্থ কোথায়, যে, সে, বস্ত্র খরিদ করিয়া দিবে? সে বালিকাকে বলিল, আমাদের পয়সা নাই, আমরা গরীব লোক, নূতন কাপড় কোথায় পাইব?

দুঃখিনীর কথায় বালিকা বলিল, পল্লীর সকল ছেলের মা বাপ যেমন করিয়া দিয়াছে, তুমি কেন আমাকে তেমনি করিয়া দেও না।

রমণী কহিল, তাহারা ধনী লোক, তাহাদের পয়সা আছে, আমার যে পয়সা নাই। মা দুর্গা আমাদের প্রতি বৈমুখী। তা নহিলে আমাদের এমন দশা হইবে কেন, এই বলিয়া দুঃখিনী কাঁদিতে লাগিল।

বালিকা তাহাকে আর কিছু না বলিয়া, ছিন্ন, মলিন, শতগ্রন্থিযুক্ত বস্ত্রখানি পরিয়া সেই পল্লীর যে বাটীতে দুর্গোৎসব হইয়াছে, সেই বাটীতে যাইল। সে সজলনয়নে দুর্গার দিকে চাহিয়া আবার মস্তক অবনত করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, তোমার সঙ্গে আর কথা কহিব না, তোমার সঙ্গে আমার আড়ি, আড়ি। তুমি সকল ছেলে মেয়েকে পূজার সময় নূতন কাপড় দিয়াছ, কেবল আমাকে আর আমার মাকে দাও নাই। মা বলে, তুমি আমাদের উপর রাগ করিয়াছ, আমরা তো তোমাকে কিছু বলি নাই, তুমি মিছামিছি রাগ করিয়াছ।

বালিকা যখন অবনত মস্তকে কাঁদিতে কাঁদিতে দুর্গার কাছে দুঃখের কথা বলিতেছিল, তখন সেই বাটীর কর্ত্রী তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন?

বালিকা ভাবিল, দুর্গা আসিয়াছেন, সে অবনত মস্তকে চক্ষু বুজিয়া বলিল, তুমি যাও তোমার সঙ্গে আড়ি, আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কহিব না।

বালিকার কথা শুনিয়া, কর্ত্রী ঠাকুরাণী কৌতূহল বিশিষ্টা হইয়া বলিলেন, আমি তোমার কি করিয়াছি যে, তুমি আমার সঙ্গে আড়ি করিতেছ?

বালিকা বলিল, তুমি বৎসরের পর আসিয়া সকল ছেলে মেয়েকে কাপড় দিলে, কেবল আমাকে এবং আমার মাকে দাও নাই, আর মা বলেন যে, তুমি আমাদের উপর রাগ করিয়াছ, সেই জন্য আমরা খাইতে পাই না।

গৃহকর্ত্রী আরও কৌতূহলী হইয়া বলিলেন, আমি কে বল দেখি? বালিকা বলিল, তুমি মা দুর্গা। বালিকার কথায় গৃহকর্ত্রী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি তখন দ্রুতপদে গৃহ হইতে দুইখানি নূতন বস্ত্র আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, তোমার মাকে একখানি দিও, আর তুমি একখানি পরিও, আর তোমার মাকে বলিও যে, মা দুর্গার আর তোমাদের উপর রাগ নাই।

বালিকা কাপড় পাইয়া আনন্দে হাসিতে হাসিতে গৃহে আসিয়া, তাহার দুঃখিনী মাকে বলিল, মা দুর্গা এই কাপড় দিয়াছেন এবং আমাদের উপর আর তাঁহার রাগ নাই বলিয়াছেন।

গৃহকর্ত্রী সেই বালিকার সরল বিশ্বাসের কথা তাহার স্বামীকে বলাতে, সেই দিন হইতে তাহারা সেই দুঃখিনী বালিকা ও তাহার মাতাকে যথাযোগ্য সাহায্য করিতেন এবং অহঃরহঃ মা দুর্গার নিকট এই প্রার্থনা করিতেন, মা দুর্গে! এই বালিকার ন্যায় আমাদিগকে সরল বিশ্বাস প্রদান কর। আমরা যেন ঐ বালিকার মত তোমার নিকট সকল বিষয়ে আবদার করিতে পারি।

প্রেমের পরিণাম।

জনৈক সংসার-প্রেমিক ব্যক্তি, কোন এক সাধুর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, হে মহাত্মন্! আমার মন অতিশয় চঞ্চল; কিছুতেই শান্তি পায় না, আপনি এমন কোন উপায় বলিয়া দিতে পারেন, যদ্দ্বারা আমার মনের চিরশান্তি আইসে।

সাধু সেই ব্যক্তিকে চিনিতেন, এবং লোক পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন, সে অতিশয় প্রেমিক, সংসারকে সে বড়ই ভালবাসে। এক্ষণে তিনি উত্তর করিলেন, অগ্রে তুমি তোমার স্ত্রী, পুত্র, পরিবারকে পর বলিয়া জান; এবং তাহারা স্বার্থপর, তাহাদের প্রেম কেবল স্বার্থসাধনের জন্য ইহাও জান, তবে তুমি শান্তি পাইবে।

সংসার-প্রেমিক ব্যক্তি তখন সাধুর কথা। উত্তর করিল, পিতা মাতা ঈশ্বরের আদর্শ স্বরূপ; স্ত্রী পুত্র মূর্ত্তিমান্ প্রেমের স্বরূপ, ইহারা স্বার্থপর, ইহারা আমার নহে, এরূপ চিন্তা অসম্ভব! আমি হাসিলে যাহারা হাসে, আমি কাঁদিলে যাহারা কাঁদে, আমার অভাবে যাহারা দশদিক্ শূন্য দেখে, এমন প্রিয়জনদিগকে পর ভাবা অস্বাভাবিক; আমার বিবেচনায় ইহাদের অপেক্ষা আপনার আর কেহ নাই।

ইহার কথায় সাধু উত্তর করিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ সকলই ভুল কথা। মানুষ যখন মায়াতে মুগ্ধ হয়, তখন সে এইরূপই ভাবিয়া থাকে, এক্ষণে আমি যদি তোমাকে দেখাইয়া দিই, যে তোমার মা, তোমার স্ত্রী—তোমার নহে, ইহাদের প্রেম স্বার্থপূর্ণ, তাহা হইলে তুমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে, ইহা আমার কাছে স্বীকার পাও।

সংসার প্রেমিক ব্যক্তি তাহাতে স্বীকৃত হইল।

সাধু তখন তাহাকে কহিলেন, তুমি বাটী গিয়া এইরূপ ভাব প্রকাশ কর যে, তোমার হঠাৎ উৎকট রোগ হইয়াছে; তোমার সেই ভাব দেখিয়া পরিজনেরা যখন জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি নিরুত্তর থাকিয়া কেবল যাতনার লক্ষণ দেখাইও। তাহারা চিকিৎসক আনিয়া চিকিৎসা করাইলে তুমি ঔষধ খাইও না, বরঞ্চ রোগের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখাইও। যখন চিকিৎসকেরা হার মানিবে, তখন আমাকে ডাকা হইবে, তৎপরে যাহা হয়, আমি করিব।

সংসার-প্রেমিক ব্যক্তি তখন বাটীতে আসিয়া সাধুর কথামত কার্য্য করিল। রোগ সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া, তাহার মাতা এবং পত্নী কাঁদিতে লাগিল। চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিল, সংসার-প্রেমিক তাহাদের ব্যবহারে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এমন প্রেম, এমন আত্মীয়তা, কি কখন স্বার্থময় হইতে পারে? সাধু নিশ্চয় ইহাদের নিকট হারিয়া যাইবেন।

চিকিৎসকেরা যখন কিছুতেই তাহার কপট রোগ আরোগ্য করিতে পারিল না, তখন সাধুকে আহ্বান করা হইল; সাধু আসিয়া সংসার-প্রেমিকের গাত্রে হাত দিয়া, এবং রোগের বিবরণ শুনিয়া, বিকৃত মুখে কহিলেন, রোগ উৎকট, এ রোগে অল্প লোকেই রক্ষা পায়, আমি ইহাকে বাঁচাইতে পারি, যদি তোমরা ইহার বিনিময়ে ইহার পুত্রকে কাটিয়া তাহার রক্ত ইহার অঙ্গে মাখাইতে পার, অথবা তোমাদের শরীর হইতে কতক অংশ রক্ত দিলেও বাঁচিতে পারে।

সাধুর এই কথা শুনিয়া সংসার-প্রেমিকের মা ও স্ত্রী উভয়েরই মুখ শুথাইয়া গেল। তখন উভয়েই বলিল, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে; শিশু হত্যা করিতে পারিব না।

সাধু তখন সংসার-প্রেমিকের মাতাকে বলিলেন, তোমার পুত্র মরে, তুমি কেন তোমার শরীর হইতে কতকটা রক্ত দাও না?

সাধুর কথায় সে বলিল, তাহাও কি কখন হইতে পারে? একজনের নিমিত্ত আর একজন কে কোথায় মরিয়া থাকে? সাধু তৎপরে তাহার স্ত্রীকে বলিল, সেও ঐরূপ উত্তর করিল। সংসার-প্রেমিক তাহার মাতা ও স্ত্রীর ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে বলিল, সাধু ঠিক বলিয়াছেন, ইহারা আমার নয়, ইহাদের প্রেম নহে, কেবল স্বার্থসাধন।

সাধু তখন তাহার কানে কানে কহিলেন, দেখিলে ত কে কার? মৃত্যুর ভাব প্রকাশ কর, তাহা হইলে, আরও দেখিতে পাইবে।

সংসার-প্রেমিক মৃত্যুভাব দেখাইল; সে মরিতেছে দেখিয়া, স্ত্রী ও মাতা ত্রস্তভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার অঙ্গ হইতে মূল্যবান্ বস্ত্র সকল কাড়িয়া লইতে লাগিল, তৎপরে তাহাকে দুইজনে ভূতলে শোয়াইল।

সাধু তখন তাহাদিগকে বলিলেন, ইহাকে দাহ করিতে কে লইয়া যাইবে?

সংসার-প্রেমিকের মাতা ও স্ত্রী তখন বলিল, কি করি তাই ভাবিতেছি, হতভাগা মরিয়া বিপদে ফেলিল। আমরা স্ত্রীলোক, পথ ঘাট চিনিনা যে বহন করিয়া লইয়া যাই। আর মড়াও দ্বাদশ দণ্ডের অধিক ফেলিয়া রাখিলে সংসারের অকল্যাণ হয়। আপনি যদি ইহার একটী উপায় করিয়া দেন, তবেই হয়। ইতিপূর্ব্বে সংসার-প্রেমিক তাহার মাতার ও স্ত্রীর ব্যবহারে বুঝিয়াছিল যে, সংসার অসার। এক্ষণে তাহার দিব্য জ্ঞান হইল, সে তখন উঠিয়া তাহাদিগকে বলিল, পথ ঘাট আমি চিনি, আমার নিমিত্ত তোমাদের কষ্ট পাইতে হইবে না, আমি চলিলাম। এই বলিয়া সে চিরদিনের নিমিত্ত নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। সে, যে প্রাণে সংসার করিতেছিল, সেই প্রাণ ও প্রেম হরিপাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়া চিরশান্তি অনুভব করিতে লাগিল।

রামকৃষ্ণ-সংগীত।

(সেবক—নিবারণচন্দ্র দত্ত রচিত।)

(৩৫)

রামকৃষ্ণ নাম বল অবিরাম মম মন মধুর স্বরে।
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল রামকৃষ্ণ বদন ভরে॥
(প্রাণ খুলে বল, দুবাহু তুলে বল)
রামকৃষ্ণ নামের নাহিরে তুলনা,
রামকৃষ্ণ নাম আর ভুলনা ভুলনা,
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ আহা কি সুমিষ্ট নাম,
প্রাণ বলরে অবিরাম, যদি যাবি প্রেমধাম,
এ নাম ভুলনারে ভ্রম-ঘোরে (রামকৃষ্ণ নাম)॥
বেদাগমে যার সন্ধান না পায়,
সে ধন ল'ভে মন হারাস্‌নে হেলায়,
ডাকরে, প্রভুরে, কাঁদি সরল হৃদয়,

ত্যজি লজ্জা ঘৃণা ভয়, তোর যাবে ভব ভয়,

তুই অবহেলে যাবি পারে ॥

(জয় রামকৃষ্ণ ব'লে)

রামকৃষ্ণ প্রভু ভক্তপ্রাণধন,

রামকৃষ্ণ আমার অনাথশরণ,

অসার সংসারে, এক রামকৃষ্ণই সার,

আর সকলি অসার, তাই বলি মন আমার,

দয়াল রামকৃষ্ণ প্রেমে মজরে ॥

(মন প্রাণ দিয়ে)

রামকৃষ্ণ প্রভু দয়ার অবতার,

জীবের তরে ভবে আগমন তাঁহার,

দীনের হীনের পূরাইতে মনস্কাম,

ভবে এলেন গুণধাম, ত্যজি শ্রীগোলকধাম,

হেন দয়াল কেবা ভব মাঝারে ॥

(রামকৃষ্ণের মত)

(৩৬)

ওরে ঘুচিবে মনের মলা।

(মন) ভজ রামকৃষ্ণ, পূজ রামকৃষ্ণ,

জপ রামকৃষ্ণ নামের মালা ॥

রামকৃষ্ণ সদা বলরে বদনে,

রামকৃষ্ণ নাম শুনরে শ্রবণে,

ধনী হ'য়ে রামকৃষ্ণ মহাধনে,

আনন্দে যাপনারে দুবেলা।

রামকৃষ্ণ প্রভু ভকতবৎসল,

রামকৃষ্ণ দীননাথ দুর্ব্বলের বল,

রামকৃষ্ণ নিরাশ্রয়ের সম্বল,

তাঁরে ভুলনারে হয়ে বিভোলা ॥

রামকৃষ্ণপদে লহরে শরণ,

লজ্জা ঘৃণা ভয় দিয়ে বিসর্জ্জন,

রামকৃষ্ণে করি জীবনের জীবন,

এড়ানারে সংসারের জ্বালা ॥

(৩৭)

রামকৃষ্ণ নামের মালা আনন্দে জপ তুমি লা,
ঘুচিবে তোর সকল জ্বালা, রামকৃষ্ণ পদ ভাবনা।
রামকৃষ্ণ মূলমন্ত্র, রামকৃষ্ণ নামই তন্ত্র,
রামকৃষ্ণ নামই যন্ত্র, যোগ জপ তপ সাধনা ॥
রামকৃষ্ণ জীবের জীবন, রামকৃষ্ণ ভক্তপ্রাণধন,
রামকৃষ্ণ যার সর্ব্বস্ব ধন, তার কি আর ভয় ভাবনা ॥
অসার বাসনা ত্যজে, রামকৃষ্ণ পেমে মজে,
নন্দরে তোর সব ভার রামকৃষ্ণে সঁপনা ॥

(৩৮)

রামকৃষ্ণ নাম গাওনারে।
গেয়ে মন মাতোয়ারা, ভাবে ভরা, আত্মহারা হওনারে ॥
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলরে মধুরস্বরে,
রামকৃষ্ণ ব'লে বাহুতুলে নাচরে প্রেমভরে,
রামকৃষ্ণ নামে সুধা বহেরে শতধারে,
এই নামসুধা পান কর, আর দান কর অকাতরে,
(রামকৃষ্ণ সুধা)
রামকৃষ্ণ কর্ণধার এ ভবের সাগরে,
রামকৃষ্ণ ব'লে ডাক্‌লে পরে, অধম পতিত যায় তরে,
রামকৃষ্ণ প্রভু আমার ভকতজীবনরে,
প্রভু দীনের সখা, অনাথের নাথ, পতিতপাবনরে,
রামকৃষ্ণ মত দয়াল দেখি নাইরে সংসারে,
প্রভু পতিত জনে নিজগুণে কোলে নেন স্নেহ করে,
জীবের দশা মলিন দেখে গোলোকধাম ত্যজেরে,
প্রভু ধরামাঝে এসেছেন, ভাই 'রামকৃষ্ণ' সাজেরে,
এতদিনে, দীনজনের পূর্ণ মনস্কামরে,
আয় রামকৃষ্ণ বলে নৃত্য করে, যাই নিত্যধামরে ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

কার্ত্তিক, সন ১৩১৬ সাল।

ত্রয়োদশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র।

শুদ্ধং শান্তং অনাদিরূপং

প্রশান্ত নয়নদ্বয়ং, স্থিরজ্যোতি

অধর বিম্বান্বিত, রক্ত যুগলচরণং

বন্দে জগদ্গুরুঃ শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ১ ॥

যস্মৈ জগতে শ্রীরামকৃষ্ণরূপং

তস্মৈ লভতে পূর্ণব্রহ্মহি কেবলং

শুদ্ধস্বরূপং জ্ঞানমূর্ত্তিং

বন্দে শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ২ ॥

যস্মৈ প্রসাদাৎ

করতলস্থে অষ্টসিদ্ধির্ভবেৎ।

যায়স্তে কামকামনাদিরূপং

আপদনাস্তি পুত্রকলত্র সুখীর্ভবেৎ

বন্দে শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৩ ॥

আনন্দরূপং রামরঘুবরং

ব্রহ্মরন্ধ্র হিতে শেষাকাশা তনুদ্বয়ম্।

নিখিলব্রহ্মাণ্ড গোচরং যস্তে

বন্দে জগদ্গুরুং শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৪ ॥

চন্দ্রসূর্য্যনয়নদ্বয়ং
ভালে বহ্নি-তিলকং
হস্ত আজানুলম্বিতং
পদে শঙ্খচক্রগদাপদ্মং
বন্দে জগদ্‌গুরুং শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৫ ॥
দক্ষিণহস্তে অভয়দানং
বামহস্তে বরাভয় করং
হাস্যৌ মুখশ্রীঃ বন্দে রামরঘুবরং
এতেহি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৬ ॥
যস্মৈ স্মরেন্নিত্যঃ শ্রীরামকৃষ্ণরূপং
ভবেৎ রামস্বরূপং পূর্ণজ্ঞানমূর্ত্তিং
সাযুজ্য লভতে কলৌ
এবং হি বন্দে শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৭ ॥
অন্নগতপ্রাণা কলৌ
যোগমার্গং ন সিদ্ধতি
তথাহি ভজ শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৮ ॥
যস্মৈ পদপ্রান্তে
প্রপন্নতে চতুর্দ্দিশভুবনভীয়
যায়ন্তে প্রলয়ো সময়ে
তস্মিন্ পদে লীন প্রভবতি
এবং হি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় লোকশিক্ষানাং
কল্মষগুপ্ত ধর্ম্মং প্রচারয়েৎ
এবং হি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ১০ ॥
নিরঞ্জনং নিরাকাররূপং
তথৈব ভক্তান্ মনস্তুষ্টিভীঃ
সাকাররূপং ধরতি
এতেহি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ১১ ॥
যস্মৈ নামস্মরণমাত্রে'
পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে

অষ্টাদশপুরাণং, চতুর্দ্দশভুবনং জ্ঞাতব্য
কণ্ঠে সরস্বতী চ বিহরতি
এতেহি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ১২ ॥

ভক্তিমার্গ ধরতি,
কল্যাণকারণ বীজং স্থাপিত হৃদয়ে
পাপপঙ্কে নিপতিত জনে
এবং হি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ১৩ ॥

ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু শাখাহি শিষ্যবৃন্দং
পত্র মহাকারণ স্থিতং
সাধকানাং হিতার্থে যুগে যুগে অবতীর্ণং
এবং হি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ১৪ ॥

মহাভাবপূর্ণং চৈতন্যস্বরূপং
ব্রহ্মানন্দং আনন্দরূপং
জগজ্জনগণবিনিন্দিত পরমাত্মনং
এতেহি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ১৫ ॥

প্রলয়পয়োধিজলে ভাসমানং
পদতলে শ্রীলক্ষ্মী বিরাজিতং
ব্রহ্মা সমুদ্ভূতং নাভিপদ্মং
এতেহি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥

অদ্বৈতজ্ঞানপ্রচারিং
ভক্তান্ সমুদ্ধারয় কলৌ
অন্যগতি এব নাস্তি
এতেহি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ১৭ ॥

করুণানিধানং
দীনহীনজনাশ্রয়ং
যস্য কৃপা যাচে হরিহরবিরিঞ্চৈব
এবং হি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ১৮ ॥

যস্য প্রসাদাদি সোঽহং
চন্দ্রসূর্য্যহরিহরনারদং

প্রকাশন্তে সর্ব্বগোচরং
এতেহি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ১৯ ॥
নির্ব্বিকল্পত্যজ্যং
অনুকম্পায় সর্ব্বধর্ম্মান্
প্রচারয়েৎ লোকহিতার্থে
এবং হি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ২০ ॥
দীনজনগতি তবহু পরমাত্মানং
যস্য পদে লীন সর্ব্বধর্ম্মান্
এতে হি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ২১ ॥
যস্মৈ স্মরণমাত্রে
যায়ন্তে কামকামনাদিরূপং
এবং হি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ২২ ॥
মোক্ষফলং করতলস্থৈঃ
যো ভজে শ্রীরামকৃষ্ণরূপং
ধর্ম্মার্থমোক্ষকামঃ হস্তের্ভী
এবং হি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ২৩ ॥
অবতারমূলং দশমহাবিদ্যৈর্ভী
আগমনিগম তস্য পদে সমুদ্ভুত
প্রলয়ন্তে তস্য পদে লীন ভবতি
এবং হি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ২৪ ॥
আরোপ্য মুক্তিবীজং
স্বগণজন হৃদয়মধ্যে
সংস্থাপিতং ব্রহ্মমন্ত্রমূলং
এবং হি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ২৫ ॥
মুক্তির্যস্য করতলস্থৈঃ
ব্রহ্মসূত্রে সংস্থাপিতং
তাপীজনগণতারণং
এবং হি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ২৬ ॥
ভাসন্তে বিশ্বং যস্য প্রসাদাৎ
গ্রহ-নক্ষত্র-ঋতুরাদি কল্পয়ে

লীনমস্ত তস্যপদপ্রান্তে প্রলয়ো সময়ে
এবং হি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ২৭ ॥
মহাপ্রলয়ো সময়ে
জগৎ নিরাকারং নিরাধারং
এবমস্ত বটপত্রশায়ী
এবং হি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ২৮ ॥
মায়া সমন্বিতাং
ধরয়তি রামকৃষ্ণরূপং
সমাধিযুক্তং বপুঃ
ভক্তান্ উদ্ধারয়তে কলৌ
এবং হি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ২৯ ॥
ভগবদ্‌প্রেমবিহ্বলা
প্রপন্নতে মধুরোদয়
ভক্তান্ হৃদয়ে ভক্তিমূলবীজং
সংস্থাপিত লীনমস্ত ব্রহ্মপদে
এবং হি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৩০ ॥
স্তোত্র সমাপ্তম্।

রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৭৪ পৃষ্ঠার পর)

সন্ন্যাসীদিগের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা।

"The world is still deceived with ornamemt"

Shakes.

"কিং সারথে পুরুষ-শান্ত প্রশান্তচিত্তো
নোৎক্ষিপ্তচক্ষু ব্রজতে যুগমাত্রদর্শী
কাষায়-বস্ত্র-বসনো সুপ্রশান্তচারী
পাত্রং গৃহীত্বং স চ উদ্ধত উন্নতো বা"

• • ললিতবিস্তর।

সাম্রাজ্যের কর্ম্মচারীগণের সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলিয়া শেষ করিতেছি, এমন সময়ে তাঁহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত অনৈক যুবকের

কথা মনে পড়িয়া গেল। আমরা প্রায় সর্ব্বদা ভ্রমের অধীন হইয়া সকল বিষয়ের ভালটী পরিত্যাগ করিয়া মন্দটী টানিয়া লই। তখন ভুলিয়া যাই যে, আঁধার এবং আলোক যেমন পাশাপাশি থাকে, ভাল মন্দও সেইরূপ থাকিতে বাধ্য। তাহা না হইলে 'ভাল', 'মন্দ' বলিয়া কথা থাকিত না। সুধী, রাজহংসবৃত্তি অবলম্বন করতঃ ভালটী গ্রহণ করিয়া মন্দটী বর্জ্জন করেন, কিন্তু দুর্ব্বোধ সেই মন্দটীর শাঁস খোসা লইয়াই ব্যস্ত। এইরূপ অনুচিত কার্য্যকে প্রশ্রয় না দিয়া, সে সব দূর করিবার জন্য আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। আমিও তৎসম্বন্ধে এ স্থলে কিছু বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

একদিন কোনও শিক্ষিত যুবকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কখনো বেলুড়ে গিয়াছিলেন কি?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"কেমন দেখিলেন?"

"মহাশয়! আগে বিশ্বাস ছিল, পূর্ব্বে যেরূপ সন্ন্যাসীরা কঠোরতা অবলম্বন করিয়া পর্ণকুটীরবাসী এবং ফল-মূলভোজী হইয়া কালক্ষেপণ করিতেন; সেখানে গিয়া ঠিক তাহাই দেখিব। কিন্তু গিয়া দেখি যে সবই একেবারে বিলাসে ভরা। খাট, গদি, বিছানা ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাঁহাকে উত্তরে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা একটু বিস্তারিতরূপে বর্ণন করি। প্রথমতঃ, দেশ-কাল-পাত্রের বিচার আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, বাহ্য চাকৃচিক্যে সর্ব্বদা মুগ্ধ মানব আমরা—পুরাকাল হইতে কণ্টকাকীর্ণ বেড়ার গোড়ায় বারি সিঞ্চন করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু যাহার জন্য বেড়া, সে যে বহুদিন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান লইতে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। 'পরহিতায়', 'পরসুখায়' ব্যস্তমনা, দেশকালপাত্রদর্শী, পরদুঃখভাগী, অনশনে অর্দ্ধাসনে দরিদ্রনারায়ণসেবাব্রতী, বিশুদ্ধপ্রাণ, শ্রীগুরু-চরণ-নিহিতৈকদৃষ্টি, কর্ত্তব্যানুসারী, বাহ্যাড়ম্বরত্যাগী সেই "সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশ"গণের ক্রিয়া-কলাপ, রীতিনীতি কামিনীকাঞ্চন-সেবী, স্বার্থপর, কলুষিত প্রাণ, বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয় নগণ্য আমরা কি বুঝিব? যিনি বুঝিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহাদিগকে অনন্ত-কালের জন্য কোল দিয়া অন্তরালে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। একটী একটী করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে এই মর-সংসার হইতে লইয়া গিয়া তাঁহার অমরক্রোড়ে স্থান দিবেন। তখন অনুতাপাভ্যস্ত, অরণ্যে রোদন সম্বল, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলার অপরাধে অপরাধী মানব, তুমি অশ্রুজলে বক্ষ বসুন্ধরা সিক্ত

করিয়া ফেলিবে। অপার সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খাইবে, কিন্তু কুলকিনারা পাইবে না। যদি কাহারও প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগ থাকে, তবে তিনি আচরে নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করিয়া অমৃত আস্বাদনে নিজ জীবনের সাধ মিটাইয়া লউন। প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানে ব্যস্তসমস্ত হউন।

অন্য একটী সম্ভ্রান্ত যুবককে বেলুড় মঠের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম এবং উপরোক্ত যুবকের ভ্রান্ত ধারণার কথা বলায়, তিনি বলিয়াছিলেন, "তাঁদের (সন্ন্যাসীদিগের) যিনি গুরু তাঁকে ত দেখিতে হইবে, তাঁর তো জটাজূট ছিল না—পরণে লালপেড়ে ধুতি, চটী জুতো জামা ইত্যাদি। শিষ্যরা আবার ভস্ম মাখিয়া বেশী কি করিবেন?" ইঁহার কথা শুনিয়া বোধ হয়, ইনি একটু কথাটা ভাবিয়াছেন। তিনি জানিয়াছেন যে, তাঁহারা সন্ন্যাসী—মনে, বাহিরে নয়। নিন্দুক! তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যখন সেই দীন-দরিদ্র সাধুসেবাতৎপর সন্ন্যাসীবৃন্দ সুগম সমতলপ্রদেশ হইতে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের দুর্গম বিভিন্ন দেশে ও জরাজীর্ণ, পীড়াগ্রস্ত, গ্রাসাচ্ছাদনরহিত কঙ্কালমাত্রাবিশিষ্ট প্রাণীগণের সেবা করিতে গিয়া শীতে গ্রীষ্মে অসহ্য যন্ত্রণাকে আলিঙ্গন করেন,—যখন নিঃস্বার্থপরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁহারা কথনো দৈব-দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া মুমূর্ষু অবস্থায় 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিতে বলিতে নিরাপদ স্থানে প্রত্যাগমন করেন—তখন দ্বিতল প্রাসাদে দাসদাসী-বেষ্টিত, নগ্নপদে ভূমিতে পাদক্ষেপণে অসমর্থ, বায়ুবৎ ধাবমান কথার কৃতদাস তুমি, তাঁহাদের ব্যথার ব্যথী হইয়া থাক কি? যিনি অপরের ব্যথার ব্যথী হইতে পারেন, এ সংসারে শুধু তাঁহারই অপরের দোষ-গুণ-বিচারের সামান্য ক্ষমতা আছে স্বীকার করি—নচেৎ শুধু বাক্য-হর্ম্ম্য-বাসী মানবের কোনো অসার সমালোচনা শুনিলে নিন্দাবাদই যে তাঁহার ব্যবসা, ইহা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লইতে পারা যায়।

এ সংসারে ভাল মন্দ ছাড়া গঠন হয় না, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ। অল্পধী কেবল মন্দ খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে নিজেই মন্দ হইয়া যায়। এই সম্পর্কে একটা গল্প স্মৃতিপথে উপস্থিত হইতেছে। সেটী এই:—রামের রাবণ বধ শেষ হইল। দেবগণ সভা করিয়া রামের জয়ে আনন্দ জ্ঞাপন করিবেন বলিয়া, রাম সমীপে উপনীত হইলেন। তখন রামচন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ যুদ্ধে যাহারা নিহত হইল, তাহাদের আত্মীয়গণের দুঃখ মোচন কেমনে হইবে?" তচ্ছ্রবণে ইন্দ্রদেব যুদ্ধভূমিতে অমৃত বর্ষণ করিলেন। নিহত রাম-সেনা "রাবণ' 'রাবণ' বলিয়া গাত্রোত্থান করিল। তদ্দৃষ্টে রাম ইন্দ্রকে

বলিলেন "এ কি করিলেন—আবার রাক্ষস-সেনা উঠিবে? আবার কি আমায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে?" তখন ইন্দ্র প্রত্যুত্তর করিলেন, "প্রভো, রাবণ-সেনা মরিবার সময় মুখে 'রাম'নাম লইয়াই মরিয়াছে—তাহারা মুক্ত হইয়া গিয়াছে, তাহারা আর উঠিবে না। আপনার সৈন্যগণ মরণকালে মুখে 'রাবণ' নাম লইয়া মরিয়াছিল, তাই তাহারা এখনও মুক্তি পায় নাই।" দূরদর্শী সতর্ক হইবেন, যেন অপরের মন্দটা দেখিতে দেখিতে তাঁহাকেও এইরূপ মন্দ হইয়া মরিতে না হয় এবং শেষে মন্দ হইয়া অসহ্য যন্ত্রণার কবলে পড়িতে না হয়!!

যিনি যতই বলুন পবিত্রতার নিকট, তেজস্বীতার নিকট, বিশ্বজনীন প্রেমের নিকট সকলকেই মস্তক নত করিতে হইবে। সত্বর না হয়, বিলম্বে। এই স্থানে বুদ্ধদেবের একটা কথা মনে পড়ে। তাঁহার গৃহত্যাগের অব্যবহিত পরে—যখন তিনি কঠোরব্রতাবলম্বী—তখন সর্ব্বপ্রথম পাঁচটী ভক্ত তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। বুদ্ধ যখন দেখিলেন কঠোরতায় প্রকৃত জিনিষ পাইবার পক্ষে তেমন সহায়তা করে না, তিনি আর পূর্ব্ববৎ কঠোর অনুসারী না থাকিয়া মধ্যপন্থী* হইলেন। বাহ্যদৃষ্টিপরায়ণ পঞ্চশিষ্য তাঁহার কঠোরতায় উদাসীনতা দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল! যখন তিনি বুদ্ধ (Enlightened) হইয়া দেশে দেশে ফিরিতেছেন, রাজগৃহ সমীপবর্ত্তী একটী পূর্ব্ব পরিচিত গৃহে সেই পাঁচটী শিষ্যকে দেখিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে পঞ্চশিষ্যের প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, তিনি গৃহমধ্যে আসিলে কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিবে না, বা কেহ তাঁহার হস্ত হইতে দণ্ড কমণ্ডলু লইবে না, বা কেহ তাঁহাকে বসিতে বলিবে না!! কিন্তু বিশ্বপ্রেম স্রোতে শিষ্যদিগের প্রতিজ্ঞা, মান অভিমান কোথায় ভাসিয়া গেল! তিনি উপস্থিত হইতে না হইতে শিষ্যবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সকলে তাঁহার সেবায়

* সাধুদিগের মধ্যপন্থা যে অনুসরণীয়, আমরা তাহার অনুকূল প্রমাণদ্বয় 'ধর্ম্ম-চক্র-প্রবর্ত্তন-সূত্রের' ইংরাজী অনুবাদ হইতে পাঠক পাঠিকাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। (1) The habitual practice, on the one hand, of those things whose attraction depends upon the passions and specially of sensuality a low and pagan way of seeking satisfaction, unworthy, unprofitable, and fits only for the worldly minded; (2) and the habitual practice, on the other hand, of asceticism and self mortification which is painful, unworthy and unprofitable"

ব্রতী হইলেন। তাঁহার তেজস্বীতা তাহাদের ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্যকে পরাস্ত করিল। তাই বলিতেছিলাম, সামান্য মানব আমরা। বাহির দেখিয়া কি ঠিক করিব? এ কথা কি ভুলিয়া গেলাম যে "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"?

যাই হোক, অযথা ভক্ত-নিন্দা শ্রবণ এবং করণজনিত অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যাহাতে সকলে সাবধান হয়েন, আমরা মঙ্গলেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া তন্নিমিত্ত এ বিষয়টীর অবতারণা করিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন গুপ্ত।

স্বদেশ ও স্বাধীনতা।

আজকাল যেন, প্রায় সকলকেই স্বদেশ ও স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র দেখিতে পাই। সকলকেই যেন, স্বদেশে স্বাধীনতা বিস্তার করিবার জন্য উৎসুক দেখিতে পাই। এ অতি শুভ লক্ষণ, এ লক্ষণ পরিদর্শন করিয়া আমাদের হৃদয়ে বড়ই আশার সঞ্চার হইয়াছে। কারণ, মানুষ আপনাকে চিনিতে পারিলে, তখন তাহারা প্রকৃত স্বদেশ ও তথায় আত্মস্বাধীনতা বিস্তার জন্য স্বতঃই ব্যগ্র হইবে।

ভাই পাঠক! বল দেখি, আমাদের কোন দেশে স্বাধীনতা লাভ করা উচিত? উচ্ছৃঙ্খল বুদ্ধিবর্জ্জিত স্থিরবুদ্ধি ধার্ম্মিক মাত্রই বলিবেন যে, আমাদের আধ্যাত্মিক জগতে স্বাধীনতা লাভ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমরা যখন এ দেশের লোক নয়, স্থূলজ্ঞানে আমরা এ দেশকে স্বদেশ বলিয়া জানিলেও বাস্তবিক পক্ষে, এ দেশ যখন আমাদের নয়, তখন আমরা এ দেশে স্বাধীনতা লাভ করিয়া কি করিব? আর করিলেই বা সে স্বাধীনতাধন আমরা কয়দিন উপভোগ করিব? আমরা দুই দিনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি, দুই দিন পরেই চলিয়া যাইব, এরূপ অবস্থায় এখানে স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমাদের কি ফল ফলিবে? আমি যখন প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতেছি যে, আমি যাহা সঞ্চয় করিব তাহা উপভোগ করিতে পারিব না, কাল অন্তে পরশ্ব তারিখেই যখন অপর একজনকে সমস্ত প্রত্যর্পণ করিয়া আমাকে চলিয়া যাইতে হইবে, তখন এরূপ সঞ্চয় করিয়া আমার কি ফল লাভ হইবে, ভাই! এরূপ ভাবে সঞ্চয় বোধ হয় বাতুল ভিন্ন অপর কেহই করে না!

আমরা যে দেশের লোক, সেই দেশে যাহাতে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি, সেইরূপ চেষ্টা করাই আমাদের সকলের কর্ত্তব্য, প্রাণপণ করিয়া সেইরূপ কার্য্য করাই আমাদের উচিত। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। এ দেশের স্বাধীনতা ঘোড়ার ডিমের মত অলীক পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ দেশে প্রকৃত স্বাধীন কে? জ্ঞানচক্ষে চাহিয়া দেখিলে সকলকেই পরাধীন দেখা যায়। রাজা প্রজা সকলেই পরাধীন। পরস্পর সকলেই সকলের অধীন। যিনি প্রবল পরাক্রান্ত রাজশক্তি সম্পন্ন, যাঁহার ইঙ্গিতে সংসারের সমস্ত লোক চলিতে বাধ্য, তিনি প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য মাত্রের অধীন না হইলেও কামাদি ইন্দ্রিয়গণের অধীন। তিনি নরলোকের উপরে একছত্র আধিপত্য বিস্তার করিলেও, তিনি নিজে সম্পূর্ণ পরাধীন। যে হেতু তাঁহার উপরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণ সকল সময়ের জন্য সমান ভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার ইঙ্গিতে যেমন আমরা চলি, তাঁহার নিয়োগ অনুসারে যেমন আমরা নিয়োজিত হই, সেইরূপ তিনিও রিপুগণের ইঙ্গিতে চলিয়া থাকেন, এবং রিপুগণের নিয়োগ অনুসারে নিয়োজিত হইয়া থাকেন। তিনি যেমন আমাদের রাজা, আমাদের প্রভু সেইরূপ রিপুগণও তাঁহার রাজা, তাঁহার প্রভু। অতএব কেহই এ জগতে স্বাধীন নহে, সকলেই পরাধীন। ভাই পাঠক! বল দেখি, এরূপ স্বাধীনতার বালাই লইয়া কাহার মরিতে ইচ্ছা হয়?

স্বাধীন হওয়া সকলেরই উচিত কিন্তু এ দেশে এরূপ স্বাধীন হয়ে কোন সুখই নাই। এ দেশের স্বাধীনতা, স্বাধীনতাই নহে। বহির্জ্জগতে কেহ কখন স্বাধীন হইতে পারে নাই, পারিবে না। এ দেশে দীনদরিদ্র হইতে রাজাধিরাজশিরোমণি পর্য্যন্ত যখন সকলেই অষ্টশৃঙ্খলে শৃঙ্খলায়িত, সকলেই যখন জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি, শোকে জর্জ্জরিত, সকলেই যখন বায়ু, অগ্নি, শীত, গ্রীষ্ম, মেঘ, রৌদ্র প্রভৃতির প্রভাবে অভিভূত, এমন কি যাহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মল মূত্রের যন্ত্রণায় অস্থির, তাহারা আবার স্বাধীন কিসে? এতগুলির অধীনতা পাশে আবদ্ধ থাকিয়া যাহারা মনে করে যে, আমরা স্বাধীন, আমরা পরবশ নহি, তাহারা নিতান্ত তমগুণাশ্রিত ভ্রান্ত জীব। এরূপ স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হওয়া কাহারই উচিত নহে।

স্বাধীনতার জন্য যেমন বহির্জ্জগতে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, অন্তর্জ্জগতেও সেইরূপ হয়। বহির্জ্জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—এক দেশের রাজা অপর

এক রাজার রাজ্যে স্বাধীনতা বিস্তার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তদ্দেশবাসী জনসাধারণ সেই রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করিতে উদ্যত হয়, সেইরূপ আমাদের মনও যেই বাহ্য বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্জ্জগতে স্বাধীনতা বিস্তার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, অমনই সেই দেশবাসী কামাদি রিপুগণ মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করিবার উপক্রম করে। যে দুর্ব্বল অন্তঃকরণের লোক, সে বাধা প্রাপ্ত হইবা মাত্রই ফিরিয়া আসে। আর যে, সবল হৃদয়ের লোক, যে প্রকৃত বীর সাধক, সে 'জয় জগদীশ্বর' বলিয়া, তাহাদের বাধা অতিক্রম করিয়া তথায় প্রবেশ করে। সেখানে উপস্থিত হইলেই ভগবান করায়ত্ব হন। তিনি করায়ত্ব হইলেই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা যায়।

এইরূপ স্বাধীনতা যিনি লাভ করিতে পারেন, তিনিই বাস্তবিক স্বাধীন। এইরূপ স্বাধীনতা যাঁহার অদৃষ্টে ঘটে, তাঁহাকে আর ত্রিবিধ দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না, তাঁহাকে আর কামাদির নিপীড়নে উৎপীড়িত হইতে হয় না, তাঁহাকে আর বায়ু, অগ্নি, মেঘ প্রভৃতির ভয়ে ভীত হইতে হয় না। তিনি সকলের অতীত হইয়া, সকলকে আত্মবশে রাখিয়া সচ্ছন্দচিত্তে, পরমসুখে কাল যাপন করিতে থাকেন। সাধু লোকে এইরূপ স্বাধীনতাকেই প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, দুই, চারি, দশজন লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করার নাম স্বাধীনতা নহে। পরব্রহ্ম হইতে ক্ষুদ্র বালুকণার উপর পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব করার নামই স্বাধীনতা। এইরূপ স্বাধীনতাধনে যিনি ধনী তিনিই বাস্তবিক সুখী—"সর্ব্বমাত্ম বশং সুখং"।

বড়ই সুখের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই বহির্জ্জগতের স্বাধীনতার ইচ্ছা পরিহার করিয়া অন্তর্জ্জগতে স্বাধীনতা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা যদি সত্য সত্যই আধ্যাত্মিক জগতে স্বাধীনতার ধ্বজা উড্ডীয়মান করিতে পারেন, তাহা হইলে আর ইঁহাদের বহির্জ্জগতে স্বাধীনতা বিস্তার করিবার আকাঙ্ক্ষা হইবে না। কারণ ভগবানে সমস্ত জগৎ বিদ্যমান, তাই তিনি বিশ্বরূপ, সেই বিশ্বরূপ যাহার অধীন হইবেন, তাহার অধীন যে সমগ্র বিশ্ব হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

মহাবীর অর্জ্জুন স্বীয় স্বাধীনতা প্রভাবে সর্ব্ব জগদাধার শ্রীকৃষ্ণকে আত্মবশে আনিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি ত্রিজগতের উপরে স্বাধীনতা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাঠক! একবার মনে মনে বিচার করিয়া দেখুন দেখি যে, ভগবানকে লাভ করিতে পারিলেই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা যায় কি না।

ভাই সকল! এস আমরা সকলেই বহির্জ্জগতের স্বাধীনতার ইচ্ছা পরিহার করিয়া অন্তর্জ্জগতে স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হই। এ আমাদের বিদেশ, বিদেশের উন্নতির চেষ্টা কে করে? যে করে সে মূর্খ। তাই বলি, এস আমরা বিদেশের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পরিবর্জ্জন করিয়া স্বদেশের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হই। যদিও আমরা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দুই দিনের জন্য এ বিদেশে বেড়াইতে আসিয়াছি, যদিও এই অবসরে আমাদের দেশ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি আমাদের দেশের রাজার এমনই মহিমা যে, প্রাণপণে একাগ্রচিত্তে তাঁহার দোহাই দিলে তাঁহার নিকটে যাইবার পথের সমস্ত বাধা বিঘ্ন অপসারিত হইয়া যায়। ভাই সকল! আর জড়বৎ না থাকিয়া, এস আমরা সকলেই নবীন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া স্বদেশে স্বাধীনতা বিস্তার করিবার আয়োজন করি।

অনেকে হয় ত ভাবিতে পারেন যে, আমাদের এ স্বদেশ মন্ত্রে কে দীক্ষিত করিবে, আর কোন জনই বা আমাদের এ স্বাধীনতা লাভরূপ মহাকার্য্যে নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিবে। ভয় নাই, আমরা যদি সকলে মিলিয়া একাগ্রচিত্তে স্বদেশে স্বাধীনতা বিস্তার করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াই, তাহা হইলে ভগবান নিজেই আসিয়া আমাদের দীক্ষিত করিবেন ও নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিবেন। আমরাও স্বাধীনতার বিজয়পতাকা হস্তে লইয়া প্রাণ ভরিয়া হৃদয় খুলিয়া মনের আনন্দে ইহ জগতের অলীকতা এবং স্বদেশ ও স্বরাজের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে বিশ্বনেতার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ অভিমুখে গমন করিব—

"মন! চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে॥
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ,
সব তোর পর কেহ নয় আপন,
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন,
ভুলিছ আপন জনে।
সত্য পথে মন! করি আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন,
গোপনে অতি যতনে।
কাম ক্রোধ আদি পথে দস্যুগণ,

পথিকের করে সর্ব্বস্ব হরণ,
পরম যতনে রাখরে প্রহরী,
শম দম দুই জনে।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শ্রান্ত হ'লে তথা করিবে বিশ্রাম,
পথ ভ্রান্ত হ'লে সুধাইও পথ,
সে পান্থনিবাসী জনে।
যদি দেখ পথে ভয়ের আকার,
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ,
শমন ডরে যার শাসনে।"

শ্রীকান্তিবর ভট্টাচার্য্য।

মা।

এস মা জীবের ভাগ্যে, দুঃখ বিনাশিনী দুর্গে,
দেখ বঙ্গে কি রঙ্গ রঙ্গিনি!
এত ভগ্ন বঙ্গদেশ, নাহি মা আশার লেশ,
তুমি মাত্র আশা প্রদায়িনী॥
মা গো তব আগমনে, প্রফুল্ল মানবগণে,
ছিল যত দুঃখ তমোরাশি।
এত যে বিপদ ঘন, ঢাকি ছিল জন-মন,
দূরগত হাসে পৌর্ণমাসী॥
প্রলয় পয়োধি মাত্র, তুমি রূপা বটপত্র,
অবলম্ব পরমপুরুষ।
শক্তিরূপা সনাতনী, মধুকৈটভ বিনাশিনী,
যার মেদে মেদিনী উদ্ভব॥
চণ্ডমুণ্ড দুর্ন্নিবার, বধি নাশ ধরা ভার,
দেব ভয় নাশিলে ভবানী।

শৃকণী লোহে লোহিত, নহে বিন্দু ভূপাতিত,
রক্তবীজে নাশিতে জননী॥
পতি ভাবি তব হাতে, মরি গেল বৈকুণ্ঠেতে,
বাঞ্ছা পূর্ণ করিলে মা তারা।
থাকিতে তুমি জননি, কি লাঞ্ছনা ত্রিনয়নি,
এবে চেয়ে দেখ ভবদারা॥
হৃদি-পদ্মাসন পরে, আজ মা বসাব তোরে,
ভক্তিপুষ্প করিব চয়ন।
মিনতি চন্দন মাখি, রাঙ্গা পায় অর্ঘ্য রাখি,
প্রাণ ভরে করিব দর্শন॥
নাভিমূলে কুণ্ডলিনী, জাগাব মা ত্রিনয়নি,
সেই মম অকাল বোধন।
ত্রিকালে ত্রিভাবে পূজা, করিব মা দশভূজা,
দশমীতে রূপ বিসর্জ্জন॥
ছাগাদি মহিষ মেষ, ষড়রিপু সমাবেশ,
একে একে বলি দিব মায়।
ইন্দ্রিয়াদি প্রাণ মন, নৈবেদ্য উপকরণ,
ক্রমে দিব সে সব তোমায়॥
হবে সর্ব্ব তম নাশ, প্রতিমার স্বপ্রকাশ,
দেখা দিবে চৈতন্যরূপিনী।
তবে হবে ঘট নাশ, আকাশেতে ঘটাকাশ,
মিশাবে মা বিশ্ব বিধায়িনি!
দূরে যাবে ভ্রম জ্ঞান, একমেবাদ্বিতীয়ম,
অহঙ্কার ঘুচিবে তারিণি!
রূপ রস স্পর্শ শব্দ, গন্ধাদি ইন্দ্রিয় লব্ধ,
যারে মাগো বিষয় ব'লে জানি॥
তবাশ্রয় পেয়ে তারা, আনন্দেতে মাতোয়ারা,
হবে সদা আনন্দরূপিণি!
নিয়ে মা অমৃতধারা, বিষয়ের বিষ জরা,
চিরশান্তি পাবে মা ভবানি!

মা মা ব'লে বীর রসে, নাচিব মা মনোল্লাসে,
দুর্গোৎসব হইবে আমার।
অমনি তুমি মা আসি, দুস্কৃত অসুর নাশি,
ধরাভার করিবে সংহার॥

শ্রীবাণীকান্ত রায়।

পাওহারী বাবা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৩ পৃষ্ঠার পর)

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে একবার সূর্য্যগ্রহণ হয়, পাওহারী বাবা ঐ দিবস গভীর নিশিথে গঙ্গাস্নান সামাধা করিয়া নির্জ্জনে নদীকূলে যোগক্রিয়া করিতে-ছিলেন। প্রায় রাত্রিশেষে একব্যক্তি গঙ্গাস্নান করিতে প্রবৃত্ত হয়; যদিও সেই ব্যক্তি পাওহারী বাবাকে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু ঐ ব্যক্তির সাড়া পাওয়ায় হটাৎ বাবার যোগক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে এবং সেই হইতে তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই ঘটনার পর হইতে তিনি রাত্রিকালেও আর স্নানার্থে বাহিরে আসিতেন না, স্নানাদি কার্য্য কুটীরের কূপোদকে সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু তাঁহার শরীর সেই হইতে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল।

কেহ কখনও তাঁহার মুখে রোগের বা অসুস্থতার কথা শুনে নাই। শরীরের অসুস্থতাবশতঃ বহুক্ষণ সাধারণের সহিত কথাবার্ত্তা করিতে কষ্ট বোধ করিলে বলিতেন যে, পাহুন বাবার সেবা করিতে হইবে। গৃহাশ্রমীরা যেমন পাহুন (অর্থাৎ কুটুম্ব) আসিলে, তাহাকে যত্নের সহিত সেবা করেন, পাওহারী বাবা সেই প্রকার রোগকে দেহের কুটুম্ব জ্ঞান করিয়া তাহা অপনোদনের চেষ্টা না পাইয়া তাহার সেবা করা উচিত মনে করিতেন। তাহার কি অসুখ হইয়াছে, জানিবার জন্য অনেকে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও কোনও কথা বলিতেন না। অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কাশি হইয়াছে, এবং সেই উদ্দেশ্যে তাহাকে উৎকৃষ্ট মধু ব্যবহার করার কথা বলা হয়, তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে, এ মধুতে আর প্রয়োজন নাই, যে মধুর অন্বেষণে দাস গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া আছে, সেই মধুর সন্ধান কেহ বলিয়া দিলে কৃতার্থ হইব। অসুস্থতার জন্য কেহ ঔষধের কথা বলিলে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যাঁহার পুণ্যপ্রভাবে কুর্থা গ্রাম পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল, যাঁহাকে দেখিবার জন্য, যাঁহার মুখের একটী কথা শুনিবার জন্য কত দূরদূরান্তর হইতে কত লোক কুর্থার ক্ষুদ্র আশ্রমে আসিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেন, রোগে শোকে দুঃখ বিপদে কুর্থা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসী নরনারীগণ যে আশ্রমের ধূলি স্পর্শ করিয়া আশ্বস্তচিত্তে গৃহে ফিরিয়া যাইত, তাহারা ভাবে নাই যে, পাওহারী বাবা এত শীঘ্র ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন।

পাওহারী বাবা কখনও কাহাকে উপদেশ দান করেন নাই, কখনও কাহাকে সুখ সম্পদ বৃদ্ধির আশীর্ব্বাদ করেন নাই, কিন্তু গ্রামবাসী প্রত্যেক জনের ধারণা যে, তাঁহারই পুণ্যবলে, তাঁহারই আশীর্ব্বাদে সকলে সুখ স্বাস্থ্য ধন সম্পদ লাভ করিয়াছে, তাহাদের সরল হৃদয়ের বিশ্বাস যাহাই হউক, কিন্তু অন্যান্য গ্রামের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা কুর্থা গ্রামের লোকেরা অনেক সরল, সত্যবাদী ও ধর্ম্মপরায়ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার পুণ্যপ্রভাব গ্রামবাসীদিগের অন্তরকে যে অধিকার করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

১৩০৫ সনের ৬ই জ্যৈষ্ঠের কালরাত্রি প্রভাত হইল, তরুণ অরুণালোকে পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনও কেহ জানে না যে, গাজিপুরের পুণ্যদীপ্ত মহাসূর্য্য এই সময়েই চিরকালের জন্য অস্তগামী হইবেন।

এই দিন অতি প্রত্যুষে পাওহারী বাবার ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র বদরিনারায়ণ, বারাণসী কলেজের পণ্ডিত ভাগবতাচার্য্য, জনার্দ্দন পণ্ডিত প্রভৃতি পাঁচ ছয় জন ব্যক্তি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন, সহসা আশ্রম মধ্যস্থ দ্বিতল কুটীরের ধূম নির্গমন প্রণালী হইতে অল্প ধূম বাহির হইতে দেখা গেল, হোমের ধূম মনে করিয়া কেহই বিশেষ আশঙ্কিত হইলেন না, কিন্তু ধূম ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া সকলকে ভীত করিয়া তুলিল। এই দিনেই রাত্রি শেষে আন্দাজ চারিটার সময় যাঁহারা আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ঠাকুর ঘরে চন্দন ঘসা ও অন্যান্য পূজার আয়োজনের শব্দ পাইয়াছিলেন, এই কারণে সকলে একপ্রকার স্থির করিলেন যে, পাওহারী বাবা ঠাকুর ঘরেই আছেন। অপর কুটীরে আগুন লাগায় কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

তথাপি বদরিনারায়ণ আশ্রমের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত প্রাচীরের নিকট গিয়া ডাকিয়া বলিলেন যে, মহারাজ! যদি আজ্ঞা হয় তবে এ অগ্নি নিবাইয়া দি,

কিন্তু যদি হোমের আগুন হয় তবে আমরা নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই শুভ্র মেঘের ন্যায় ধূমরাশিতে সমস্ত ছাদ ব্যাপ্ত হইয়া গেল, এবং নিমিষের মধ্যে অতি প্রবল বেগে সমস্ত ঘর জ্বলিয়া উঠিল, সেই আগুন দেখিয়া প্রসাদী সিংহ, গয়া তেওয়ারী, ভৃগুনাথ রায় ইত্যাদি অনেক গ্রামবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বদবিনারায়ণ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আপনাদের অনুমতি হয়, তবে আমি ছাদে উঠিয়া দেখি। সহসা কেহ ছাদে উঠিতে, কিম্বা আশ্রমে প্রবেশ করিতে সাহস করিতেন না, কারণ পাওহারী বাবার এরূপ অনুমতি ছিল না।

প্রজ্জলিত অগ্নি আরও ভীষণ হইয়া উঠিল, তখন বদবিনারায়ণ আর অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া ব্যস্ত হইয়া সাধু লছ্মীনারায়ণের সমাধি কুটীরের ছাদে উঠিয়া সম্মুখস্থ দ্বিতল কুটীরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন দেখিলেন যে নীচের এবং উপরের সমস্ত ঘরই জ্বলিতেছে, আর সেই জ্বলন্ত গৃহ হইতে দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া কেহ যেন ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। তখন বদবিনারায়ণ ভাবিলেন, প্রজ্জলিত গৃহ হইতে পাওহারী বাবা দ্রব্যাদি ঠাকুর ঘরে স্থাপন করিতেছেন, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, মহারাজ, যদি অনুমতি হয় তবে এ অগ্নি আমরা নির্ব্বাণ করি। কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না, মুহূর্ত্ত পরেই তিনি যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিলেন, তাহাতে তাঁহার আর বাক্যস্ফুরণ হইল না—পাওহারী বাবা ঠাকুর ঘর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইতেছেন, তাঁহার সদ্যঃস্নাত আর্দ্র কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সেই তপ্তকাঞ্চননিভ ঘৃতবিলেপিত অঙ্গে ঘর্ম্মধারা ঝরিতেছে, তাঁহার সুন্দর সুপুষ্ট সুগঠিত দেহ অন্য অনাবৃত করিয়া কেবল বাম স্কন্ধে পবিধেয় "ঝুল" (আলখিল্লা) ধারণ করিয়াছেন, পরিধানে কুশ রজ্জু সংযুক্ত কোপীণ।

দক্ষিণ হস্তে কমণ্ডলু ধারণ করিয়া ধীর পদক্ষেপে ঠাকুর ঘর হইতে অগ্নি-প্রজ্জলিত গৃহের দ্বারের নিকট আসিয়া পূর্ব্বদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, ও আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বদরিনারায়ণ যোড়হস্তে কহিলেন, মহারাজ, অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে অনুমতি দিন। এই সময় পাওহারী বাবা একবার তাঁহার দিকে ফিরিয়া তাকাইয়াই সেই প্রজ্জ্বলিত গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন বদরিনারায়ণের কণ্ঠ হইতে ভীতবিহ্বল

অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইল, এমন সময় আরও দুইজন গ্রামবাসী ছাদে উঠিয়া বদরিনারায়ণের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, ইহারা মুহূর্ত্তের জন্য অগ্নিময় গৃহে প্রবেশকালে পাওহারী বাবার কেবল পশ্চাদভাগ মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে হোমকুণ্ড স্থাপিত কুটীরের ভয়ঙ্কর বহ্নি প্রবল বেগে যেন আকাশ স্পর্শ করিল, তখন সকলে নিশ্চয় করিলেন যে, জ্বলন্ত গৃহ মধ্যে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইতেছে, অগ্নি এত প্রবলরূপে জ্বলিতেছে যে, তাহার নিকটে কাহারও যাওয়া অসম্ভব।

পাওহারী বাবার প্রিয় সেবক ভৃগুনাথ অপর প্রাঙ্গনে ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। যে প্রাঙ্গন হইতে হোমকুণ্ড স্থাপিত গৃহে প্রবেশ করা যায়, তিনি সেই হোমকুণ্ডের গৃহ দ্বার মুক্ত দেখিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, সেখানে গিয়া কি দেখিতে পাইলেন? দেখিলেন, পাওহারী বাবা হোমকুণ্ডের সম্মুখে কম্বলের আসনে উত্তর মুখ হইয়া পদ্মাসনে যোগমগ্ন রহিয়াছেন, ও তাঁহার পবিত্র দেহ অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইতেছে। হস্তের অবলম্বন "আশা" কাষ্ঠের যোগদণ্ড নিকটে স্থাপিত আছে এবং চতুর্দ্দিকে ঘৃতের কলস, ভাণ্ড, কর্পূর, ধূনা প্রভৃতি নানাবিধ হোমের দ্রব্য সকল সজ্জিত রহিয়াছে, ভক্ত ভৃগুনাথ এই দৃশ্য দেখিবামাত্র অধীর হইয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, তখন আরও অন্যান্য লোক সকল সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিতে দেখিতে মহাযোগীর ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া গেল।

অবশেষে সকলেই বলিলেন যে, তিনি আপনার ক্রিয়া আপনি সম্পন্ন করিয়াছেন, ইহা আর সাধারণের দৃষ্টিপথে স্থাপিত না করিয়া বা অন্য ব্যবস্থা না করিয়া দ্বার রুদ্ধ করা হউক। পরে ঠাকুর ঘরে অগ্নি সংযোগ আশঙ্কায় বহু লোকের সাহায্যে সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হয়।

পুরাকালের শরভঙ্গাদি ঋষির ন্যায় সাধনান্তে অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়া স্বকৃত হোমাগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মহাযোগী মহাধামে চলিয়া গেলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে এই নিদারুণ সংবাদ বজ্রাঘাতের ন্যায় নগরে ও দূর গ্রামান্তরে প্রচারিত হইল। দলে দলে নগরবাসীগণ রাজপথ আকীর্ণ করিয়া আশ্রমাভিমুখে ছুটিতে লাগিল, শত শত নর নারীর হৃদয় বিদীর্ণকারী ক্রন্দন ধ্বনিতে আশ্রম প্রান্তর পূর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার পুণ্য প্রভাব, ধর্ম্মাগ্নি, তাঁহার দেহ থাকিতে যাহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই, দেহ বিসর্জ্জন দিয়া যেন

সেই অগ্নি তিনি জনসাধারণের সমক্ষে প্রজ্জ্বলিত করিয়া চলিয়া গেলেন, বিস্মিতচক্ষে ভীতিবিহ্বল হইয়ে নগরবাসীগণ এই দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। যাহারা কখনও তাঁহার কথা ভাবে নাই, যাহাদের ভাগ্যে আশ্রমে গিয়া একবারের অধিক হয়ত তাঁহার সন্দর্শন ঘটে নাই, আজ তাহারা মর্ম্মাহত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল, সকলের মুখে কেবল তাঁহারই তপ-প্রভাব, তাঁহারই কঠোর সাধনের কথা। দেহরূপ ব্যবধান ভাঙ্গিয়া তাঁহার ক্ষমতা যেন সাধারণের উপব শতগুণে বিস্তার হইয়া পড়িল। কুর্থা ও তন্নিকটবর্ত্তী ৪।৫টি গ্রামেব অধিবাসী সমুদায় নরনারী সেদিন জলস্পর্শ করে নাই, সকলেই সন্তপ্ত, শোকার্ত্ত, সকলের মুখে একই কথা—পাওহারী বাবা আমাকে বড় স্নেহ করিতেন, আমাদের সুখ সম্পত্তি যাহা কিছু সকলই তাঁহাব আশীর্ব্বাদে, তাঁহাকে হারাইয়া আজি আমরা অনাথ হইলাম।

পর দিবস প্রাতঃকালে গ্রামবাসী ও অন্যান্য বহু লোকে সমবেত হইয়া তাঁহার ভস্মাবশিষ্ট অস্থি পবিত্র ভাগী[illegible] বক্ষে নিমগ্ন করেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

গৃহাশ্রমী লোকদিগের পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদিক্রিয়ার ন্যায় যতি, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীগণ নির্ব্বাণ লাভ করিলে তাঁহাদিগেব উদ্দেশ্যে "ভাণ্ডারা" অনুষ্ঠিত হয়, এই ভাণ্ডারা এক বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান ও জনসাধারণের নিকট এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। বহু দূরদূরান্তর হইতে বহু তীর্থবাসী সন্ন্যাসী, যতি, পরমহংসগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আশ্রমপূর্ণ করিয়াছিলেন। অনেক দেশ দেশান্তর হইতে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী আশ্রমে সমবেত হইয়াছিলেন, দীন দুঃখী অন্ধ আতুর দ্বারা আশ্রম প্রান্তর এমনি পূর্ণ থাকিত যে, সেখানে প্রবেশ লাভ দুষ্কর হইয়াছিল।

যজ্ঞপূর্ণান্তে পূর্ব্ব নিয়মানুসারে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণের পূজা ও বরণাদি সমাধা হয়।

প্রত্যেক নিমন্ত্রিত সাধুগণকে নূতন বস্ত্র উত্তরীয় এবং উপযুক্ত পাথেয় দক্ষিণাদি দ্বারা সকলেরই সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল।

লক্ষপতি গৃহীব্যক্তির পক্ষে যে অনুষ্ঠান সমারোহ অসম্ভব, একজন নিঃসম্বল যোগীর নামে তাহা অসাধ্য হইল না, ভাণ্ডারার উদ্দেশ্যে যত স্তূপ

ময়দা শর্করা প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্যবস্তু সংগৃহীত হইয়াছিল, ভাণ্ডারা শেষ হইবার পরেও প্রায় ততই জিনিষ উদ্বৃত্ত হয়। গ্রাম্য জমীদারগণের প্রচুর শস্য ও অর্থ সাহায্য, এবং পাওহারী বাবার প্রিয় সেবকগণের সর্ব্বপ্রকার ঐকান্তিক যত্ন, এবং অতি দীন দরিদ্রদিগেরও সহানুভূতি ও ভক্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। অতি দরিদ্রও রিক্ত হস্তে আশ্রমে উপস্থিত হয় নাই। যাহার যাহা কিছু দেয় ছিল, অতি অল্প সামান্য বস্তুও আন্তরিক ভক্তিসহকারে আশ্রমপ্রাঙ্গনে রাখিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল।

এইরূপে সাত আট খানি গ্রামের জমীদার হইতে একজন সামান্য ব্যক্তি পর্য্যন্ত যাহার যাহা সাধ্য সে তাহা করিতে বিমুখ হয় নাই।

ভাণ্ডারার পরে মাসাধিক কাল যজ্ঞের উদ্বৃত্ত সামগ্রী সকল দীন দুঃখী-দিগের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল।

যদিও পাওহারী বাবা ইহলোক হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সেবাব্রত পূর্ব্বের মতই অক্ষুণ্ণ আছে, এখনও তাঁহার আশ্রমে নিত্য সাধু সজ্জন অতিথিগণের সেবা, দেব দেবী পূজা, ও ব্রতানুষ্ঠান সকল পূর্ব্ববৎ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এখনও উষালোক প্রকাশের পূর্ব্বে মঙ্গলারতির মঙ্গল শঙ্খ ও ভেরী ধ্বনিতে বনস্থলীস্থিত ক্ষুদ্র আশ্রম কম্পিত হইয়া উঠে, এখনও পূর্ব্বাকাশে অরুণ-চ্ছটা উদিত হইবার পূর্ব্বে স্নানান্তে ব্রাহ্মণমণ্ডলী আশ্রম-প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া সমস্বরে স্তোত্র পাঠ করিয়া আশ্রমের মহিমা বর্দ্ধন করেন।

প্রাতঃকালিক পূজা অর্চ্চনার পরে শাস্ত্রাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে সেবাদি সমাধার পরে পুনর্ব্বার সন্ধ্যাকালিক পূজা আরতির আয়োজন আরম্ভ হয়, প্রতিদিনই রাত্রিকালে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত রামায়ণ ও মহাভারতের শ্লোক সকল ব্যাখ্যান হইয়া থাকে, অধিকাংশ গ্রামবাসীগণ সন্ধ্যার পরে সমবেত হইয়া আগ্রহের সহিত তাহা শ্রবণ করে।

দেব দেবী পূজা, ব্রতানুষ্ঠান, শাস্ত্র পাঠ, এ সমস্ত পাওহারী বাবার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ বদরিনারায়ণ মহারাজ সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইনি আশৈশব পাওহারী বাবার প্রিয়পাত্র ও শিষ্য। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে স্বীয় পিতৃব্য পাওহারী বাবার আশ্রমে আসেন, এবং পাওহারী বাবা ইঁহাকে স্বয়ং সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন, যখন একেবারে দ্বার রোধ করেন, তখন শিক্ষার জন্য বারাণসীর সংস্কৃত কলেজে রাখাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীমান্ বদরিনারায়ণ মহারাজের বয়ঃক্রম এইক্ষণ অষ্টবিংশ বর্ষ মাত্র। অল্প বয়সেই শ্রমশীলতাগুণে সংস্কৃতে ইঁহার আশাতিরিক্ত অধিকার জন্মিয়াছে।

এই যুবক নির্ম্মল চরিত্র ও অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, ইনি পরিশ্রমশীল, কষ্টসহিষ্ণু, সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত, ইঁহার কোমল প্রফুল্ল মুখশ্রীতে পবিত্রতা ও ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশিত হইয়া অন্তরে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

পাওহারী বাবা যদিও প্রকাশ্যে কাহাকেও কিছু বলিয়া যান নাই কিন্তু অন্তরে ইঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন। নির্ব্বাণ লাভের কিছুদিন পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে বদরিনারায়ণ মহারাজকে বলিতেন যে, দাসের গ্রন্থ সকল যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়া রক্ষা করিও, অযত্নে নষ্ট করিও না, ইহাদের ভার তোমারই উপর রহিল।

বদরিনারায়ণ মহারাজ কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করিতেন যে, স্বামীজীকে অনেক দিন দর্শন করি নাই, যখন দর্শন পাইয়াছিলাম তখন আমার শৈশবাবস্থা, এখন একবার দর্শন পাইব না কি? যখনই এই প্রশ্ন করিতেন, পাওহারী বাবা নানা রংঙ্গে সে কথা উড়াইয়া দিতেন, একবার অত্যন্ত আগ্রহের সহিত দর্শন প্রার্থনা করিলে বলিয়াছিলেন, তুমি দেখা পাইবে। দেহবিসর্জ্জনের মুহূর্ত্তপূর্ব্বে সেই অঙ্গীকার পালন করিয়া শিষ্যের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন।

অতিথি সেবার ভার পূর্ব্বমত পাওহারী বাবার জ্যেষ্ঠ গঙ্গা তেওয়ারীই নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

প্রায় ১৬ বৎসর কাল পাওহারী বাবার সহবাসে আশ্রম কুটীরে থাকিয়া ইঁনিও জীবনের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন, ইনিও কেবল পূজা অর্চ্চনা ও সাধু সন্ন্যাসীর সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন, আশ্রম কুটীরে এই পঞ্চ অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যেন মুনি ঋষির ন্যায় প্রতীয়মান হন।

আশ্রমস্থ উদ্যান কুটীর প্রভৃতির নিয়মাদি শৃঙ্খলা সকল পূর্ব্বকারই মত বর্ত্তমান আছে, কেবল দ্বিতল কুটীর ভস্মীভূত হওয়ার পরে সেই স্থানে দুইখানি নূতন কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে হোমকুণ্ড স্থাপিত গৃহের যেস্থানে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন, সেই স্থানে কিঞ্চিৎ দেহভস্ম সমাহিত করিয়া একটী সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, প্রাতঃকালে গ্রামবাসী কত নরনারী জাহ্নবীর কূলে স্নান করিয়া তাঁহাকে স্মরণপূর্ব্বক সমাধি স্থানে আসিয়া প্রণত হয়। (ক্রমশঃ)

আনন্দ-সঙ্গীত।

(১)

কীর্ত্তন—একতালা।

আমরি আমরি (আমার) প্রেমময় হরি লীলাদেহ ধরি এল রে।
(ওরে) ডুবিল এ ধরা করুণা-তুফানে (কত) পাপীতাপী ত'রে গেল রে॥
(দয়াল নামের গুণে) (রামকৃষ্ণ নামের বাণ ডেকেছে)
(রামকৃষ্ণ নামের গুণে)
(এল) বঙ্গের নিভৃত কুটীর উজ্জ্বল, দীনদ্বিজরাজ-পরাণপুতলি,
(ওই দীনদয়াল দীনের বেশে)
(উদয়) গৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈতচন্দ্র রামকৃষ্ণে একাধারে রে॥
(নিতাই গোরা একাধারে) (ভাবের হাটে খেলা করে)
(নয়ন ভরে দেখ্‌রে ও ভাই) (প্রেমের ঠাকুর প্রেমিক সাজে)
সঙ্গোপাঙ্গো সঙ্গে সঙ্গোপনে আসি, জীবের ঘরে ঘরে ঘুরি গেল দিবানিশি,
(যুগধর্ম্ম প্রচারিতে) (ওরে এমন দয়াল আর কে আছে)
(ও তার) নয়নেরি নীরে ধরা গেল ভাসি, (ভাবি) জীবের দুঃখরাশি অন্তরে॥
(এমন দয়াল দেখিনারে) (ওই জীবের দশা মলিন দেখে)
নব অবতার নবযুগে এল, সন্দ দন্দ দ্বন্দ্ব সব ঘুচে গেল—
(নব ভাবে ভাবের মেলা) (ভাবের অভাব আর রবে না)
সত্য ধর্ম্ম পুন ভবে প্রচারিল, দূরে গেল মোহ মায়া রে॥
(জীবের ভাবনা আর নাই রে) (দয়াল রামকৃষ্ণ নামে)
(অভয়দাতা ঐ এসেছে)
নবভাবে লীলা নবরূপে খেলা, কৃপা বিতরণে নিরত বিভোলা,
(ভাবলে পারের ভয় রবে না) (ও ভাই এমন ভাব আর দেখি নাই রে)
ঘুচাতে জীবের ভব-দুঃখ-জ্বালা, ঐ আকুল পরাণে ভ্রমে রে॥

---

* প্রথম দুইটী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত। তৃতীয় গীতটী মান্দ্রাজ মঠস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের ২রা কার্ত্তিক তারিখে সালিখায় শুভাগমন উপলক্ষে রচিত। সালিখার ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে লইয়া ঠাকুরের বিবিধ প্রসঙ্গ ও কীর্ত্তনাদি করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের বিবিধপ্রকার ভোগরাগ ও ভক্ত সেবাও হইয়াছিল। চতুর্থ গীতটী শ্রীশ্রীসরস্বতী মাতার স্তুতি। রচয়িতা—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি, এল্।

(ওই জীবের দুঃখে দুঃখী হ'য়ে)   (দয়াল রামকৃষ্ণ আমার)

জ্ঞান ভক্তি মুক্তি লইয়া বিরলে,   কাঙ্গালের হরি ডাকিছে সকলে,

(সাধের ঠাকুর সেধে ডাকে) (ও তার নয়ন জলে বয়ান ভাসে)

(ওরে) পাপীতাপী তোরা আয় চলে, (ঐ) চরণকমলে মজ রে ॥

(যদি অনায়াসে পারে যাবি)   (ওরে ত্রিদিববাঞ্ছিত পদ)

(এমন দিন আর হবে না)

(যদি) ত্রিতাপ যাতনা জুড়াতে বাসনা, রামকৃষ্ণ নাম লহরে রসনা,

(এমন সাধের জিনিস সেধে নেনা)   (ওবে ত্রিতাপ জ্বালা থাক্‌বে নারে)

(ওবে) জনমে মরণে ও রাঙ্গাচরণে ধূলিকণা হ'য়ে রহ রে ॥

(এমন জনম আর হবে না রে)

(মান[illegible] [illegible]নম সফল হবে)   (দয়াল রামকৃষ্ণ পদে)

---

(২)

সিন্ধুড়া—ধামার।

দয়ার মূরতি ধরি এল নরনারায়ণ,

কৃপার দুয়ার খুলি (দীনে) করিতেছে আবাহন।

অতল গভীর তা'র প্রেমসুধা পারাবার,

(তাহে) ডুবিলে বারেক আর, কেহ না উঠিতে পারে,

সংসার ভুলিয়ে যায়—পিতা মাতা আপ্তজন।

প্রেমঘন রূপ ধ'রে, ভক্ত-ভৃঙ্গ সঙ্গে ফিরে,

ত্যাগী-রাজ-রাজেশ্বর, মরি শোভা অতুলন!

জীব-চিন্তা অনিবার, প্রেমে তা'র একাকার,

নাহিক আপন পর, দুনয়নে অশ্রুধার,

সতত আপনহারা, দীনে করি দরশন।

(তা'র) যুগে যুগে যাওয়া আসা, জগজ্জীবে ভালবাসা,

(তা'র) অপরূপ রূপখানি জ্ঞান ভক্তি সম্মিলন,

জয় জয় প্রেমলীলা, জয় জয় ভক্তমেলা

জয় নররূপে খেলা, জয় ভবার্ণব-ভেলা—

জয় জয় রামকৃষ্ণ কাঙ্গাল-দীন-শরণ।

---

(৩)

কামোদ—তেওরা।

এস মহাযোগী গুরু অনুরাগী আজি এ দীন-কুটীরে।
ডুবে যাই মোরা অতল গভীর তোমারি প্রেম-সাগরে॥
গুরু-পদে দিলে জীবন যৌবন,
গুরু-সেবা-ব্রতে ব্রতী আজীবন,
মুখে অনিমিষ গুরুগুণগান, গুরুধ্যান সদা অন্তরে।
প্রেম ভক্তি সেবা ভরা হৃদপুর,
ত্যাগীশ যতীশ সন্ন্যাসী ঠাকুর,
নিত্যসিদ্ধ মুক্ত ভক্তেন্দ্র প্রভুর, ডুবু ডুবু (তাঁ'রি) নামসাগরে।
দক্ষিণ ভারতে ভিখারী সাজিয়ে,
জনে জনে গুরু নাম শুনাইয়ে,
ভক্তিতত্ত্ব ঘরে ঘরে বিলাইয়ে, আনিলে শ্রীগুরু-দুয়ারে।
আদর্শ চরিত্র এভবে রাখিলে,
অপরূপ সেবা জীবেরে দেখালে,
পথভ্রান্ত মোরা রাখ পদতলে (যাহে) তরে যাই ভবদুস্তরে।

(৪)

অয়ি বাণি বীণাপাণি জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গিনি!
এস বস রসনায় বেদ নির্ম্মাল্য মালিনি॥
শ্রীকরে বাজায়ে মোহন বীণে,
মধুর রাগ রাগিণী গণে,
গাঁথিয়ে মালা সপ্তস্বরে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি॥
কণ্ঠ হতে তব হ'ল বিনির্গত,
বেদ বেদান্ত শাস্ত্র কত মত,
নেহারি ধরা হল চমকিত ওমা অবিদ্যা বিনাশিনি॥
বিশাল তব হৃদয় আকাশে,
জ্ঞান ভানু সদা সুপ্রকাশে,
এ দীন হৃদি ঘোর তামসে; নাশ জ্ঞান সঞ্চারিনি॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীচরণ ভরসা।

অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৬ সাল।

ত্রয়োদশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা।

হিন্দুর-স্বাবলম্বন।

"Thy Spirit, Independence, let me share;
Lord of the lion heart, and eagle eye,
Thy steps I follow with bosom bare,
Nor heed the storm that howls along the sky."

Ode to Independence.

আমরা আজকাল দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক কাগজে; বক্তার বক্তৃতায় এবং গ্রন্থকারের গ্রন্থে স্বাবলম্বনের যে ডাক্, হাক্ শুনিতেছি, তাহার মূলে কি বর্ত্তমান আছে, একবার খুঁজিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যেমন গাছের অবয়বটা শুষ্ক বা সরস দেখিয়া তাহার গোড়ার শুষ্কতা বা সরসতার সত্য নির্দ্ধারিত হয়, এই জাতিটারও উন্নতি বা অবনতির মূলদেশে একটা সত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেটা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বহু বৃক্ষলতার মধ্যে একটী গোলাপ গাছকে দেখিতে পাইয়া সুধী স্থির থাকেন না। তিনি সব গাছপালা সরাইয়া দিয়া গোলাপের গোড়াটা আগে দেখিয়া লয়েন। কেননা গাছটী শুষ্ক হইবার উপক্রম হইলে সেই গোড়ায় বারিসিঞ্চন করিতে হইবে। আমাদেরও জীবনের নানা শাখা প্রশাখার মধ্য হইতে সেই জাতীয় জীবনের মূলটা নির্দ্দেশ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

তাহা হইলে তাহারই উন্নতি কল্পে জীবন বিসর্জ্জন করিলে দেশের উন্নতি হইবে। বলা বাহুল্য যে, গাছের পাতায় জল ঢালিলে গাছ সজীব থাকিতে পারে না, গোড়ায় জল দিতে হয়। কিন্তু আজকাল অনেকে স্বদেশ সেবা করিতে যাইয়া সেই গাছের পাতাতেই জল ঢালিতেছেন। বাক্যান্তরে বলিতে গেলে, তাঁহারা দেশের উপর গালিবর্ষণ, আকণ্ঠ বক্তৃতা প্রদান এবং অন্যান্য বাহ্যিক কার্য্যকে জাতীয় জীবনের উন্নতির সহায় ভাবিয়াছেন। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, ভাই, গাছের পাতায় জলসিঞ্চন কর ক্ষতি নাই, কিন্তু গোড়াটার কথা যেন ভুলিও না।

স্বাবলম্বন শক্তির অপেক্ষা রাখে। যার শক্তি নাই, সে আবার স্বাবলম্বনের কথা মুখে ধরে কেন? আগে শক্তি সঞ্চয় হোক্, তারপর স্বাবলম্বনের কথা। দুর্ব্বলের কথা বায়ু হইতে নির্গত হইয়া বায়ুতেই বিলীন হয়। বর্ত্তমান ধর্ম্ম শক্তি সঞ্চয়ে। সবল ব্যক্তি 'যম্ দেশম্ শ্রয়তে, কুরুতে বাহুপ্রতাপার্জ্জিতম্'; কিন্তু To be weak is miserable, doing or suffering.' তবে এ শক্তি নিহিত কোথায়? ব্রহ্মচর্য্যে। ব্রহ্মচর্য্য কি? শারীরিক এবং মানসিক শক্তির যাহাতে অপচয় না হয়, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। প্রথম চেষ্টা বিন্দুধারণ। আজকাল কতই বক্তৃতা শুনি, কতই বক্তৃতা পড়ি, কত লোকের সঙ্গে আলাপ করি, কিন্তু জাতীয় জীবনটা যে কোথায় পড়ে আছে, কার উন্নতিতে যে জাতিটার উন্নতি হতে পারে, সেটাতো বড় কাক মুখ থেকে শুনি না। কেবল সে গুলি পড়ি স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতায় এবং দেখি তাঁর শিষ্য প্রশিষ্য বৃন্দে। আজকাল হচ্ছে age of civilisation বা সভ্যতার যুগ। সেজন্য পিতামাতার বড়ই লজ্জাবোধ হয়, ছেলেকে কি করেই বা বলেন যে, অমুক খারাপ অভ্যাসটা ছেড়ে দে! কিন্তু হে ভারতীয় পিতামাতা, হে স্বাবলম্বনাকাঙ্ক্ষী নরনারি, ছেলেকে একবার তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিবে কি—যে ব্রহ্মচর্য্যেই একমাত্র মনুষ্যত্ব বর্ত্তমান, অন্য কিছুতে নাই? শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিলে, Shakespear, Scot, Milton ইত্যাদি কবিপুঙ্গের কবিতাকুঞ্জে বাস করিলে স্বাবলম্বন পাইবে না। পাইবে শুধু ব্রহ্মচর্য্যে; পাইবে খাওয়া, পরা, শোওয়া এবং সঙ্গ হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক হইলে; পাইবে যখন প্রাণে প্রাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে যে 'মরণং বিন্দুপাতেন, জীবনং বিন্দুধারণাৎ।' স্বামী বিবেকানন্দ যে বলিয়াছেন 'ভারতমাতা একশত বলি চান।' তার অর্থ কি? এক সহস্র বকাট, চরিত্র-

হীন, জড়বাদী (Materialist) নয়, পরন্তু এক সহস্র চরিত্রবান ধর্ম্মপ্রাণ (Spiritualist) যুবক। স্বামিজী তাঁহার বক্তৃতার একস্থলে বলিয়াছেন—Whether you belive in spirituality or not, for the sake of the national life, you have to get a hold on that spirituality and keep to it. Then stretch the other hand out and get all you can from other races, but everything must be subordinated to that one ideal of life and out of that a wonderful, glorious future India will come—*I am sure it is coming*—greater than India ever was." (1)

এর মর্ম্মটা এই, আমরা ধর্ম্মে বিশ্বাস করি আর নাই করি, কেবল জাতীয় জীবনের জন্য আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। আমরা যে জাতির নিকট যাহা ভাল পাইব, তাহা গ্রহণ করিয়া নিজের ভাণ্ডারপূর্ণ করিতে ছাড়িব না। কিন্তু 'এক্ত ভায়া'র দলে গিয়া যেন ধর্ম্ম (spirituality) কে উড়াইয়া না দিই। এমন কি, আমরা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিব যাহাতে যেথান হইতে যাহা পাইব, তাহা ধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইব। এই সব কথা শুনিয়া মনে হয়, ভগবান বুঝি এই হতভাগা তমসাচ্ছন্ন দেশে স্বামী বিবেকানন্দের মত একখানি সূর্য্যকান্তমণিকে হাতে ধরিয়া দেশের তমোদূর করিবার সংকল্প করিয়াছেন। আক্ষেপের কথা বলিব কি, এমন অনেক অদূরদর্শী হিরণ্যকশিপুস্বভাবপ্রাপ্ত পিতামাতার কথা শুনিয়াছি, যাহাদের ছেলে ধর্ম্মপ্রাণ হইয়াছে শুনিলে প্রাণটা আই ঢাই করে! আমার মনে হয় ইহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য নহেন। কেননা হিন্দুর প্রতি কথায়, প্রতি ধমনীতে ধর্ম্মঃ স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'লে ছেলে বকে যাবে' ইত্যাদি বিজাতীয় ভাব যাহারা ধারণা করিতে পারে, তাহাদিগকে ভারতের দেশসম্ভূত না বলিয়া আর কি বলিব? বিদেশীও বোঝে যে, ভারতের শয়নে, স্বপ্নে, জাগরণে, সমাজ এবং রাজনীতি ইত্যাদিতে ধর্ম্ম ছাড়া কথা নাই। Max-muller (মোক্ষমুলার) কে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 'আপনি ত ভারতগত প্রাণ, একবার ভারতে চলুন না কেন?' উত্তরে পণ্ডিতপ্রবর বলিলেন,—"আমি দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি, ভারতে সর্ব্বদা যজ্ঞ হইতেছে,

(1) 'From Colombo to Almora' page 61

সেই যজ্ঞাগ্নির ধূমে ভারতাকাশ সর্ব্বদা সমাচ্ছন্ন! আমি সেখানে যাইবার উপযুক্ত পাত্র নহি। ভারতের কথা ভাবিয়াই পবিত্র হইতেছি।”

হে স্বাবলম্বনবাদী হিন্দুজাতি! তোমায় একটা গুরুতর কথা বলিবার আছে। বলি, চক্ষে একবার সত্যের অঞ্জন লাগাইয়া, হৃদয় হইতে সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা এবং মাৎসর্যাজনিত দুর্ব্বলতা দূর করিয়া শুনিও, একটা নবসুর ভারতে এবং ভারতেতর দেশে ঘন ঘন ধ্বনিত হইতেছে, সেটা ভারত হইতে সর্ব্বাগ্রে উত্থিত হইয়াছে, বুঝি সূচনা করিতেছে, ভারতকেই সংসারের গুরুপদে বরণ করিবে! সে সুর কাহাকেও গালি দেয় না, কাহারও নিন্দা করে না, কাহাকেও অমানুষ বলে না, শুধু বলে 'হে মানব, উন্নত আছ, উন্নত-তর হইও।' সেই সুরটী যুগান্তর-উপস্থিতকারী দরিদ্র ব্রাহ্মণের পূতকণ্ঠনিঃসৃত। সে ব্রাহ্মণকে কেহ অবতার, কেহ আচার্য্য, কেহ সিদ্ধপুরুষ, কেহ বা অবতারসমষ্টি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছেন। সে সব এখন থাক্। দেখুন হিন্দুস্থানে স্বাবলম্বনের বাতাসটা তাঁহার সময় হইতে অদ্যাবধি দিন দিন কেমন খরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে; দেখুন তিনি যখন অবতীর্ণ হইলেন তখন উদার মতাবলম্বিনী ভিক্টোরিয়া ভারতের অধিশ্বরী; তখন সাহিত্যক্ষেত্রে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ, নারোজী, গোখেল, তিলক ইত্যাদি! ধর্ম্মক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, ভগবানদাস বাবাজী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং শিবনাথ শাস্ত্রী ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কেহ সেই অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছেন, কেহ বা তাহার আভাস পাইয়াছেন। আবার সাত সমুদ্রপারে পণ্ডিতজী মোক্ষমূলার তাঁহার গুণগান করিতে ছাড়েন নাই। সূক্ষ্মদর্শী ভাবুক! একবার নিজে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তোমার ভাইবন্ধুদিগকে এ গূঢ় রহস্যে প্রবেশ করাইতে পারিবে কি? আর একটা কথা; রামকৃষ্ণের পূর্ব্বে এবং রামকৃষ্ণের পরে দেশের যে বিভিন্ন অবস্থা, সেটা একবার তুলনা করিতে ইচ্ছা হয় কি? স্বাধীনজাতি বর্ত্তমান ভারতকে আদর করে, জানিতে পারিয়াছে ভারত অসভ্যপূর্ণ নয়, এমন কি যদি প্রকৃত সভ্যতা শিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ভারতকেই শিক্ষকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ কথাটাও আজ বৈদেশিক উন্নতজাতি স্বীকার করে! শুধু স্বীকার করা নয়, বর্ত্তমান ভারতের পাদদেশে শিক্ষার্থ উপবিষ্ট!! বলি এ সব কাহার প্রভাবে? রাজাধিরাজ অশোক বহু চেষ্টা করিয়া যেখানে ধর্ম্মগুরু প্রেরণ করিয়াছে

পারেন নাই, আজ সামান্য কয়টা ভিক্ষুক সন্ন্যাসী সেখানে ধর্ম্মগুরুরূপে সাদরে গৃহীত হইয়াছেন! এ সব ঘটনার রহস্য কোথায়? আমরা নীরব থাকিলাম। পাঠক পাঠিকা ধীরে স্থিরে তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হউন।

উন্নতি করিতে হইলে সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সমগ্র ক্ষেত্রে ঘুরিতে হইবে মানিলাম। কিন্তু উন্নতি করিবে কা'র? হিন্দুজাতির। বলি, এ জাতির তো একটা গঠন চাই? গঠন কি দিয়া হইবে? ভারতমনিষিগণ বলেন, সুধু ধর্ম্ম দিয়াই হিন্দুর প্রাণ আসিবে। শুধু ধর্ম্ম দিয়াই এ জাতির গঠন হইবে। গেরিবল্‌ডি কি বলিয়াছেন, মেট্‌সিনি কি বলিয়াছেন, মর্লি কি বলিয়াছেন, তাহাতে কি? ভারতের উন্নতি করিতে হইলে বিদেশীর কথায় চলিবে না। এটা কুসংস্কার নয়। কথাটা হচ্ছে, তারা না হয় তাদের দেশের নাড়ী টিপিয়া ঔষধ ঠিক করিয়াছে। কিন্তু একই ঔষধ কখনও সর্ব্বত্র প্রযুজ্য হইতে পারে না। তাই বলিতেছিলাম, এ দেশের যে ডাক্তার— জাতীয় জীবনের ব্যারামটা কোথায়, তাহা যে জানিতে পারিয়াছে, শুধু জানিতে পারা নয়, জানিতে পারিয়া তাহার উন্নতি কল্পে আপনার শোণিত পর্য্যন্ত দান করিয়াছে, আমরা তাঁহার—সেই বিবেকানন্দ স্বামীর কথাটা অগ্রে গ্রাহ্য করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব না কি? বর্ত্তমান সমস্যায় তিনি কি বলেন শোনা যাক্,—"Here are the two mountains before our path in India, the Scylla of old orthodoxy, and the Charybdis of modern European civilisation. Of these, I vote for the old orthodoxy, and not for the Europeanised system; for the old orthodox man may be ignorant, he may be crude, but he is a man, he has a faith, he has strength, he stands on his own feet, while the Europeanised man has no backbone, he is a bundle of heterogenous ideas packed up at random from every source—unassimillated, undigested, unharmonised.*

মর্ম্মটা হচ্ছে, বর্ত্তমান আমাদের সাম্‌নে ইউরোপীয় নব্যপ্রণালী ভারতীয় পুরাতন প্রণালী এই দুইটীর সংঘর্ষণ উপস্থিত। কা'কেই বা ছাড়ি, কা'কেই বা ধরি? স্বামিজী বলেন, বাপু! ঘরের ছেলে, ঘরের ভাত খাও, বলবান্ হইবে। অপরের ভাতে আকাঙ্ক্ষাটা ভাল নয়। ভারতের সমস্ত গ্রহণ

* 'From Colombo to Almora' page 58.

কর, বিদেশের গুলো বর্জ্জন কর। নিজের হাতের রান্না যেমন মিষ্টি, অপরের হাতে রান্না কি তেমন মিষ্টি লাগে? এখন হিন্দুসাধারণ অপেক্ষাকৃত অজ্ঞতাচ্ছন্ন হইলেও তাহার গভীর গবেষণাসাপেক্ষ মনুষ্যত্ব আছে, বল আছে, বিশ্বাস আছে। বিদেশীর এলোমেলো কতকগুলো নিয়ে মস্তিষ্ক আবর্জ্জনাময় করিবার কি প্রয়োজন? তা'র সঙ্গে আবার এ সারগর্ভ কথাটুকুও আমাদিগকে মনে রাখতে হবে যে "যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।"

এইবার আমরা হিন্দুর স্বাবলম্বন সম্বন্ধে আর দুটো একটা কথা কহিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি। স্বাবলম্বন স্বাবলম্বন করিয়া যেমন আগোটা ভারতবর্ষে রব পড়িয়াছে, ভগবান্ করুন্ যেন ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মচর্য্য করিয়াও সেইরূপ ধ্বনি ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে ধ্বনিত হউক। ভাই! শস্যকে 'বেড়ে যা' 'বেড়ে যা' বলিলে সে বাড়িয়া যায় না। সার দিলে আর 'বেড়ে যা' বলিতে হয় না, সে আপনিই বাড়িয়া যায়। ভারত জীবনের বর্ত্তমান সার ব্রহ্মচর্য্য। স্বাবলম্বনের ধুয়া উঠাও, ক্ষতি নাই; কিন্তু ভাই জানিও তোমার অবলম্বনটা কেবল ব্রহ্মচর্য্য। এই ব্রহ্মচর্য্যকে বাদ দিয়া আর যাহা কিছু ধরিতে যাইবে, দেখিবে তুমি ধূম মাত্র মুষ্টির অন্তর্গত করিয়াছ। মনুষ্যোচিত কর্ম্মের ব্যবস্থা কখন? যখন আমরা মানুষ হইব। কিন্তু অহরহ কতই সুকুমারমতি বালক যে বীর্য্যক্ষয় করিয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়া মর্কটরূপ ধারণ করিতেছে, তাহার খোঁজ আমরা কয়জন রাখি? ভাই, স্বাবলম্বন প্রাপ্তি বা জাতীয় জীবন গঠন বড় সামান্য কথা নহে। রামচন্দ্রের সেতুবন্ধের চেয়েও এ'র গুরুত্ব বেশী। জাতীয় জীবন তো ভগবান্ গঠন করিয়া দিবেন, তবে তুমি আমি কাঠবিড়ালীর কর্ম্ম ছাড়ি কেন? কাঠবিড়ালী যৎসামান্য কর্ম্ম করিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিল। আমরাও জাতীয় জীবন নির্ম্মাণে যৎসামান্য শক্তিক্ষয় করিয়া সেই আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হই কেন? প্রার্থনা করি, হে ভারতীয় জনক জননি! একবার চরিত্র হীনতার করালগ্রাস হইতে সন্তান সন্ততিগণকে রক্ষা করুন; হে অগ্রজবৃন্দ, আপনারাও সহোদরগণের দায়িত্ব অনুভব করুন! হে বন্ধুবর্গ, আপনারা একবার নিজ নিজ বন্ধুদিগের চরিত্রগঠনে সহায়তা করুন। এ দায়িত্ব যে আপনাদিগকে একদিন সেই সর্ব্বনিয়ন্তার নিকট বুঝাইয়া খালাস পাইতে হইবে, এইটা সর্ব্বদা স্মরণ রাখুন। এবং প্রত্যেক হিন্দুস্থানবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাগণকে আমরা সম্বোধন করিয়া

বলিতেছি—হে ভারতবাসি! যদি স্বাবলম্বনের সুখভোগে ইচ্ছা থাকে, জানিও "Without religion the nation will die" (ধর্ম্ম ব্যতিরেকে জাতিটা মরিয়া যাইবে), কার্য্যে দেখাও তুমি ব্রহ্মচর্য্যাস্ত্র ধারণ করিয়া পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হইতে পারিবে, ভুলিও না 'শরীর পতন কিম্বা কার্য্যের সাধন' আমাদের মূলমন্ত্র, প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া লও যে তোমার সামাজিক গুরু অযোধ্যাপতি রাম, রাজনৈতিক গুরু দ্বারকাপতি কৃষ্ণ, এবং ধার্ম্মিক গুরু কামিনীকাঞ্চনত্যাগী জগৎপতি রামকৃষ্ণ; এবং ত্যাগীবর স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত সমস্বরে তাঁহার সেই উপনিষদের প্রতিধ্বনি জাগাইয়া বল 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত' "Arise, Awake and stop not till the goal is reached." ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত।

বেদান্তের আভাষ।

প্রথম প্রস্তাব।

শিষ্য। মহাশয়, আপনি সে দিন আমাকে বেদান্তের গুটিকতক মোটামুটি বিষয় বুঝাইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। সকলেই আজকাল বেদান্ত বেদান্ত করে, আমি কিন্তু উহার একটী বর্ণও জানি না। যদি আপনার অবকাশ হয় তাহা হইলে অদ্যই আরম্ভ করিলে আমি কৃতার্থ হইব।

গুরু। এর আর কৃতার্থ অকৃতার্থ কি, বাবা। আমি আহ্লাদের সহিত এ সম্বন্ধে যাহা জানি, সংক্ষেপে তাহা তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। বেদান্ত কাহাকে বলে জান ত?

শিষ্য। আজ্ঞা, না।

গুরু। তবে শুন। বেদের অন্ত অর্থাৎ শিরোভাগকেই বেদান্ত বলে। বেদের প্রধানতঃ দুইটী অংশ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। যাগযজ্ঞাদির বিবরণাদি যে অংশে আছে, তাহাকে কর্ম্মকাণ্ড বলে, এবং একমাত্র সারবস্তু ব্রহ্মকে জানিলেই কৈবল্য বা মুক্তিলাভ হয়, যে অংশে এই কথা আছে, তাহাকে উপনিষৎ বা বেদান্ত বা জ্ঞানকাণ্ড বলে।

শিষ্য। তাহা হইলে বেদান্তবাদীর মতে ব্রহ্মই একমাত্র সারবস্তু আর সকলই অসার ?

গুরু। শুধু অসার নহে ; ব্রহ্ম ব্যতীত আর যাহা কিছু দেখি, সে সকলই অসৎ বা অস্তিত্বরহিত। আমরা কেবল আমাদের অজ্ঞানবশতঃ এইরূপ দেখি। তবে একটী কথা আছে। যদিও বেদান্তবাদীর মতে প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ব্রহ্মই বস্তু আর সকলই অবস্তু, ব্রহ্ম ব্যতীত আর নানা পদার্থ কিছুই নাই ("একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি") তত্রাপি তাঁহাদিগের মতে যতক্ষণ না ব্রহ্ম বিজ্ঞাত, বা বিশেষরূপে জ্ঞাত বা অনুভূত হ'ন, ততক্ষণ লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার অনুমোদিত নানা পদার্থ ও তদববোধক বা তদ্জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, বা ব্রহ্মরূপ এক অদ্বিতীয় বস্তুতে নানাবিধ বস্তু আরোপ করিতে হয়, ইহাকেই বেদান্তে অধ্যারোপ বলে। যেমন ঈষৎ অন্ধকারে সম্মুখে পতিত রজ্জুতে সর্পত্ব আরোপিত বা অধ্যারোপিত হয়, এবং কিছুক্ষণ ভাল করিয়া দেখিলে সর্পত্ব জ্ঞান অপবাদিত বা তিরোহিত হইয়া প্রকৃত রজ্জুজ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ যতক্ষণ না ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় ততক্ষণ ব্রহ্মাদ্বৈত জ্ঞান হয় না। এই ভেদজ্ঞান বা নানাত্বজ্ঞান অজ্ঞান বা অবিদ্যাজনিত, পারমার্থিক নহে। ইহা ক্রমশঃ বিশদ হইবে।

শিষ্য। অধ্যারোপ কাহাকে বলে এবং কাহার উপর কাহার অধ্যারোপ হয় এবং এই নানাত্ব দর্শনেরই বা কারণ কি ?

গুরু। অধ্যারোপ কাহাকে বলে বুঝিবার অগ্রে বেদান্তধৃত পদার্থ কয়টী বুঝ। বেদান্তে বলে পদার্থ দুইটী, দৃক্ বা দ্রষ্টা ও দৃশ্য, কেহবা এই দুইটীকে চিৎ ও জড়, কেহ বা চিৎ ও অচিৎ এবং অপর কেহ বা আত্ম ও অনাত্ম এইরূপ আখ্যা দিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে একমাত্র আত্মাই দ্রষ্টা বা সকল বিষয়ের সাক্ষী, তিনি চৈতন্যময় বা চৈতন্যস্বরূপ এবং দৃশ্য পদার্থ বলে অজ্ঞান বা অবিদ্যাকে এবং অবিদ্যার অস্তিত্বের জ্ঞাপক ও অবিদ্যার কার্য্য এই জগৎপ্রপঞ্চ। এই আত্মাই বস্তু, তদ্ভিন্ন সকলই অবস্তু এবং এই বস্তুর উপর অবস্তুর আরোপকেই অধ্যারোপ বা অধ্যাস কহে। অধ্যাসই নানাত্ব জ্ঞানের কারণ এবং অধ্যাসের অপবাদেই, অর্থাৎ এই আরোপিত নানাত্বজ্ঞানে তিরোহিত হইলেই, এক অদ্বিতীয়, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব ব্রহ্ম বস্তু অবশিষ্ট থাকেন, তখন আর কোন ভেদজ্ঞান থাকে না।

শিষ্য। নানাত্ব জ্ঞানের কারণটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন।

গুরু। অদ্বৈতবাদীর মতে নানাত্ব জ্ঞান ও ব্যবহার অপারমার্থিক বা অবিদ্যাজনিত, এবং এক অদ্বিতীয় বস্তুর উপর নানা উপাধি পরম্পরা আরোপ বা অধ্যাস বশতঃ এইরূপ হইয়া থাকে। সাক্ষাৎ ও পরম্পরা ঘটিত পর পর নানাবিধ অধ্যাস বা অধ্যারোপ বশতঃ সেই দুইটী দৃক্ ও দৃশ্য পদার্থ নানাবিধ রূপ ধারণ করে। পণ্ডিতেরা বলেন যে, শাস্ত্রে যত প্রকার প্রমাণ প্রমেহ ব্যবহার আছে, তৎসমস্তই এই অধ্যাস অবলম্বন করিয়াই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এই ভেদজ্ঞানের কারণীভূত অধ্যাস অপসারিত হইলে আর সে নানাবিধত্ব থাকে না, তখন সকলই সেই এক অদ্বিতীয় বস্তুতে বিলীন হয় এবং এই একত্ব অনুভূতিই পারমার্থিক, অর্থাৎ পরমার্থ সত্য।

শিষ্য। অধ্যাস বা অধ্যারোপটা ভাল বুঝিলাম না। বস্তুতে অবস্তু আরোপ কিরূপে হয়?

গুরু। অধি আরোপ কিনা উপর আরোপ; অর্থাৎ অধিষ্ঠানে বা সম্মুখে অবস্থিত বস্তুতে অবস্তু বা অসৎ বস্তুর আরোপ বা অবভাস বা মিথ্যাজ্ঞান; অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নহে তাহাই বোধ হওয়া; যেমন শুক্তি বা ঝিনুককে রৌপ্য মনে করা। তোমার সমক্ষে রৌপ্যের নাম গন্ধ নাই অথচ ঈষদন্ধকারে ভ্রমজ্ঞান বশতঃ শুক্তিটা রৌপ্যখণ্ড মনে হয়, অর্থাৎ রৌপ্যরূপে অবভাসিত হয়, যাহা রৌপ্য নহে তাহাকে রৌপ্য মনে করা হয়। সুতরাং বস্তুতে অর্থাৎ সত্য অধিষ্ঠানে অবস্তুর, কিনা অসত্যের আরোপ বা অধ্যাস, ইহাই অধ্যারোপ পদের অর্থ। ইহা দ্বারা এই বুঝা যাইতেছে যে, সত্য ও মিথ্যার মিথুনীভাবের অবভাস বা ভ্রমজ্ঞানই অধ্যারোপ বা অধ্যাস সংজ্ঞার অর্থ। শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানে রজতাভাস বা রজতের ভ্রমজ্ঞান আরোপিত হইতেছে, কিন্তু বিশেষরূপে দর্শনের পর প্রকৃত বস্তুর অর্থাৎ শুক্তির, সাক্ষাৎকার হয় এবং তদনন্তর রজত ভ্রান্তি নিবৃত্তি পাইয়া শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানের সত্যত্ব হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। ইহার প্রক্রিয়া এইরূপ; এইটী (শুক্তি না জানিয়া) রৌপ্য এই রৌপ্যাদি অবিচ্ছিন্ন চৈতন্য-নিষ্ঠ অজ্ঞান প্রথমে স্বীয় "আবরণ" (envelopment) শক্তিদ্বারা শুক্ত্যাদিকে "আবৃত" করিয়া স্ববিষয়ীভূত করে, পরে স্বীয় বিক্ষেপ (projection) শক্তিদ্বারা স্বরূপকে শুক্তি প্রভৃতির উপর বিক্ষিপ্ত করিয়া শুক্তি প্রভৃতির রজতরূপে বিবর্ত্ত

(apparent change) বা রূপের অপ্রকৃত পরিবর্ত্তন সাধন করে এবং তখন উক্ত শুক্তিকা প্রভৃতি রজতরূপে প্রতিভাসমান হইতে থাকে। এইরূপে ব্রহ্মানুগ মায়া বা অবিদ্যা সংজ্ঞক অজ্ঞান স্বীয় আবরণ শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম বস্তুকে নিজ বিষয়ীকৃত করিয়া আবরণ করে এবং তদনন্তর বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা স্বরূপকে তদুপরে বিক্ষিপ্ত (project) করিয়া তাঁহার প্রকৃত রূপের বিবর্ত্ত সাধন করে; সেই ব্রহ্মবস্তুই মহত্তত্ব, অহঙ্কারতত্ব প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি-তত্ব বা আকাশাদিরূপে অবভাসিত হইয়া থাকেন।

শিষ্য। বস্তুর লক্ষণ কি এবং এই জগৎপ্রপঞ্চ কিরূপ অবস্তু?

গুরু। যাহার ত্রিকালে, অর্থাৎ ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে, অপায় অর্থাৎ ধ্বংশ নাই তাহাই বস্তু। এই ত্রিকালীনপায়িত্ব কেবলমাত্র এক বস্তুতেই দৃষ্ট হয়, আর কোথাও নহে; সুতরাং ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয় বস্তু; আর সকলই অর্থাৎ অজ্ঞানাদি ও তাহার কার্য্যজাত জগৎপ্রপঞ্চ, অবস্তু। তবে একটী কথা আছে; এই জগৎ প্রপঞ্চের পারমার্থিক সত্যত্ব না থাকিলেও, যতক্ষণ জীবের সংসার দশা থাকে, ততক্ষণ এই জগৎপ্রপঞ্চের ব্যবহারিক (conventional) সত্যতা স্বীকার করিতে হয়।

শিষ্য। এতক্ষণে অধ্যারোপ প্রক্রিয়াটা বেশ বুঝিয়াছি। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, অধ্যারোপ সর্ব্বত্র একই প্রকার কি বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে?

গুরু। অধ্যারোপ চারি প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—সাদি অধ্যারোপ, অনাদি অধ্যারোপ, তাদাত্ম্য অধ্যারোপ ও সংসর্গ অধ্যারোপ। সাদি বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে সাদি অধ্যারোপ বলে, যেমন শুক্তিতে রজতত্ব অধ্যাস বা রজ্জুতে সর্পত্ব অধ্যাস। অনাদি বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে অনাদি অধ্যারোপ বলে; যেমন ব্রহ্ম বস্তুতে অজ্ঞান ও অজ্ঞানধর্ম্ম আরোপ; যতকাল জীব ও জগৎ ততকাল এই অধ্যাস চলিয়া আসিতেছে ও থাকিবে; সুতরাং এইরূপ অধ্যাস অনাদি ও অনন্ত। অবস্তুকে বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে তাদাত্ম্য বা তদ্রূপতা অধ্যারোপ হয়; যেমন "এই আমি" অর্থাৎ এই যে শরীরী পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, "এই আমি" যেন এই দেহটাই "আমি।" এ স্থলে প্রকৃত আমি যে আত্মা, তাহার অস্তিত্ব বা ভাব দেহের উপর আরোপিত হইতেছে; সুতরাং ইহা তাদাত্ম্য বা তদ্রূপতা অধ্যারোপ। অতি নিকট সম্বন্ধ বশতঃ যে

অধ্যাস হয় তাহাকে সংসর্গ অধ্যারোপ কহে; যেমন "আমার দেহ"। প্রকৃতপক্ষে দেহটা আমার নহে; প্রকৃত যে "আমি" তাহার আধার মাত্র। এই চারি প্রকার অধ্যাস সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সংসারে আর একপ্রকার অধ্যাসও দেখা যায়। তাহাকে আহার্য্যাধ্যাস বা আহার্য্যারোপ বলে। শাস্ত্রবিধি উদ্ভাবিত ইচ্ছাদ্বারা যে অধ্যাস প্রসাধিত হয়, অর্থাৎ একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপিত হয়, তাহাকে আহার্য্যারোপ কহে; যেমন শালগ্রাম শিলাতে বিষ্ণুত্ব আরোপ।

শিষ্য। অধ্যারোপ ও অধ্যাস একই; ইহার আর কোন নামান্তর আছে কি?

গুরু। হাঁ, আছে বৈকি। বেদান্ত পুস্তকে অধ্যারোপের এই কএকটী পর্য্যায়ান্তর দৃষ্ট হয়; যথা—আরোপ, ভ্রান্তি বা ভ্রমজ্ঞান, অধ্যাস, বিপর্য্যাস ও বিপর্য্যয়।

শিষ্য। জগৎপ্রপঞ্চ কথাটা অনেকবার শুনিলাম; জিনিষটা কি?

গুরু। এটা আর বুঝতে পারলে না বাপু! আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত, অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে দূর্ব্বাগুচ্ছ পর্য্যন্ত যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সমস্তকেই জগৎপ্রপঞ্চ, প্রপঞ্চ, সংসার ও জগৎসার বলে। এ সমস্তই অবিদ্যাসম্ভূত বলিয়া জানিবে। ইংরাজী দর্শনে ইহার সংজ্ঞা Cosmos.

শিষ্য। ইহার আর প্রকার ভেদ নাই?

গুরু। আছে বৈকি। স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণসমূহের সমষ্টিকে মহাপ্রপঞ্চ (cosmos) নাম দেওয়া হইয়া থাকে। বাহ্যপ্রপঞ্চ (macrocosm বা universe) ও আন্তর প্রপঞ্চ (microsm বা man) তাহারই অবান্তর বিভাগ (subdivision) মাত্র। "বিয়ৎপবনতেজোম্বুভুবঃ" বা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথ্বী, এই পঞ্চভূত ও তজ্জন্য ব্রহ্মাণ্ড এবং তদন্তর্গত চতুর্দ্দশ লোক, যথা—ভূর্ভুবঃস্বর্মহর্জনস্তপঃ সত্যং (এই উর্দ্ধলোক সপ্তক) ও অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল (এই অধর্লোক সপ্তক) এবং তন্নিষ্ঠ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিবধ ভূতগ্রাম বা স্থূল-শরীর, এই সকল যথাযোগ্য বিবিধ নাম, রূপ (form), গুণ, ধর্ম্ম ও শক্তির আশ্রয়ীভূত সমস্তই বাহ্যপ্রপঞ্চ বা বহির্জগত (macrocosm)। অন্ন-ময়াদি পঞ্চকোষ, শরীরত্রয়, অস্তিতা প্রভৃতি ছয়প্রকার ভাববিকার, ত্বক্, মাংস প্রভৃতি ষট্‌কোষ, অশনায়াপিপাসা (ক্ষুধা, পিপাসাদি) ছয় ঊর্ম্মি;

শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু; মন আদি অন্তঃকরণ চতুষ্টয়; সংকল্পাদি অন্তঃকরণ বৃত্তি চতুষ্টয়ঃ জাগ্রদাদি অবস্থা-ত্রয় এবং তদ্ব্যাপার ও তদভিমানী বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ; সমাধি, মূর্চ্ছা ও মরণ; কামাদি অরিষড়বর্গ; সাধন চতুষ্টয়; সাত্ত্বিকাদিত্রয়; সুখ দুঃখ, ও অজ্ঞানাদি ক্লেশপঞ্চক; মৈত্র্যাদি চতুষ্টয়, যমনিয়মাদি যোগাঙ্গাষ্টক; প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ চতুষ্টয় এবং রোগারোগ্যাদি সমুদায় যথাযথ বিবিধ নাম রূপ, গুণ, ধর্ম্ম ও শক্ত্যাদির আশ্রয়কে আন্তর প্রপঞ্চ (microcosm) বা আন্তর জগৎ কহে। ইহার মধ্যে অনেক কথা সংক্ষেপে বলিবার জন্য "আদি" ও "প্রভৃতি" শব্দের সাহায্য লইয়াছি, সে সকল যথাস্থানে সম্পূর্ণ করিব; ব্যস্ত হইও না।

শিষ্য। আজ্ঞা, না। আমার ব্যস্ত হইবার কিছুই নাই; আপনি যখন আরম্ভ করিয়াছেন, তখন আমি নিশ্চয় জানি আমি যতক্ষণ না বুঝিব, ততক্ষণ আপনি বিরত হইবেন না। বেদান্তের কথা বলিতে তো আপনার ক্লান্তিবোধ নাই।

গুরু। বাবা, জগতে যদি কিছু থাকে তো তাহা বেদান্ত; বেদ বলিতে জ্ঞান, তাহার অন্ত, অর্থাৎ চরম হইল বেদান্ত। এই বেদান্তের কথা বলিতে আবার ক্লান্তি। তবে এক্ষণে স্নান ও মাধ্যাহ্নিকের সময় হইয়াছে, এখন এই পর্য্যন্ত থাক। আবার সন্ধ্যার পর আরম্ভ করা যাইবে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সরকার।

বিজয়া-দশমী।

জয় দুর্গে! জয় দুর্গে! জয় দুর্গে! মা! আজ বিজয়া দশমী। বৎসরের অতি শুভদিন। মন! আজ প্রাণ ভরিয়া "জয় দুর্গা" "শ্রীদুর্গা" বল। আজ মনের সাধে মাতৃনাম জপ কর, অন্তরে মাতৃরূপ ধ্যান কর। আজ শ্রীদুর্গা নাম গুণ গানে বিভোর হইয়া নৃত্য কর; এই বলিয়া জনৈক সাধক গাহিতে লাগিলেন—

"বলরে শ্রীদুর্গা নাম।

দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে পথে চলে যায়, শূল হস্তে মহাদেব রক্ষা করেন তায়॥

শঙ্করী হইয়া মাগো গগনে উড়িবে, মীন হয়ে রব জলে নখে তুলে লবে॥
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যাবে এ পরাণী, সে সময়ে দিও রাঙ্গা চরণ দু'খানি॥
যখন বসিয়ে মাগো শিব সন্নিধানে, বাজন নূপুর হ'য়ে বাজিব চরণে॥
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি মা সকল ;
তোমা হতে ব্রহ্মা বিষ্ণু, দ্বাদশ গোপাল॥"

মায়ের সাধক সন্তানগণের আবাহনে আদ্যাশক্তি জগজ্জননী প্রসন্না হইয়া তাঁহার শ্রীদুর্গামূর্তিতে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী দিবসত্রয় সন্তানগণের নিকট যেন বিশেষ ভাবে সাক্ষাৎ উপস্থিত। মায়ের কৃতি সন্তানগণ যেন বৎসরান্তে মাকে সাক্ষাৎ সমীপে পাইয়া এই কয়দিন মনের সাধে নানা উপচারে প্রাণ ভরিয়া পূজাদি সমাপনপূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞানে আনন্দে নিশিদিন যাপন করিতেছেন। এদিকে নবমীর নিশাশেষে পুরোহিতগণ মায়ের মঙ্গল আবত্রিক করিতে লাগিলেন। বাদকগণ যথাসময়ে স্ব স্ব যন্ত্র বাজাইয়া তাহা চৌদিকে ঘোষণা করিল। দেখিতে দেখিতে মহানবমী নিশির অন্তর্ধান হইল ও বিজয়া দশমীর সুপ্রভাত। নহবৎ বাদকগণ প্রভাতি বাজাইয়া সকলকে জাগরিত করিতে লাগিল।

আজ বিজয়া দশমী। পূজাবাটীতে আজ সব নূতন ভাব। যে মাকে গত দিবসত্রয় কত যত্নে, কত উপচারে, ভক্তিভাবে পূজা করা হইল, আজ কিনা সেই মাকে পুরোহিত বিসর্জ্জন দিবার আয়োজন করিতেছেন। সাধকের দৃষ্টি ঐদিকে পড়িবামাত্র তাহার প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। সাধক দেবী প্রতিমার দিকে চাহিয়া মায়ের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছেন আর ভাবিতেছেন যে, মা কি সত্য সত্যই সন্তানকে ফেলিয়া স্বধামে যাইবেন! না—না। তা হইতেই পারে না। তাঁহার ইচ্ছা নয় যে মা'কে এখন ছাড়িয়া দেন। যাঁহাকে পাইয়া এত আনন্দ, তাঁহাকে সহজে ছাড়িয়া দিতে কাহার প্রাণ প্রস্তুত হয়! কিন্তু তিনি যে মায়াময়ী মহামায়া! কৌশলে সন্তানকে ভুলাইয়া যাইবেন।

বিজয়া-দশমীতে মায়ের পূজাদির আজ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। দধি কড়মা প্রস্তুত। পুরোহিত যথাসময়ে যথাবিহিত মন্ত্রে তাহা মহামায়া জগদম্বাকে নিবেদন করিবেন এবং ব্রহ্মময়ী মাকে তাঁহার প্রতিপাদ্য প্রতিমা হইতে বিদায় দিবেন। সাধক একদৃষ্টে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। সহসা মনের আবেগে মাকে বলিতেছেন—

না মা! তুমি এখন যাইতে পারিবে না। মাগো! কোন প্রাণে তুমি ছেলেকে কাঁদাইয়া স্বধামে (কৈলাসে) যাইবে? মাগো! এ ঘর কি তোর মন্দির নয়? যদি এ ঘর তোর মনোমত না হয়, ইচ্ছাময়ী মা! করুণ-কটাক্ষে এ মন্দির তোর মনোমত ক'রে নেনা মা। এ অধম সন্তানকে আর কাঁদাস নে মা। এইরূপ বলিতে বলিতে সাধক মায়ের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। এদিকে পুরোহিত যথাবিধি মাকে দধি কড়মা নিবেদন করিয়া দিলেন এবং যথাসময়ে দেবীর বিসর্জ্জন ক্রিয়া সমাপন করিলেন। সাধকের দৃষ্টি মায়ের শ্রীমুখমণ্ডলে, আর কোন সাড়া শব্দ নাই, যেন তন্ময় হইয়া মাতৃরূপ দর্শন করিতেছেন। সাধকের তখন বোধ হইতে লাগিল, মা যেন অন্তরীক্ষে শিবলোকে যাইতেছেন এবং তাহার (সাধকের) দেহ হইতে তাহার মন প্রাণ স্বতন্ত্র হইয়া মায়ের পাছু পাছু ছুটিতেছে। তাহার এবম্বিধ অবস্থা দর্শনে মা দাঁড়াইলেন এবং তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেছেন—বাবা! কেন পাছু পাছু আসিতেছ? তোমার মনোবাঞ্ছা ত পূর্ণ করিয়াছি। গত তিন দিবস তোমার পূজা গ্রহণ করিয়া তোমাকে কৃতার্থ করিয়াছি। আজও দধিকড়মা গ্রহণ করিয়াছি। এই দেখ এখনও আমার হাতে লাগিয়া রহিয়াছে। যখন বিসর্জ্জন মন্ত্রে তোমার পুরোহিত আমায় বিদায় দিল, তখন সে ভাবে আর কিরূপে থাকি, সুতরাং এখন শিবলোকে যাইতেছি। বৎস! তুমি ক্ষোভ করিও না। আমি ত তোমা ছাড়া নাই; আমি ত তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছি। বৎস! আমি কি আমার সন্তানগণকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি! সর্ব্বত্রই আমার অবস্থান। সন্তানেরা আমায় যখন সত্য সত্যই দেখিতে যায়, না দেখা পাইলে যখন তাহাদের প্রাণ অত্যন্ত অস্থির হয় এবং চতুর্দ্দিক শূন্যময় বোধ করে, তখনই তাহারা আমার প্রত্যক্ষ দর্শন পায়। ঐ দেখ, কৈলাসবাসিরা আমা বিহনে অধৈর্য্য। আমার দিকে তাহারা উৎফুল্ল নয়নে তাকাইয়া আছে। ঐ দেখ, সদাশিব আশুতোষ কৈলাসবাসিকে পূর্ব্বাহ্নে আমার আগমন সংবাদ ঘোষণা করিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন, এবং আনন্দে আমার সন্তানগণকে মহাসিদ্ধি পান করাইবার জন্ত আহ্বান করিতেছেন। যে সিদ্ধি পূর্ণবিশ্বাসে পান করিলে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। অতএব বৎস! এখন গৃহে যাও এবং তথায় যাইয়া আমার আর আর সন্তানগণকে এই শুভ সম্মিলন সংবাদ প্রদান কর এবং শিবপ্রদত্ত মহাসিদ্ধি প্রসাদ স্বরূপ গ্রহণ ও বিতরণ করিয়া ধন্য হও। মা অভয়া আবার অভয় দিয়া বলি-

লেন, এতদিন বৎস, তোমার হৃদয়েই ছিলাম। প্রত্যক্ষ পূজার বাঞ্ছা করিয়াছিলে, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। আবার হৃদয়ে আমার দেখা পাইবে।” এই বলিতে বলিতে দেবী অদৃশ্য হইলেন। সাধকের তখন চমক ভাঙ্গিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলায় শুনিয়াছি, যখন মহাভক্ত মথুরানাথ জগদ্ধাত্রী পূজার পরদিন দেবী প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষে বরণাদি সমাধা হইবার পর অত্যন্ত অধৈর্য্য হওত রোদন করিতে করিতে রামকৃষ্ণদেবকে বলিয়াছিলেন, “বাবা! আমার মা চলিয়া যাইতেছেন, আমি কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিব?” দয়াল ঠাকুর তখন মথুরবাবুর বক্ষোপরি হস্তার্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন “ভয় কি, আনন্দময়ী মা তোমার হৃদয়ে আছেন।”

সময় কাহারও হাত ধরা নয়। দেখিতে দেখিতে বিজয়-দশমীর অপরাহ্নকাল সমুপস্থিত। পূজাবাটীর দিকে চাহিয়া দেখ, যদিও তথায় বালক বালিকাদের কোলাহল বর্ত্তমান, তথাপি অন্তরে যেন সব ম্রিয়মান। যেন মহানন্দপূর্ণ হাট ভাঙ্গ ভাঙ্গ। পুরবাসি রমণীগণ ভক্তিভরে তেত্রিশ কোটী দেবদেবী মণ্ডিত মহিষমর্দ্দিনী দশভুজা দুর্গা প্রতিমাকে নানা ভাবে বরণ করিতেছেন, ও মনে মনে কত কি প্রার্থনা ও আবদার করিতেছেন, কেহ কেহ সাশ্রুনয়নে মায়ের কানে কানে বলিতেছেন “মা! আবার এসো মা!” এমনি করে আলো করে আবার এসো মা।” মা যেন প্রত্যক্ষ তাহাদের কথা শুনিয়া ত্রিনয়ন কমলের ভাস ভাস সকরুণ কোমল দৃষ্টিতে যেন তাহাদিগকে বরদানে সান্ত্বনা করিতেছেন। মাঙ্গলিক বরণ ক্রিয়াদি সমাধা হইলে প্রথানুযায়ী দেবীপ্রতিমা বিসর্জ্জনার্থে বাটী হইতে বাহির করা হইলে যেন পুরী এককালীন শূন্য বোধ হইল। চতুর্দ্দিক খাঁ খাঁ করিতে লাগিল।

এদিকে নরযানবাহি প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে বাটীর এবং পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ বনিতা প্রায় সকলেই নবসাজে সুসজ্জিত হইয়া কেহ অগ্রে কেহ পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল। মায়ের কৃতী সন্তানগণ স্থানীয় প্রচলিত প্রথানুসারে ভাগীরথী বক্ষে নৌকার উপর নানা বিচিত্রবর্ণ পতাকাদি বেষ্টিত চন্দ্রাতপ তলে মাকে বসাইয়া চামর ব্যজন করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বাদকগণ দর্শকগণের মনোরঞ্জনের জন্য তালে তালে নানারঙ্গে বাদ্য করিতে লাগিল। যেন অপরাহ্নের অবশ্যম্ভাবি প্রতিমা বিসর্জ্জন ভাব উদ্দীপনকারি ম্রিয়মানতা অন্তর্হিত হইয়া আনন্দময়ীর আনন্দ নবভাবে সন্তানগণের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিল। যেন বোধ হইতে লাগিল,

সন্তানেরা মায়ের সহিত কৈলাসধামে (শিবালয়ে) গমন করিতেছে। তাই এত আনন্দ।

এখন ভাগীরথীকুলের অপূর্ব্ব শোভা। ঘাটে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জনসমূহ বিবিধ সুন্দর বসন ভূষণে বিভূষিত হইয়া প্রফুল্লিত মনে কোথাও কাতারে কাতারে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মানপূর্ব্বক ভাগীরথীকুল অলঙ্কৃত করিতেছে ও গঙ্গাবক্ষে বিচরণশীল দেবী প্রতিমাদি দর্শন ও তদ্বিষয়েই কতই জল্পনা কল্পনা করিতেছে। কত যুবকবৃন্দ নৌযানে তান লয়ে গান করিয়া বেড়াইতেছে। চতুর্দ্দিকে আনন্দের স্রোত। সন্ধ্যা সমাগমে স্নান-ঘাট-তটে কর্ম্মী ব্রাহ্মণ সন্তানগণ সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছেন ও মায়ের এই আনন্দময় বিজয়োৎসব দর্শন সুখ অনুভব করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে ভাগীরথীবক্ষ বিচরণশীল নৌকাসমূহোজ্জ্বলিত আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে অধ্যক্ষগণ নৌকা হইতে যথানিয়মে দেবী প্রতিমাদি জাহ্নবী সলিলে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পবিত্র ব্রহ্মবারিপূর্ণ দেবীঘট লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ও যথাস্থানে তাহা রক্ষা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক সকলে শ্রীদুর্গা নাম লিখিতে লাগিলেন। পুরোহিত পূজাবাটীর উপস্থিত সকলকে শান্তিজল নিবেদিত সিদ্ধি ও মিষ্টান্ন প্রদান করিলে তাহারা পরস্পর তাহা গ্রহণ ও আদানপ্রদানপূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আজ হিন্দুর গৃহে গৃহে এক অপূর্ব্ব আনন্দ। অগণন তারকামণ্ডিত মহানীল চন্দ্রাতপতলে শারদীয় নিশানাথের সহাস্য জ্যোৎস্না-স্নাত জনপদ, নগর, পল্লী এই শুভ যামিনীতে যেন আনন্দে ভাসমান। এই শুভ বিজয়া-দশমীর শুভ সম্মিলন বিশদরূপে আস্বাদ করিবার জন্য প্রতি গৃহে গৃহে পরস্পর সকলে সকলকে স্থানীয় প্রচলিত যথারীতি আলিঙ্গনে বিমলানন্দানুভব, গুরুজনবর্গকে প্রণামান্তে পদধূলি গ্রহণ ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া শুভনিশি যাপন করিতে লাগিলেন। কোথাও বা যুবকবৃন্দ সুরসংযোগে সময়োপযোগী সংগীতালাপ করিতেছে। কোথাও বা সুরাপানাভ্যাসিগণ আজ আনন্দে কারণবারি পানান্তে প্রাণ খুলিয়া শক্তি-বিষয়ক গান করিতেছে। জনৈক মাতৃভক্ত কারণপানে প্রফুল্লিত হইয়া উপরোক্ত পূজাবাটীতে উপস্থিত হইয়া সকলকে যথারীতি নমস্কার, আলিঙ্গনে ও সিদ্ধি পানান্তে মাতৃনাম গান করিতে করিতে জগন্মাতাকে তাঁহার চিরবাঞ্ছিত শিবলোকে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিনদিনের পর যেন ভুলক্রমে

মূর্ত্তিতে আগমন করিতে দেখিয়া আনন্দে তাঁহার উদ্দেশে গাহিতে লাগিলেন—

"কে! মা এলিগো, গিরে দাদার বেটী।
(আমার উমা এলিগো), (আমার শ্যামা এলিগো)
দোনো ছোকরা বি সাথ, দোনো ছুকরী বি সাথ,
আর এক ব্যাটা ঝুলপি কাটা কামড়ে নিল টুটি॥
ওকে! মা এলিগো, গিরে দাদার বেটী॥

এ দিকে সাধক চতুর্দ্দিকে এই অপরূপ আনন্দোৎসবের মাঝে উক্ত গীত শুনিয়া যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদয় মাঝে এক ভাবের উৎস খুলিয়া গেল। একবার বা ভাবাবেশে হাসিতেছেন, একবার বা মা মা মা বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। এক একবার ভাবিতেছেন তিনি কোথায়? "শিবলোকে" না "ভূলোকে"? মধ্যে মধ্যে মায়ের আশ্বাস ও আদেশ বাণী যখনই স্মরণ হইতে লাগিল, তখন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া "জয় দুর্গা," "শ্রীদুর্গা" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং উক্ত গায়ক মাতৃভক্তকে ভক্তিভাবে আলিঙ্গন করিয়া মাতৃগুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকন করিয়া আপনাদিগকে ধন্যজ্ঞান করতঃ স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। সাধক একাকী শ্রীদুর্গামণ্ডপে দেবীঘট সমীপে উপবেশন-পূর্ব্বক হৃদয়মাঝে শ্রীদুর্গা-মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে ভাব সমাধিতে মগ্ন হইলেন।

ধন্য সাধক! তুমিই ধন্য! তোমাকে বার বার নমস্কার! ধন্য তোমার সাধনা! ধন্য তোমার প্রাণের টান! যে টানে জগন্মাতার গতি বন্ধ হয়। যে টানে জগন্মাতা পুত্রকে অভয় দিয়া বলেন যে, "আমি ত তোমা ছাড়া নই, আমি ত তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছি।" "আমি কি সন্তানগণকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি?" "সর্ব্বত্রই আমার অবস্থান।" মা! আর্ত্ত-জীবকুল-দুর্গতি-হারিণী দুর্গে! বিশ্বপ্রসবিনী জগদম্বে! তুমি তোমার সন্তানগণকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিবে মা! তুমি ত আর পাতান মা নও। তুমি যে আপনার মা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, তুমি "আপনার হইতেও আপনার।" মাগো! এ অধম সন্তানকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন সর্ব্বদা হৃদয়ে এই বিশ্বাস দৃঢ় জাগরূক থাকে যে, "তুমি মা আপনার হইতেও আপনার, আর চক্ষু দাও মা, চক্ষু দাও মা, যাহাতে দেখিতে ও অনুভব করিতে পারি যে মা, তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছ। তোমার কোল ছাড়া এক মুহূর্ত্তও নই। জয় মা দুর্গা। এস

ভাই বন্ধু আজ সকলে মিলিয়া প্রাণ ভরিয়া বলি, জয় মা আদ্যাশক্তি সনাতনী বরাভয়প্রদায়িনী চণ্ডীকা! জয় মা জগজ্জনপালিনী, ব্রহ্মময়ী জগদম্বা! জয় মা ভবভয়বিনাশিনী মহিষাসুরমর্দ্দিনী দশভুজা শ্রীদুর্গা! জয় শ্রীদুর্গা, শ্রীদুর্গা, শ্রীদুর্গা।

শ্রীসেবাদাস।

নিন্দা।

আমরা কোন অভিপ্রায়ে, কোন উদ্দেশ্যে এ কর্ম্মময় সংসার ক্ষেত্রে আসিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি? আমরা কি শুধু ত্রিতল অট্টালিকাভ্যন্তরে খট্টাঙ্গোপরি কাশ-পুষ্পসঙ্কাশ সুকোমল শয্যাপরি শয়ন করিয়া পরের দোষ চিন্তা করিবার জন্য আসিয়াছি? আমরা কি যেখানে সেখানে যার তার নিকটে না ভাবিয়া না চিন্তিয়া পরের কুৎসা কীর্ত্তন করিবার জন্য আসিয়াছি? এ সংসারে কি আমাদের পরের দোষ গুণের সমালোচনা ছাড়া আর কোন কর্ম্মই নাই? আছে, কিন্তু সেটী আমাদের উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই। কারণ, আমরা সত্ত্বগুণ পরিবর্জ্জন করিয়া রজঃ ও তমঃগুণের আশ্রয় লইয়াছি। সত্ত্বগুণাবলম্বী লোকই আপনার ন্যায় এ জগতের যাবতীয় প্রাণীকে দেখিয়া থাকেন, তিনি এ সংসারের কাহাকেই নিজের হইতে পৃথক্ দেখেন না।

আমরা পরের নিন্দা কেন করি? কেন আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা পর নিন্দার ইচ্ছা প্রণোদিত হয়? কেন আমরা সতত পরের দোষ অন্বেষণ করিবার জন্য ব্যাকুলান্তঃকরণে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হই? ইহার কারণ এই যে, আমরা নিজের চিনিতে পারি না। নিজের দোষ অনুসন্ধান করিতে জানি না। তামসিক লোকের প্রধান লক্ষণই ইহাই যে, সে সংসারের সমস্ত লোককেই নিজের হইতে স্বতন্ত্র দেখে। যে ব্যক্তি নিজের হইতে অপরকে বিভিন্ন দেখে, সে তাহার প্রতি নিন্দাবাণ বর্ষণ ব্যতীত মস্তকে যষ্টি প্রহার করিতেও কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ হয় না। সংসারে যত দুষ্কার্য্য, যত লোক অহিতকর কার্য্য, সমস্তই রজ ও তম গুণাশ্রিত লোক সমূহের দ্বারা সঙ্ঘটিত হয়। নিন্দা যে অতিশয় গর্হিত কার্য্য তাহা মনুষ্য মাত্রেই জানে। এইরূপ পাপ কার্য্যে যাহার রুচি জন্মে, সে যে নিতান্ত মূঢ় জীব তাহা জ্ঞানীমাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন।

সংসারে দোষ নাই কার? কে নিষ্কলঙ্ক? আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, অল্প বিস্তর দোষে সকলেই দোষী, সর্ব্বাংশসম্পূর্ণ নির্দ্দোষী

এ সংসারে খুবই বিরল। হে নিন্দুক! তোমার মতে যে কুৎসিৎ, আমার চক্ষে সে অতি সুন্দর। তুমি যাহার নিন্দা করিয়া নীচ অন্তঃকরণের পরিচয় প্রদান করিতেছ, অপর একজন তাহারই প্রশংসা করিয়া তাহারই যশোগান করিয়া দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, তুমি তোমার নিজের দোষ অনুসন্ধান করিতে জান না। মানুষের নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে অপরের কুৎসা করিবার বাসনা সমুদিত হয় না। যে পরের দোষ কীর্ত্তন করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, সে কখনই নিজের দোষ নিজের ত্রুটি অনুসন্ধান করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না—

"পরনিন্দা করে যেই, পরছিদ্র খোঁজে সেই।
আত্ম-দোষ সেই কভু দেখিতে না পায়॥"

তবে একথা ঠিক যে, মানুষ যে পর্য্যন্ত স্বীয় দোষ আলোচনা করিতে শিক্ষা না করে, নিজ দোষ অন্বেষণে রত না হয়, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই সে নিজ চরিত্র গঠন করিতে সমর্থ হয় না।

আজকাল আমাদের ধারণা ইহাই যে, পরের নিন্দা করিতে পারিলেই খুব বিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। শিক্ষার দোষে আমরা পরনিন্দাকে এতই ভালবাসিতে শিখিয়াছি যে কোথাও যদি কেহ কাহারও নিন্দা করে তাহা হইলে তথায় আমরা চিত্রপুত্তলিকার মত নির্নিমেষ নয়নে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ করিবার ন্যায় একাসনে উপবেশন করিয়া শ্রবণ করি। সুধীবৃন্দ! বুঝুন, আমাদের বুদ্ধি বিদ্যার দৌড় কত দূর। হে পরনিন্দুক! তোমার মতে চলিলে অবশ্য তুমি সন্তোষ হইতে পার একথা স্বীকার করি, কিন্তু তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি এই যে, তুমি কি এ জগতের আদর্শ জীব? তোমাতে কি কোন দোষই নাই? তুমি কি শুদ্ধ শান্ত, পরম পবিত্র নির্ম্মল চরিত্র সম্পন্ন মানুষ? তুমি হয়ত দুই চারি, দশজন মূর্খ লোকের মধ্যে বিজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য সত্যকে গোপন করিয়া বলিতে পার যে, হাঁ সত্য সত্যই আমাতে এ সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে, আমি বাস্তবিকই পরম বৈরাগী। কিন্তু জ্ঞানী লোকে বলিবে যে, তুমি যখন সদা সর্ব্বদা পর নিন্দা করিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিচয় প্রদান কর, তখন তুমি এ জগতের অদ্বিতীয় নিকৃষ্ট জীব।

পরনিন্দা লোকে কেন করে? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, নিন্দাকারী, পরনিন্দা করিবার পূর্ব্বে ইহাই মনে করে যে, অপরের

নিন্দা করিলে আমার সচ্চরিত্রতা, অপরকে দুই চারিটা গালাগালি দিলে আমার প্রধানত্ব, অপরের প্রতি দুই চারিটা বচন বিন্যাসপূর্ব্বক বিদ্রূপসূচক কথা বলিলে মূর্খ লোকের মধ্যে আমার খুব পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইবে। অনেক স্থলে নিন্দাকারীর এরূপ চাতুর্য্যমূলক অভীষ্ট সিদ্ধও হইয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে।

আজকাল অনেক নগণ্য হাম্ পম্মরায় বলিয়া থাকেন যে, নিন্দার কাজ করিলেই লোকে নিন্দা করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করি ভাই! নিন্দা করাটা—কি—কুৎসিৎ কার্য্য নহে? সেটা কি বড় ভাল কর্ম্ম? আমরা নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি যে, এ সংসারে যত প্রকার পাপ কার্য্য আছে তন্মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা ও পরনিন্দা করাই সমধিক মহাপাপ। জীব-জননী বসুন্ধরা বিশ্বাসঘাতকের এবং পরনিন্দুকের ভারবহন করিতে অসমর্থ, তাই তিনি সর্ব্বদাই ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন যে, হে ভগবন! আমি আমার পৃষ্ঠস্থিত যাবতীয় পর্ব্বত এবং সপ্ত সমুদ্রকেও ততদূর ভার বোধ করিতেছি না, যতদূর পরনিন্দুকের ও বিশ্বাসঘাতকের ভার বোধ করিতেছি—

"ন ভারা পর্ব্বতোভারা ভারা ন সপ্ত সমুদ্রাঃ।
নিন্দুকস্তু মহাভারা ভারা বিশ্বাসঘাতকাঃ॥"

হে ভূভারহরণ! তুমি অচিরে আমার এই অসহ্য ভার হরণ কর। দেখ, অহংমদে মত্ত পরনিন্দুক! তুমি ভ্রমান্ধকারে নিপতিত হইয়া সুধালাভ করিবার আশায় কি গরল সঞ্চয় করিতেছ।

সংসারে যে, নিন্দুক হয়, তাহার হাত হইতে সৎ অসৎ এমন কি ভগবানেরও নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। যে নিজে অসৎ, সে সংসারের প্রত্যেক লোককেই অসৎ বিবেচনা করে। সে সাধুকেও যে চক্ষে দেখে, অসাধুকেও সেই চক্ষে দেখে, তাই সে উভয়কেই সমান ভাবে নিন্দা করিয়া থাকে। এরূপ হওয়াটা আশ্চর্য্য নয়, কারণ যাহার যে প্রকার স্বভাব, তাহার সেই প্রকার স্বভাব সর্ব্বত্রই সমান ভাবে প্রকাশ পায়, যেমন বিষ্ঠাভোজী কুকুর, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের বিষ্ঠা নির্ব্বিচারে সমভাবে ভোজন করে।

হে বিশুদ্ধস্বভাব নিন্দাকারিন! আমরা যেন না হয়, শূকর স্বভাব সংস্থ জীব। আমরা কখনও সংসারের ধূলাকাদা গায়ে মাখিতেছি, আবার কখনও তাহা ধৌত করিতেছি, তাই তুমি দ্বৈধভাব পরিদর্শন করিয়া আমাদিগকে নিন্দা কর। কিন্তু যাঁহারা সাধুব্যক্তি, যাঁহারা সংসারের ধূলা কাদা হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যাঁহাদের অন্তর্নির্মল জ্ঞান জলে

বিধৌত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে স্থূলদর্শী মোহান্ধ জীব তুমি, কেন নিন্দা কর? তোমার নিন্দাবাণ হইতে কি কাহারই রক্ষা পাইবার কথা নাই? ভগবান নিজে কি আজকাল দোষ গুণের বিচার করিতে অসমর্থ হইয়াছেন? হাঁ ভাই! তাই কি তুমি আমাদের কার্য্যের সমালোচনা করিবার জন্য স্বর্গসুখে জলাঞ্জলি দিয়া এই অন্নকষ্টপীড়িত ভারতভূমে আগমন করিয়াছ? যাহা হউক, এ জন্মে তুমি সকলের নিকটেই প্রশংসার্হ।

ভাই নিন্দুক! তোমার মঙ্গলের জন্যে একটী কথা বলি যে, তুমি আর যাহাকে তাহাকে নিন্দা করিও, কিন্তু নিজ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, নিজ বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া, যাঁহারা ভগবৎ জ্ঞানে পরের সেবা পরের উপকার করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিন্দা করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কার করিওনা। ভগবানের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, তুমি তাঁহাদিগকে নিন্দা বা বিদ্রূপ কর। সাধারণ লোকের নিন্দা করা অপেক্ষা সাধুজনের নিন্দা সমধিক পাপ। তাই নীতিশাস্ত্রকারেরা সাধুলোকের কুৎসা করিতে নিষেধ করিয়াছেন— "ন নিন্দেৎসাধুনাং প্রাজ্ঞঃ।" সাধুলোকের নিন্দা করিয়া আত্মজীবন কলুষিত করা ভিন্ন কোনও লাভই নাই। সাধুলোকের নিন্দা বা তাঁহাদের কার্য্যের সমালোচনা করা না করা উভয়ই তুল্য কথা, কারণ তাঁহারা মনুষ্য বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করেন না। তাঁহারা আত্মাকেই ভগবান জ্ঞান করেন এবং আত্ম-বুদ্ধিকেই ভগবৎ-প্রেরিত বুদ্ধি বোধ করেন, তাই, তাঁহারা আত্ম-বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন—"আত্মবুদ্ধি শুভকরী," তাঁহারা লোক বুদ্ধির অতীত; তাঁহাদের বুদ্ধির এক কণা পরিমাণ বুদ্ধি, তোমার আমার আছে কিনা সন্দেহ। সাধু লোকের বুদ্ধি যখন দেবতারা পর্য্যন্তও বুঝিতে অসমর্থ, তখন অতি ক্ষুদ্র অতি জঘন্য নিকৃষ্ট জীব পর-নিন্দুক তুমি, তুমি বুঝিবে কিরূপে? "লোকোত্তরানি চেতাংসিকোহি বিজ্ঞাতুমর্হলি," তবে যদি কোনকালে গুরু কৃপাবলে তোমার এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, যদি তোমার প্রকৃত সত্বগুণের উদয় হয়, তাহা হইলে তখন বুঝিতে পারিবে যে, কাচভ্রমে কাঞ্চনের অনাদর করিয়া কি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি।

সাধুলোক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁহারা যে সঙ্কল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া সৎপথারূঢ় হইয়াছেন, সে সঙ্কল্প কিছুতেই পরিত্যাগ করিবেন না। যেরূপেই হউক, এমন কি যদি জীবন পণ করিয়া সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়, তাঁহারা তাহাই করিবেন। এরূপ অবস্থায় নিন্দা করিলে, হে নিন্দুক! তোমার কোন অভীষ্টই পূর্ণ

হইবে না। আর নিন্দার যোগ্যই বা তাঁহারা কোন কার্য্য আচরণ করিয়া থাকেন যে তাঁহাদের কুৎসা কীর্ত্তন করিয়া রসনার লালসা নিবৃত্ত কর? যাঁহারা সাধু তাঁহাদের সমস্তই সৎ, অসৎ কোন পদার্থই তাঁহাদের নিকটে থাকিতে পারে না। আলোক জ্বালিলে যেমন গৃহাভ্যন্তরস্থ অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেইরূপ সৎ পথারোহণ করিবামাত্রই মানুষের হৃদয় মন্দিরে সচ্চিদানন্দ আলোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সে আলোক জ্বলিলে তথায় আর কোন অসৎ ভাবই থাকে না।

সাধু লোকের চরিত্র আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক যে তাঁহারা নিন্দাকারীর নিজের চক্ষেই দোষী না জগৎবাসী সকলের চক্ষেই দোষী, এই কার্য্যটী বিশেষ জ্ঞান সাপেক্ষ। সংসারে যাহারা বিশ্বনিন্দুক হয় তাহারা স্বভাবতই জ্ঞানান্ধ। তাহারা যদি জ্ঞান চক্ষুবিহীনই না হইবে, তাহা হইলে তাহারা পরনিন্দা বিশেষতঃ সাধু নিন্দা করিয়া মহাপাপ সঞ্চয় করিবে কেন?

ভাই নিন্দুক! তোমার হিতের জন্যই বলিতেছি যে এখনও সাবধান হও। তুমি আর সাধুগণের ভয়ের কারণ হইও না। "সাধূনাং দুর্জ্জনাদ্ভয়ং," তুমি এই মুহূর্ত্তে পরনিন্দা পরিবর্জ্জন কর, কে ভাল, কে মন্দ, এ অনুসন্ধিৎসা পরিহার কর। তুমি আর ব্রণান্বেষী মক্ষিকার ন্যায় পরের দোষ খুঁজিয়া খুঁজিয়া মহৎ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ দুর্ল্লভ মনুষ্য জীবনকে অধঃপথে পতিত করিওনা। লোকে প্রথমে বুঝিতে না পারিয়া সংসর্গ দোষে কুপথে চলিয়া যায় বটে, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইলেই অবশ্য ভালমন্দ বুঝিতে পারা যায়, বুঝিতে পারিলে আর সে পথে যাওয়া উচিত হয় না, সেস্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়াই বুদ্ধিমানোচিত কার্য্য। তাই বলি, ফিরিয়া এস, আসিয়া যে সমস্ত সাধুবৃন্দকে নিন্দাবাণে জর্জ্জরিত করিয়াছ, তাঁহাদের চরণে শরণ লও। অবশ্য তাঁহারা তোমার কৃত সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, যেহেতু ক্ষমাই তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম্ম "ক্ষমাসারাহি সাধবঃ।" তুমি যে কোনরূপেই হউক যদি তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভ করিতে পার, তাহা হইলে, তাঁহারা ত্রিজগৎ বিনিন্দিত শ্যামচাঁদকে দেখাইয়া দিয়া তোমার জন্ম ও জীবন সার্থক করিয়া দিবেন। তাঁহাকে দেখিলে তোমার পরনিন্দা করিবার প্রবৃত্তি মার্জ্জারদৃষ্ট মূষিকের ন্যায় দূরে পলায়ন করিবে।

শ্রীকাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য।

প্রার্থনা।

ওগো,

কি আছে আমার
দিতে উপহার
তোমার অতুল পদে,
তবু নিরবধি—
এ আকুল হৃদি
তোমারে পূজিতে কাঁদে।

ভগ্ন হৃদিযন্ত্রী
ছিন্ন প্রাণতন্ত্রী
কেমনে গাহিব গান!
তবু বাজে ধীরে
হৃদয় কন্দরে
তোমার মহিমা তান।

যদিও স্খলিত
মন অবিরত
রত স্বার্থ অন্বেষণে,
তব সুখ-স্মৃতি
করে অনুভূতি
প্রতি পদ সঞ্চালনে।

অলস নয়ন
যে দিকে যখন
লালসা বিলাসে চায়,
তোমার মধুর
লাবণ্য লহর
সে দিকে উছলি যায়।

প্রশংসা কীর্ত্তন
করিতে শ্রবণ
কর্ণ অনুক্ষণ ধায়,
তোমার অশেষ
কল্যাণ আদেশ
নাহি শুনিবারে পায়।

আমি অমুকণা,
বুদ্ধি মম ক্ষীণা,
বুঝিনা স্বরূপ তব,
এই মাত্র জানি,
দেখেছি অবনী,
তোমার কৃপায় দেব।

অসীমের পথে,
অনন্তের পদে,
কিবা উদ্দেশ্য মহান্,
গন্তব্য কোথায়
জীবন যাত্রায়
জানি নাহে বিশ্বপ্রাণ।

তুমি ধ্রুবতারা,
আমি পথহারা,
সুপথে চালায়ে নেও,
রিপুজয়ী শক্তি,
তবপদে ভক্তি,
সৎ অনুরক্তি দেও।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

বিগত ৫ই অগ্রহায়ণ ইংরাজী ২১এ নবেম্বর রবিবার জগদ্ধাত্রী পূজার দিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সেবক মহাত্মা রামচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে কাঁকুড়গাছী যোগস্থানে কাঙ্গালী ভোজন ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে অনেক ভক্ত সমবেত হইয়া সমস্ত দিবস ঠাকুরের নাম কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন। প্রায় চারি পাঁচশত কাঙ্গালীকে পরিতোষরূপে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

আগামী ১৬ই পৌষ শুক্রবার ইং ১৯১০ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারীর দিন কটকে কালীগলিস্থ বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু উৎসব হইবে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশঘটিকা পর্য্যন্ত ভোগ, আরত্রি এবং পূজাদি চলিতে থাকিবে। রাত্রিতে বিশেষ পূজাদি হইবে। বৈকালে 'দরিদ্র-নারায়ণ'গণের যথাসম্ভব সেবাও করা যাইবে। আমাদের সবিনয় নিবেদন আপনারা সবান্ধবে যোগদান করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

পৌষ, সন ১৩১৬ সাল।

ত্রয়োদশ বর্ষ, নবম সংখ্যা।

বন্দনা।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

কে তুমি মা করুণারূপিণি!
কাঙ্গালে করিলে কৃপা শুনায়ে আশার বাণী॥
বড় দুখী বোলে কি মা, সন্তানে করিলে ক্ষমা,
শত অপরাধে তারে, দিলে মা ঐ পা দু'খানি॥
এত দয়া, এত ক্ষমা, চোখে জল আসে যে মা,
স্মরিয়ে শ্রীমূর্ত্তি শ্যামা, রামকৃষ্ণ বলি আমি;—
খুলে দাও এই আঁখি, তোমাতে মা তাঁরে দেখি,
অথবা তুমিই সেই মা, গুরুরূপা হে জননি!

সেবক—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

পওহারী বাবা।

দশম পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৬১ পৃষ্ঠার পর)

পওহারী বাবা আজীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী আচারী বৈষ্ণব-শ্রেণীভুক্ত নিষ্ঠাপরায়ণ মহাযোগী ছিলেন। ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। প্রত্যেক মনুষ্যকেই একমাত্র ভগবানের অংশ মনে করিয়া প্রণত হইতেন। কখনও কাহাকে শিষ্যত্বে বরণ করেন নাই। একবার বাবু রামেশ্বর প্রসাদ নামক কায়স্থজাতীয় একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ আকুল হন, কিন্তু পওহারী বাবা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, তাঁহার ভক্তি ও অনুরাগে আবদ্ধ হইয়া আজিমগড়নিবাসী পণ্ডিত রামাচারীজীর দ্বারা নিজে উপস্থিত থাকিয়া প্রয়াগে তাঁহাকে দীক্ষিত করাইলেন। রামেশ্বর প্রসাদ সে সময়ও বার বার বলিয়াছিলেন যে, রামাচারীজীর সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, আমার গুরু আপনি, আপনার অনুমতি পালনের জন্য রামাচারীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতেছি। বাবু রামেশ্বর-প্রসাদ অত্যন্ত তেজস্বী সৎস্বভাব ও ত্যাগী-পুরুষ, এবং পওহারী বাবার অতি প্রিয়-সেবক। ইনি এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়া পেন্‌সন লইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক বারাণসী ধামে সাধন ভজনে নিরত আছেন।

পওহারী বাবা কথন কথন এই ধর্ম্মমত প্রকাশ করিতেন যে, পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি অনুসারে ও ঈশ্বর কৃপায় মনুষ্য, যখন বর্ণ এবং আশ্রম প্রাপ্ত হইয়া আপনার ধর্ম্মে নানা প্রকার সদানুষ্ঠানপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে অন্তরের মলিনতা ধৌত করে, তখন সেই বিশুদ্ধ অন্তরে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞানে নিষ্ঠা ও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে সংসার কালিমা ধৌত হইয়া যায়, অর্থাৎ মায়া ভ্রম আসক্তি বিদূরিত হইয়া অন্তর ধর্ম্ম-সাধনের পবিত্র ক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়, এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে অনুভব করিয়া তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করে।

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

দেবভাব সমূহের প্রেরক যিনি, মায়া এবং ভ্রম ও তাঁহারই প্রেরিত এবং জীব তাঁহার অংশ। আপনাকে অকিঞ্চন জানিয়া আর সমস্ত, ব্রহ্মাণ্ডকে ঈশ্বর প্রেরিত ভাবিয়া, স্বস্বরূপ (যাহাকে ঈশ্বরের অংশ বলা যায়) পর-স্বরূপে (যাহাকে পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম বলা হয়) চিত্তসংযোগ করিলে তৃপ্তি ও মুক্তিলাভ

হয়। গৃহী ব্যক্তি সর্ব্বদা দীন দুঃখী ব্রাহ্মণ অতিথি সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

পওহারী বাবা কখনই আচার্য্যরূপে শিক্ষা দিতেন না। কথার ছলে মাঝে মাঝে উপদেশ বাক্য কহিতেন। অনেক অনুনয় বিনয় করাতে শেষে এইরূপ সাধনের যুক্তি প্রকট করিয়াছিলেন ;—

সাধক ব্রহ্মবাচক ওঁ শব্দ দীর্ঘ ও উচ্চ ব্যাহরণ (উচ্চারণ) করিবেন। ঐ সময়ে অন্তরে মহাতেজোময় (কোটীসূর্য্যপ্রভ) সর্ব্বব্যাপক স্বরূপে ডুবিয়া থাকিবেন। এইরূপে নাদ দ্বারা ধ্যানমগ্ন হইয়া, সাধক আত্মহারা হইয়া ব্রহ্মময় হইতে চেষ্টা করিবেন।

কোনও তত্ত্বজিজ্ঞাসু প্রশ্ন করেন যে, ধ্যান কাহাকে বলে, আমরাত চক্ষু মুদ্রিত করিলেই অন্ধকার দেখি।

পওহারী বাবা বলিলেন, যাঁহারা চক্ষু মুদ্রিত করিলে বাহিরের চিন্তা সকল বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র অন্ধকার দেখেন, তাঁহাদের সংযত মন সাধনের উচ্চ ভূমিতে নীত হইয়াছে, কারণ অন্ধকারের পরেই জ্যোতির প্রকাশ হয়, অসংযতচিত্ত ব্যক্তিরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বহির্জ্জগতেরই নব নব চিন্তা মানস-ক্ষেত্রে সৃজন করিয়া থাকে।

পওহারী বাবা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়স্থ সাধুগণের প্রতি পরম ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ সমাদরে পাঠ করিতেন, তিনি হিন্দি, তৈলঙ্গি, সংস্কৃত, ও বাঙ্গালা ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। নববিধানে সমাজের আচার্য্য মহাত্মা ৺ শ্রীকেশবচন্দ্র সেন, পরমভক্তিভাজন ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি অনেকেই পওহারী বাবার দর্শন লাভার্থে আসিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মালাপ করিতেন, তিনিও সকলের প্রতি সমান ভক্তি ও সমাদর প্রকাশ করিতেন।

পওহারী বাবা শৈশবকাল হইতেই শান্তস্বভাব ও কোমল প্রকৃতি ছিলেন বলিয়া তিনি যে একবারে ক্রোধশূন্য ছিলেন তাহা বলা যায় না, কিন্তু অসাধারণ সাধন বলে সেই ক্রোধ দমন করিয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে যখন তিনি কুটীরের দ্বার রোধ করেন নাই, তখন একটী কৌতুককর ঘটনা হয়। রথের দিনে দেবমূর্ত্তি রথের উপর বসাইয়া রথ টানা হইতেছে আর তিনি রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন, কিন্তু দর্শক বৃন্দের সকল আকর্ষণে রথ

হেলিয়া যায় ও ঠাকুর মাটিতে পড়িয়া গেলেন, তখন আবার ঠাকুরকে রথে বসাইয়া পওহারী বাবা দর্শকবৃন্দকে দ্রুতগতিতে রথ টানিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহাদের আগ্রহ নিবারিত হইল না, প্রবল উৎসাহে আকর্ষণ করিবা-মাত্র পুনরায় ঠাকুরসহ রথ ভূমে পতিত হইল। তখন তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, উপস্থিত লোকদিগকে কহিলেন, বাবা সকল রথরজ্জু পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র কুঠার আনয়ন কর, এবং এই মুহূর্ত্তে রথ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল। যদিও দর্শকগণের মধ্যে প্রায় সকলেরই বিশ্বাস যে রথরজ্জু আকর্ষণে মুক্তি ও রথের বিনাশে মহাপাতক সঞ্চারিত হইবে, তথাপি সেই মহাতেজা ঋষিবাক্য হেলন করিতে কাহারও সাহস হইল না, সভয় অন্তরে যন্ত্রবৎ তাহারা কুঠার আনয়নপূর্ব্বক রথ কাটিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। এখনও রথের উপর ঠাকুরের বসিবার সিংহাসনে কুঠারাঘাতের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

তখন পওহারী বাবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গা তেওয়ারী অনেক মিনতি করিয়া কহিলেন যে, মহারাজ! আপনি আজি ক্রোধবশে যাহা করিবেন, তৎসম্বন্ধে লোকে আমাকেই দোষী বলিবে, আপনার দোষ কেহ গ্রহণ করিবে না, আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি, রথ বিনষ্ট করিবেন না, কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনিবেন না, তখন গঙ্গা তেওয়ারী একটী ঘটিমাত্র হস্তে লইয়া আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গঙ্গাতেওয়ারী আশ্রম পরিত্যাগ করিলে, পওহারী বাবা রথ বিনষ্ট করিবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠের অনুসন্ধানে সকলকে প্রবৃত্ত করিলেন, সমস্ত গ্রাম অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সন্ধান মিলিল না। যদি তিনি গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়া থাকেন, এই আশঙ্কায়, জলে জাল ফেলিয়া দেহ অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে পাওয়া গেল না, গঙ্গাতেওয়ারী একেবারে পদব্রজে অযোধ্যায় চলিয়া গিয়াছিলেন। সন্ধান পাইয়া সেখান হইতে তাঁহাকে জৌনপুরস্থ প্রেমাপুর গ্রামে তাঁহার বাস ভবনে আনয়ন করা হয়। প্রায় ৬।৭ মাস কাল পরে পওহারী বাবা লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে আশ্রমে ফিরাইয়া আনেন।

পওহারী বাবা যখন প্রায় সার্দ্ধ চারি বৎসরকাল দ্বার রুদ্ধ করিয়া সাধন ভজনে নিরত ছিলেন, তখন তিনি আশ্রম অভ্যন্তরে কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই, এই দীর্ঘকাল অনশনে কিরূপে তাঁহার শরীর রক্ষা পাইয়া

ছিল, সাধারণের বিস্ময় জন্মিতে পারে। এ সম্বন্ধে একটী কথা উল্লেখ করা যোগ্য বোধ হইল। পিতৃব্যের পরলোক প্রাপ্তির পরে যখন তিনি তীর্থ সকল ভ্রমণে বাহির হয়েন, তখন বদরিকাশ্রম তীর্থাভিমুখে গমনকালে এক বন-বেষ্টিত পর্ব্বত শৃঙ্গে একজন যোগী পুরুষের দর্শন লাভ করেন, তাঁহার দেহ জরাব্যাধিগ্রস্ত ও নয়ন দীপ্তিহীন হইয়া আসিতে ছিল, সেই যোগীর চরণে প্রণত হইলে, পওহারী বাবাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, কোথায় যাত্রা করিবে? পওহারী বাবা বদরিকাশ্রম দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে সেই মহাত্মা বলিলেন, যদি তীর্থ দর্শনে বিশেষ আবশ্যক না বোধ কর, তবে আমার জরাজীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত দেহের কিছুদিন সেবা কর। প্রফুল্লচিত্তে পওহারী বাবা যোগীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু অধিক দিন থাকা প্রয়োজন হইল না, ১৫।২০ দিবসের মধ্যেই যোগীর দেহ ত্যাগের সময় আসিল, তখন যোগী পওহারী বাবাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কতকগুলি ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারক শিকড় প্রদান করিয়া যান।

পওহারী বাবা গিরণার পর্ব্বতে গিয়া কি প্রকারে এক মহাযোগী পুরুষের দর্শন লাভ করেন, সে সম্বন্ধে তিনি পাঞ্জাবী বাবা নামক একজন সাধুর নিকট এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গিরণার পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া পওহারী বাবা সেখানকার যোগী সন্ন্যাসীদিগের নিকট শ্রবণ করিলেন যে, এই পর্ব্বত শৃঙ্গে এক প্রকাণ্ড গহ্বর আছে, তন্মধ্যে এক মহাপুরুষ অবস্থান করেন, কিন্তু গহ্বর দ্বার হইতেই সকলেই ফিরিয়া আসে, কেহ তাঁহার দর্শন পায় না।

এক দিন তিনি সেই গহ্বরের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে আরও দুইটী সন্ন্যাসীর সঙ্গ লাভ হইল, তাঁহারাও মহাপুরুষের দর্শন লাভার্থ পওহারী বাবার সঙ্গী হইলেন। প্রায় দিবা অপরাহ্ণে তিন জন গহ্বর দ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন সঙ্গী সন্ন্যাসী দুই জন পওহারী বাবাকে দূরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আপনারা গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহারা বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন যে, আমরাত মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইলাম না, গহ্বর মধ্যে ভীষণ ব্যাঘ্র গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ পাইলাম, ইহার অভ্যন্তরে হয়ত ব্যাঘ্রের আবাস স্থান আছে, তখন পওহারী বাবা বলিলেন যে, একবার গিয়া দেখিতে ক্ষতি নাই, মৃত্যু ত একবার হইবেই, তা ব্যাঘ্রের আক্রমণেই হউক, বা যে প্রকারেই হউক হইবে। আমি একবার ভিতরে প্রবেশ করিব, আপনারা এইখানে একটু আমার অপেক্ষা করুন।

পওহারী বাবা গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিলেন, ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, এবং ব্যাঘ্র গর্জ্জনও শ্রুতিগোচর হইল না, তখন তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিছু দূরে গিয়া একটু ক্ষীণ আলোক তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, আলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, সেখানে অতি দীর্ঘ এক খণ্ড প্রস্তর পড়িয়া আছে, তদুপরি দীর্ঘাকার এক যোগী পুরুষ নিদ্রিত; যোগীর পাদদেশে উপবেশন করিয়া তাঁহার পদ সেবায় নিযুক্ত হইলেন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে যোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি পওহারী বাবাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি কেমন করিয়া এবং কি অভিপ্রায়ে হেথা আসিয়াছ? তখন পওহারী বাবা বলিলেন, আমি আপনারই নিকট উপদেশ লইতে আসিয়াছি, তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, গহ্বরে প্রবেশকালে তোমার কোন বিঘ্ন হয় নাই? পওহারী বাবা বলিলেন, আমার দুই জন সঙ্গী প্রথমে প্রবেশ করিয়া ব্যঘ্র গর্জ্জন শুনিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমিত কোন শব্দ শুনিতে পাই নাই। তখন তিনি কমণ্ডলু হস্তে গুহার নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী হইতে জল এবং দাড়িম্বের ন্যায় একটী ফল আনিয়া পওহারী বাবার সম্মুখে স্থাপিত করিয়া বলিলেন যে, তোমার শরীর যদি ক্ষুধা তৃষ্ণায় খিন্ন হইয়া থাকে, তবে ইহা গ্রহণ কর। পওহারী বাবা আনন্দিত চিত্তে সেই ফল ভক্ষণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। ফলের কিয়দংশ আহারে তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হইল, সে ফলের আকার দাড়িম্বের মত হইলেও উহা দাড়িম্ব ফল নহে, তেমন সুমিষ্ট সুস্বাদু তৃপ্তিকর ফল তিনি কখনও খান নাই। কমণ্ডলুস্থিত জলপানান্তে সুস্থির হইয়া বসিলে তখন তিনি পুনর্ব্বার আদেশ করিলেন যে, ওই নিকটস্থ নির্ঝরিণীতে গিয়া স্নান করিয়া আইস, স্নানান্তে পওহারী বাবা যখন নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন, তখন তাঁহাকে দুই চারিটি উপদেশ দান করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন যে, আমার উপদেশ পালন করিও, উপকার পাইবে, কিন্তু সকলকে বলিও না, এবং এখান হইতে চলিয়া যাও, ফিরিয়া আসিও না, পর্ব্বতের উপরে অনেক সাধু সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালিয়া অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের কাছে তুমি নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারিবে।

পওহারী বাবা বলিলেন, আমি আর কোথাও যাইব না, এইখানে আপনার সেবা করিব, কিন্তু তিনি বলিলেন, এখানে রাত্রিবাসের আদেশ নাই, তুমি শীঘ্র প্রস্থান কর, তখন পওহারী বাবা সেই মহাপুরুষের চরণ স্পর্শপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ

গ্রহণ করিয়া গহ্বর হইতে বাহির হইলেন, তখন চারিদিক অন্ধকার, ঘোরা রজনী, বাহিরে আসিয়া সঙ্গী সন্ন্যাসীদ্বয়ের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীরা বহুপূর্ব্বেই সেস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন।

তীর্থ দর্শন বিষয়ে পওহারী বাবা বলিতেন যে, পদব্রজে পর্য্যটন করাই বিধেয়। আয়াসলব্ধ ধনে প্রেমাধিক্য জন্মে, বহুদিনে বহু কষ্টের পরে অভীষ্টবস্তু লাভ হইলে অভীষ্ট দেবতার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়।

তীর্থ স্থানে গমন কালে প্রকৃতির নব নব বিচিত্র শোভার মধ্যে তীর্থ যাত্রীর ভগবদ্দর্শন লাভ হয়।

তীর্থযাত্রা কালে গন্তব্য পথে কত সাধু মহাত্মা সহযাত্রীর সঙ্গলাভ হয়, এবং তীর্থ দর্শনের পূর্ব্বেই যাত্রী মহদুপকার লাভ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে যখন তিনি দেবমূর্ত্তি সকল সুসজ্জিত করিতেন, তখন তাঁহার প্রিয় সেবক রামেশ্বর প্রসাদের প্রতি অলঙ্কার নির্ম্মাণের ভার পড়িত। আট আনা মূল্যের রৌপ্যে দশ টাকা মজুরী পড়িয়া যাইত। বহুবার তাহা ভাঙ্গিয়া পুনঃ নির্ম্মাণের আদেশ করিতেন।

পুরাতনের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ বা শ্রদ্ধা লক্ষিত হইত। আশ্রম অভ্যন্তরে নানাবর্ণের নানা প্রকার স্ফটিক নির্ম্মিত দীপাধার ছিল, সকলি অত্যন্ত মলিন অবস্থায় পাওয়া গেল, যজ্ঞের পর তিনি সে সকল বোধ হয় ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু সেই দীপাধারের কতকগুলি গোলক দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন, উক্ত স্ফটিক গোলক ভগ্ন হইয়া শতখণ্ডে বিভক্ত হইলেও তিনি এমন করিয়া তাহা সংযোজিত করিয়াছিলেন যে, সূক্ষ্ম সূত্রে স্ফটিক খণ্ডকে কেহ যেন গ্রন্থি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার নিকট একটী বহু পুরাতন ঘড়ি ছিল, কতবার কত অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার সংস্কার করান হইয়াছিল, কিন্তু সেই পুরাতন সামান্য ঘড়িটীর পরিবর্ত্তে নূতন একটী ঘড়ি রাখিবার কথা বলিলে বলিতেন, উহারই বান্দা দাসের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে।

পওহারী বাবার নির্ব্বাণ লাভের পরে, যখন আশ্রমাভ্যন্তরস্থ কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়, তখন দেখা গিয়াছিল যে, দেব দেবীর মূর্ত্তি সকল ও সিংহাসনাদি অতি মলিন অবস্থায় পতিত আছে, বহুকাল হইতে যেন কেহ তাহাতে হাত দেয় নাই। অনুমান করা যায় যে তিনি যজ্ঞ সমাপনের পরে দেবমূর্ত্তি সকল ও সিংহাসনাদি কখনও স্পর্শ করেন নাই।

পওহারী বাবার ক্ষুদ্র কুটীরাভ্যন্তরে এত শিল্পদ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল যে, তাঁহাকে একজন অসামান্য শিল্পী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কুঠার, খনিত্র, কর্ণিক হইতে ছুরী, কাঁচী, সূঁচ পর্য্যন্ত নানাবিধ যন্ত্রাদি কুটীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল, তাঁহার যখন যাহা প্রয়োজন হইত অধিকাংশ নিজ হস্তেই সম্পন্ন করিয়া লইতেন। কুটীরাদি ভগ্ন হইলে তাহাও স্বহস্তে নির্ম্মাণ বা সংস্কৃত করিয়া লইতেন। কোন বিষয়ে ত্রুটি সহ্য করিতে পারিতেন না। যে কোন জিনিষ হউক নিখুঁত না হইলে তাঁহার মনোমত হইত না, বহুদিন পূর্ব্বে যখন আশ্রমের অভ্যন্তরে কূপ নির্ম্মাণ হয়, তখন কূপের উপরিস্থিত প্রস্তর তিনি পুষ্পপত্রের ন্যায় বিচিত্র করিয়া খোদিত করিতে আজ্ঞা দেন. কিন্তু সেই খোদিত প্রস্তর প্রস্তুত হইয়া আসিলে তাহা মনোমত হয় নাই বলিয়া পুনরায় প্রস্তর আনাইয়া নিজ হস্তে পুষ্পপত্রাদি চিত্রিত করিয়া সেই মত প্রস্তরে খোদিত করিতে আজ্ঞা করেন।

পওহারী বাবার ধর্ম্মমত যাহা ছিল, এবং তিনি নিজে যে ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনেও তাহা অতি উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত করিয়া সুন্দর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। বর্ণাশ্রমানুযায়িক সীমাবদ্ধ সাধন পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া, কখন ভ্রম ক্রমেও সে সীমা, সে রেখা লঙ্ঘন করেন নাই, কিন্তু সাধনের উচ্চাবস্থায় উপনীত হইয়া তিনি সকলি এক সমান দেখিতেন। ক্ষুদ্রা স্রোতঃস্বিনী যেমন সঙ্কীর্ণপথে প্রবাহিত হইয়া অকুল জলধিতলে পড়িয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলে, তিনিও তেমনি সংযতচিত্তে সীমাবদ্ধ পথ অতিবাহিত করিয়া নিজ স্বরূপকে অর্থাৎ নিজ আত্মা, যাহাকে ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের অংশ বলা যায়, পরস্বরূপে ঈশ্বর বা পরব্রহ্মে মিলিত করিয়া সকল সীমা রেখা বর্ণাশ্রম বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সেখানে পৌছিয়া তাঁহার সকল ভেদাভেদ ভাসিয়া গিয়াছিল। সর্ব্ব জাতির প্রতি সমান শ্রদ্ধা, সর্ব্ব জীবের প্রতি সমান প্রীতি, এক সার্ব্বজনীন প্রেমে তাঁহার হৃদয়পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

ভারতের ধর্ম্ম।

এই সেই প্রাচীন ভারতভূমি, যেখানে অন্যান্ত দেশের পূর্ব্বেই জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে। সেই ভারতভূমি, যে ভূমির মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠতম মহাত্মাগণের

পদরেণু সংস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে। এই সেই ভূমি, যেথানে ধর্ম্ম ও ষড়দর্শনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ সকল এক সময়ে জগতের সমস্ত জাতির নিকট আদরনীয় হইয়াছে, এই সেই ভূমি যেথান হইতে ধর্ম্ম ও দার্শনিকতত্ব সমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত জগতকে প্লাবিত করিয়াছে। আর এথান হইতেই সেই প্রকার তরঙ্গের অভ্যুদয় হইয়া মৃতকল্প মানব জাতির ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে। এই সেই ভারত—যে ভারত শত শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশীক আক্রমণ, শত বিধর্ম্মিগণের শঠতা ও শত শত প্রকার রীতিনীতি আচার ব্যবহারের বিপর্য্যয় সহ্য করিয়াও আপনার বিশেষত্বটুকু বজায় রাখিয়াছে। এই সেই ভারত—যাহা নিজ অবিনাশী শক্তি ও জীবন লইয়া পর্ব্বত সদৃশ দৃঢ়ভাবে আজও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মা যেমন অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, স্থির, অচল, অব্যক্ত, বিকার-রাহিত্য ও অমৃত-স্বরূপ, আমাদের মাতৃভূমি ভারতও তদ্রূপ।

ধর্ম্মই আমাদের সম্মিলন ভূমি, এই সম্মিলন ভিত্তিতেই আমাদিগের জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপনা করিতে হইবে। ইউরোপে রাজনীতিই জাতীয় একতা-ভিত্তি; কিন্তু এসিয়ার ধর্ম্মই ঐ ঐক্যের মূল ও ভিত্তি। আবার এই ভারতে আমরা দেখিতে পাই যে, জাতি কি সমাজ যে কোন বিষয়েই কোন গোল উপস্থিত হয়, ধর্ম্মসম্মিলনকারিণী শক্তির নিকট সমস্তই বিলুপ্ত হয়। আমরা দেখিতে পাই ও জানি, ভারতবাসীর ধারণা—ধর্ম্ম হইতে উচ্চতর বস্তু আর কিছুই নাই। ইহাই ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র, ইহাই ভারতীয় জীবনের চরমপন্থা; আর ইহাও আমরা অবগত আছি, স্বল্পতম বাধার পথেই কার্য্য করিতে সক্ষম।

এখন দেখা যাউক, কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে গেলে, সনাতনধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করিতে গেলে, আমাদিগের আগে কি মাল মসল্লার দরকার হইবে? প্রথমে ধর্ম্মের দিকটা দৃঢ় না করিয়া অন্য কোন বিষয়ে চেষ্টা করিতে গেলে ফলে পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র। কোন ক্ষেত্রে বেড়া না দিয়া, ভাল ভাল আম কাঁঠালের গাছ লাগাইলে যেমন গরু ছাগলে নষ্ট করিয়া ফেলে, তদ্রূপ ধর্ম্মবেড়া শক্ত না করিতে পারিলে ফলে সর্ব্বনাশ হইবে। ওহে নবীন-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ—তোমার সমস্ত কর্ম্মই যে ধর্ম্ম? তোমার জীবনে ধর্ম্ম, মরণে ধর্ম্ম, তুমি যাহা কিছু কর, সবই তোমার ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ছাড়া জগতে কিছুই হইতে পারে না। জল ঠাণ্ডা—জলের ধর্ম্মই ঠাণ্ডা। সুতরাং যাহা কর, দেখ, সবই

ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম সম্মিলনই আমাদের ভবিষ্যৎ সেতু। ধর্ম্ম মেরুদণ্ড করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। মেরুদণ্ড যেমন শরীরকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখে, ধর্ম্মও সেইরূপ জাতীয় জীবনকে দৃঢভাবে বাঁধিয়া রাখে। যদি সেই ধর্ম্ম-সম্মিলনকে মেরুদণ্ড করিয়া দাঁড়াইতে পার, তবে দেখিবে যে, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি আপনাপনিই হইবে। সামান্য কথায় আছে "বস্‌তে পাল্লে শোবার যায়গা হয়।" যদি তোমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া ধর্ম্মসম্মিলনকারিণী শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইতে পার, তবে যায়গা অবশ্যই জুটিবে। যেমন রক্ত সতেজ থাকিলে দেহে কোন প্রকার রোগের বীজাণু প্রবেশ করিতে পারেনা, তেমনি ধর্ম্মবলে বলীয়ান থাকিলে, ধর্ম্মসম্মিলন বল দৃঢ় থাকিলে, কেহই আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। ধর্ম্মই জাতীয় জীবনের শোণিত-স্বরূপ। রক্ত না থাকিলে যেমন দেহে বল থাকে না, তেমনি ধর্ম্মসম্মিলন-কারিণী শক্তি না থাকিলে জাতীয় জীবন দৃঢ় হয় না।

আবার যদি এই ধর্ম্মরূপ শোণিত প্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না পায়, যদি উহা বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়ে কল্যাণ। বিশুদ্ধ হইলে রাজনৈতিক, সামাজিক বা অন্য কোনরূপ সমাজের বাহ্যদোষ, এমন কি আমাদের দেশের ঘোর দুঃখ দারিদ্র্য দোষ সকলই সংশোধিত হইবে। যদি শরীর হইতে রোগের বীজাণু পরিত্যক্ত হইল তবে সেই বিশুদ্ধ সতেজ রক্তে অন্য কোন কুসংস্কার প্রভৃতি দূষিত বাহ্যবস্তু কি করিয়া প্রবেশ করবে? যত দিন শরীর সতেজ থাকে ততদিন উহারা শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। যখন দুর্ব্বল হয় তখনই ঐ বীজাণুগুলি শরীরে প্রবেশ করিয়া উৎকটরোগ উৎপাদন করে। সুতরাং ব্যাধি প্রতীকারের মূল কারণ কি দেখিতে হইবে ও রক্তের মলিনতা বিদূরিত করিয়া সতেজ ও শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মলিনতা বিদূরিত করিবার একমাত্র উপায় শক্তিসঞ্চার; রক্তকে বিশুদ্ধ করা, শরীরকে সতেজ করা, মনকে একাগ্র করা ও আমাদের যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছেন তাঁহাকে বিকাশ করা। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে ধর্ম্মই আমাদের তেজ, ধর্ম্মই আমাদের বীর্য্য।

আমরা এই ধর্ম্মের বন্ধনে চিরাবদ্ধ। যদি এই ধর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করি তবে আমাদিগের জাতীয়ত্ব ও আমাদিগের অস্তিত্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া লোপ পাইবে। সুতরাং আমাদিগের জাতীয় জীবনস্বরূপ যে ধর্ম্ম, উহাকে দৃঢ় করিতেই হইবে। তোমরা যে শত শত শতাব্দীর অত্যাচার, উৎপীড়ন সহ্য করিয়া

এই ধরাধামে আজও দাঁড়াইয়া আছ, সে কার জোরে? সে কেবল তোমাদের ধর্ম্ম সম্মিলনকারিণী শক্তির জোরে। তোমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষগণ এই ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সকলই সাহসপূর্ব্বক স'হয়াছেন—এমন কি তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণকেও হেয় বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। এই সেই ভারতভূমি, যেথানকার নারীগণ সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য চিতানলে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। এ বিষয়ে চিতোর জ্বলন্ত অক্ষরে জগতের নিকট সাক্ষ্য দিতেছে।

আমাদিগের ধর্ম্মসম্মিলনকারিণী শক্তিকে জীবিত রাখিবার জন্য উঠ। তোমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষগণের কীর্ত্তিস্তম্ভকে ধারণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হও। শাস্ত্রকারেরা গাহিয়াছেন "যেনাস্য পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেনম যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ নরিষ্যতে।" যে পথে পিতৃগণ গমন করিয়াছেন, সেই পূর্ব্বপুরুষ পরীক্ষিত পবিত্র পথে পদচারণা করিতে পাপস্পর্শশঙ্কা নাই, দোষ নাই, অপচয় অপকারের ভয় নাই। তবে কেন ভাই—"মহাজনঃ গতস্য পন্থাঃ"—মহাত্মন্ ব্যক্তিগণ যে পথে গিয়াছেন সেই পথে উত্তীর্ণ হও। দেখিবে দেশে সোণা ফলিবে। আমাদের মলিনা, দীনা, দারিদ্র্যপূর্ণা ভারত তাহা হইলে আবার শস্য শ্যামলা, সুজলা সুফলা হইবে।

জাতীয় উন্নতি করিতে হইলে, স্বদেশের উন্নতি করিতে হইলে, স্বসমাজের উন্নতি করিতে হইলে, স্বপল্লীর উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে ধর্ম্মপ্রাণ জীবিত কর। ধর্ম্মসম্মিলনকারিণী শক্তি ব্যতীত কোন উন্নতিই হইবে না। তোমরা ধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য উঠ; আর ঘুমাইও না, ঐ শুন তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মা ঋষি গাহিতেছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

আজ জগতকে দেখাও যে তোমার ধর্ম্মেতে বিশ্বাস আছে। আরো দেখাও যে ধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করিবার শক্তিও তোমার আছে। তোমাতে সব শক্তি আছে—তুমি সব করিতে পার। বিশ্বাস করিও না যে তুমি দুর্ব্বল। সব শক্তিই তোমার ভিতরে। তোমারই আজ ধর্ম্ম-সম্মিলনকারিণী শক্তিকে জাগাইবার সময়। হে নবীন্ কর্ণধার, আজ এই শুভদিনে, শুভক্ষণে, সুবাতাসে পাইল্ তুলো, সুবাতাসে পাইল তুলিতে পারিলে অনেক পথ অগ্রসর করিয়া দিবে। মনে রেখো, ধর্ম্ম বিনা পথ নাই।

ব্রহ্মচারী দেবব্রত।

বেদান্তের আভাষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৭৬ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

অবিদ্যার স্বরূপ।

শিষ্য। এক্ষণে আপনি যাহাকে অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলেন, সে জিনিষটা কি, আমাকে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর শ্লোক আছে, শোন বলি :—

"জ্ঞানাপনোদ্যমজ্ঞানং ভাবরূপং গুণাত্মকম্।
অনির্ব্বাচ্যমনাদ্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদিতি তদ্বিদুঃ॥"

অর্থাৎ, যাহা কিছু জ্ঞানাপনোদ্য, কিনা যাহা জ্ঞানের উন্মেষে তিরোহিত হয়, অথচ ভাবরূপ, কিনা ভাবও নহে অভাবও নহে, ভাবের মত; গুণাত্মক, অর্থাৎ গুণ স্বরূপ, প্রকৃত গুণ নহে, প্রকৃতপক্ষে কোন দ্রব্যের আশ্রিত গুণ নহে কিন্তু গুণবৎ, অর্থাৎ গুণ বা রজ্জুর ন্যায় চিদাত্মাকে বন্ধন করে বলিয়া গুণাত্মক; অনির্ব্বাচ্য, যাহার সম্বন্ধে অস্তি বা নাস্তি বলা যায় না কিম্বা আছে ও নাই উভয়ও বলা যায় না। (not describable as existent or non-existent or as both existent and non-existent) এবং অনাদি অর্থাৎ যাহা কিছু হইতে জন্মাইয়াছে এরূপ বলা যায় না— এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত যাহা তাহাকে অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলে। এ সম্বন্ধে "বেদান্তসার" নামক প্রকরণ পুস্তকে এইরূপ আছে :—"অজ্ঞানন্তু সদসদ্‌ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি।" অজ্ঞানটা কিনা সদ সদ্ভ্যাম "নির্ব্বচনীয়ং" অর্থাৎ সৎ বা অসৎ, আছে বা নাই বলিয়া বর্ণনা করা যায় না এরূপ জিনিষ। তাই "সংক্ষেপশারীরকে" বলিয়াছে :—

"অবিদ্যায়া অবিদ্যাত্মমিদমেব তু লক্ষণম্।
যৎ প্রমাণাসহিষ্ণুত্বমন্যথা বস্তু সা ভবেৎ॥"

অর্থাৎ "অবিদ্যার অবিদ্যত্বের লক্ষণই এই যে তাহা প্রমাণাসহিষ্ণু—যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায় না; যদি তাহা হইত, তাহা হইলে তাহাকে বস্তু বা সৎ বলা যাইত।"

আরও বলিয়াছে :—

"সেয়ং ভ্রান্তির্নিরালম্বা সর্ব্বন্যায়বিরোধিনী।

সহতে ন বিচারং সা তমোযদ্বদ্দিবাকরম্।"

এই ভ্রান্তির বা অবিদ্যার কোনরূপ আলম্বন নাই এবং কোন প্রকার যুক্তিরও বিষয় নহে; সূর্য্যালোকে যেমন অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে না, যুক্তির সম্মুখে সেইরূপ অবিদ্যাও দাঁড়াইতে পারে না।"

"সংক্ষেপ শারীরককার" আর এক স্থানে বলিয়াছেন :—

"দুর্ঘটত্বমবিদ্যায়া ভূষণং নতু দূষণম্।

কথঞ্চিদ্‌দৃশ্যমানত্বে ঽবিদ্যাত্বং দুর্ঘটং ভবেৎ॥"

এই যে অবিদ্যার বিচারাসহত্ব, ইহা অবিদ্যার একটী গুণ, দোষের কারণ নহে; কেন না উহার অস্তিত্বের যদি কিছুমাত্র প্রমাণ থাকিত, তাহা হইলে অবিদ্যার অবিদ্যাত্বই লোপ পাইত।

"অনির্ব্বচনীয়ম্" ও "অনির্ব্বাচ্যম্" একই অর্থ বিশিষ্ট। "ত্রিগুণাত্মকং" অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তম বা লঘুত্ব, প্রকাশকত্ব ও আবরকত্ব এই তিনটী গুণ ও তৎপ্রকৃতি "আত্মক" কিনা তৎস্বরূপ। জীব "আমি অজ্ঞ," "আমি আমাকে জানি না" এইরূপ অজ্ঞতার অনুভূতির দ্বারাই ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে মাত্র। "শ্বেতাশ্বতর" উপনিষদে আছে—

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।"

"যোগীরা ধ্যানযোগে দেখিয়াছেন যে মহেশ্বরের যে আত্মভূতা বিশ্বজননী শক্তি, তাহাই মায়া বা অবিদ্যা এবং সেই ত্রিগুণময়ী শক্তিদ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়াই তিনি কার্য্যকারণ বিনির্মুক্ত, পূর্ণানন্দ এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে অনুপলভ্যমান থাকেন; অর্থাৎ এই মায়াবৃত বলিয়াই আমরা সেই মহেশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারি না। এই মায়ারূপ আবরণ ভেদ করিতে না পারিলে জীব সেই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। এই অবিদ্যাই আমাদিগকে "আমি" "তুমি," "পিতা" "পুত্র," ইত্যাদিরূপ নানাত্ব দেখাইতেছে; এই দৈবী মায়াকে অতিক্রম করা বড়ই কঠিন; তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"

অর্থাৎ "দেব কিনা পরমেশ্বর, বিষ্ণুস্বরূপ আমি, আমার আত্মভূতা এই ত্রিগুণ-

ময়ী মায়া অস্তি দুরতিক্রমণীয়া। ইহাকে "গুণ" বলিবার কারণ—"গুণত্বঞ্চাস্যা রজ্জুবচ্চিদাত্মবন্ধকত্বেন, নতু দ্রব্যাশ্রিতত্বেন"—রজ্জু দ্বারা যেমন পশ্বাদি বন্ধন করা যায় ইহাও সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমরূপ ত্রিবৃত্ত গুণের দ্বারা চিদাত্মাকে বদ্ধ করে; ইহা বস্তুগত গুণ নহে। এই অজ্ঞান আবার কিরূপ, না "অনাদি" অর্থাৎ যতকাল ব্রহ্ম ইহাও ততকাল আছে, ইহার আদি বা জন্ম নাই। "অজ্ঞান" বা "অবিদ্যা" শব্দের প্রথমে "অ" বা নঞ্" আছে বলিয়া জ্ঞান বা বিদ্যার "অভাবই" অজ্ঞান বা অবিদ্যা এরূপ কেহ না মনে করেন, তাই বলা হইয়াছে "ভাবরূপ" অর্থাৎ যেন অস্তিত্ব আছে (an apparent entity)। আবার কি, না "জ্ঞানাপনোদ্য" বা "জ্ঞানবিরোধী" অর্থাৎ "আত্মযাথার্থ্য সাক্ষাৎকাররূপাৎ জ্ঞানাৎ নিবর্ত্তনীয়ং"—ইহার অর্থ—আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকাররূপ যে জ্ঞান, সেই আত্মজ্ঞান উদিত হইলে—তমোপহদ্দিবাকরম—সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার বিলীন হয—অজ্ঞানতিমির সেইরূপ বিলীন হইয়া যায়। এই মায়া বা অজ্ঞান সম্বন্ধে শ্রীমৎ পঞ্চদশিকার বলিতেছেন :—

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়ীনস্তু মহেশ্বরম্।
অস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥
মায়া চেয়ং তমোরূপা..................
অনভূতিং তত্র মানং প্রতিজজ্ঞে শ্রুতিঃস্বয়ম্॥

*   *   *   *   *

ইত্থং লৌকিক দৃষ্ট্যৈতৎ সর্ব্বৈরপ্যনভূয়তে।
যুক্তিদৃষ্ট্যা ত্বনির্ব্বাচ্যং নাসদাসীদিতি শ্রুতেঃ॥
নাসদাসীদ্ বিভ্রাতত্বান্নো সদাসীচ্চ বাধনাৎ।
বিদ্যাদৃষ্ট্যা শ্রুতং তুচ্ছং তস্য নিত্য নিবৃত্তিতঃ॥
তুচ্ছানির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্ব্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ॥"

অর্থাৎ "মায়াকে প্রকৃতি বা জগৎ উৎপত্তির কারণ বলিয়া জানিবে; আর যিনি সেই মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট অন্তর্যামী পুরুষ, তাঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিবে; তিনিই মায়ার অধিষ্ঠাতা এবং জগতের নিমিত্ত কারণ। সেই মায়াবিশিষ্ট মহেশ্বরের অবয়ব হইতে উৎপন্ন সচরাচর জীবসমূহে এই জগৎ ব্যাপ্ত আছে। শ্রুতি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে এই তমোরূপিণী মায়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুভূতিই একমাত্র প্রমাণ, অন্য প্রমাণ নাই। এইরূপ আত্ম-

মোহাত্মক তমোরূপিণী মায়া লৌকিক দৃষ্টিতে সর্ব্বানুভবসিদ্ধ বটে, কিন্তু যুক্তি প্রমাণাসহিষ্ণুতাবশতঃ ইহাকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না। পঞ্চদশিকায় বলিতেছেন—"মায়া সর্ব্বজনের অনুভবসিদ্ধ সুতরাং তাহাকে অসৎ বলা যায় না; কারণ যে বস্তু অসৎ তাহা কেহ কখনও অনুভব করিতে পারে না; এবং জ্ঞানের উদয়ে সেই মায়ার বিনাশ হয়, অতএব তাহাকে সৎও বলা যায় না, কেননা যাহা সৎ তাহার কখনও বিনাশ হইতে পারে না। তবে এই মাত্র বলা যায় যে, ঐ মায়াজ্ঞান জ্ঞানদৃষ্টির সমক্ষে নিত্যনিবৃত্ত বলিয়া ইহাকে তুচ্ছমাত্র বলা যায়। অতএব সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে উপরি উক্ত কারণে অবিদ্যা তিন প্রকার, অর্থাৎ তুচ্ছ, অনির্ব্বচনীয় ও বাস্তবিক; জ্ঞানদৃষ্টিতে বা শ্রৌতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তি দৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবিক।"

সাংখ্য বলেন মায়া বা প্রকৃতির স্বরূপ জীবের হৃদয়ঙ্গম হইবামাত্র তাহার মায়াবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, মায়ার ইন্দ্রজাল বিলীন হইয়া যায়, তখন সেই ভাগ্যবান জীব সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ দেখে :—

> "পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
> এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য॥"

অর্থাৎ "সেই পুরুষই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তিনিই কর্ম্ম, তিনিই তপঃ এবং তিনিই পর ও অমৃত ব্রহ্ম। হে সৌম্য, যিনি এই পুরুষকে হৃৎ-পুণ্ডরীক মধ্যে নিহিত বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি এই জীবনেই অবিদ্যার গ্রন্থি বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন।" এবং তখন তাঁহার

> "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
> ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

"সেই পরাবর (অর্থাৎ কারণরূপে শ্রেষ্ঠ এবং কার্য্যরূপে অশ্রেষ্ঠ) ব্রহ্মকে দর্শন হয় বলিয়া, হৃদয়গ্রন্থি (অর্থাৎ অবিদ্যা জন্য সংসার-বন্ধন) ভেদ হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাঁহার (সেই সাধকের) কর্ম্মসমূহ (অর্থাৎ মোক্ষ প্রতিরোধক সকাম কর্ম্মের ফল সমূহ) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।"

তাই সাংখ্যকার বলিতেছেন :—

> "রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
> পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥

অর্থাৎ "নর্ত্তকী যেমন স্বীয় নৃত্য দেখাইয়া রঙ্গভূমি হইতে অন্তর্হৃত হয়, প্রকৃতি সেইরূপ স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া পুরুষের দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হয়।" তখন সেই জীবন্মুক্ত জীব মনে করে :—

"দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাঽহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতি সংযোগে ঽপিতয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য ॥"

"আমি শব্দাদিরূপে এবং ভিন্নরূপে প্রকৃতিকে দর্শন করিয়াছি, আর তাহাকে দেখিবার প্রয়োজন নাই ও দেখিব না।" প্রকৃতিও মনে করে "আমি বিশেষরূপে পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছি, আর তাহাকে আমার স্বকীয় কার্য্য প্রদর্শনের আবশ্যক নাই—এই বলিয়া প্রকৃতি সৃষ্টি হইতে বিরত হয়।"

শিষ্য। অবিদ্যা যে আছে তাহা কি করে বুঝ্‌বো?

গুরু। তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমি পূর্ব্বেই দিয়াছি। আচ্ছা, আবার বলিতেছি শোন। "ন জানামি ইতি অনুভূতিঃ তথা শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ চ অত্র মাসম্"—অর্থাৎ অবিদ্যা যে আছে তাহার প্রমাণ দুইটী; (১) আমি কে তাহা জানিনা—এই অজ্ঞতার অনুভূতি, অর্থাৎ স্বীয় অজ্ঞতা বোধ (consiousness of one's own innate ignorance) এবং (২) শ্রুতি ও স্মৃতি এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা। অবিদ্যা জগৎস্রষ্টার বিশ্বজননী শক্তি এবং এই শক্তি সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের দ্বারা প্রচ্ছন্না, অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টি বহির্ভূতা বা অনুপলভ্যমানা থাকেন। সত্বাদি ত্রিগুণ অবিদ্যারই কার্য্য এবং সেই ত্রিগুণের দ্বারাই তাহাদের কারণীভূত অবিদ্যা প্রচ্ছন্না (কার্য্যকারেণ কারণাকারস্যাভিভূতত্বাৎ ইতি শঙ্করঃ) ত্রিগুণ যে অবিদ্যার কার্য্য তৎসম্বন্ধে স্মৃতি বলিতেছেন— "সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।" নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥" অর্থাৎ হে মহাবাহো! সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতিজাত এবং ইহারা দেহ মধ্যস্থিত অব্যয় জীবাত্মাকে বন্ধন করে। স্মৃত্যন্তরে উক্ত হইয়াছে—"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"—অর্থাৎ "জীবের জ্ঞান, অজ্ঞান বা অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায়, জীব মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিতেছেন—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজমব্যয়ম্।" ইহার অর্থ—"আমি সকল লোকের নিকট প্রকাশিত হই না; কেননা যোগমায়ায় আচ্ছাদিত থাকায়, আমি যে জন্মমরণ-রহিত পরমেশ্বর তাহা লোকে জানিতে পারে না।" "যোগমায়া সমাবৃত" ও "স্বগুণে নিগূঢ়াং সমার্থবাচক; "যোগ" অর্থাৎ

"গুণানাং যুক্তির্ঘটনং সৈব মায়া যোগমায়া" তাহা দ্বারা সমাবৃত কিনা নিগূঢ় বা প্রচ্ছন্ন।

শিষ্য। অবিদ্যা বা মায়ার অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করা বড় কঠিন ব্যাপার দেখিতেছি।

গুরু। কঠিন বলে কঠিন! অবিদ্যাকে যদি চিনিতে পারিলে তাহা হইলে তো তোমার মুক্তি সম্মুখে।

পঞ্চদশিকার বলিতেছেন :—

"ন নিরূপয়িতুং শক্যা বিস্পষ্টং ভাসতে চষা।
সা মায়েতীন্দ্রজালাদৌ লোকাঃ সম্প্রতিপেদিরে॥"
স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদমশক্যং তন্নিরূপণম্।
মায়াময়ং জগৎ তস্মাদীক্ষস্বাপক্ষপাততঃ॥"

অর্থাৎ "মায়ার লৌকিক লক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, মায়ার স্বরূপ নিশ্চয় করিতে পারা যায় না, অথচ সাক্ষাৎ দেদীপ্যমান দেখা যায়। যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না, অথচ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এইরূপ যে সকল ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার প্রতিনিয়ত আমাদের স্থূল লোচনের বিষয়ীভূত হইতেছে, তাহাই লোকে মায়া ও মায়ার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করে। এই চরাচর জগৎ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান দেখিতেছি, কিন্তু ইহার কোন এক বস্তুর প্রতি বিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলেও তাহার বিশেষ তথ্য জানিতে পারা যায় না; অতএব পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিবেচনা কর এই জগৎ মায়াময় কি না।

শিষ্য। আচ্ছা, অজ্ঞান তো জড়, তবে তাহা চেতনের ন্যায় কার্য্য করে কিরূপে? এবং কাহাকেই বা সে আবরণ করে?

গুরু। অজ্ঞান বা অবিদ্যা জড়া বটে, কিন্তু—

"চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা।"

"এই যে অবিদ্যা-রূপিণী ভগবচ্ছক্তি ইহার পশ্চাতস্থিত আত্মার প্রভায় ইহা চৈতনের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।" আরও—

"আশ্রয়োঽস্যা বিশুদ্ধা চিৎ বিষয়শ্চাপি সা পুনঃ।"

অর্থাৎ "সর্ব্বধর্ম্মাতীত বা নির্ব্বিশেষ চিৎ বা চিদাত্মা ইহার আশ্রয়ও বটে এবং বিষয়ও বটে।" অন্যত্র উক্ত হইয়াছে :—

"আশ্রয়ত্ব বিষয়ত্ব ভাগিনী নির্ব্বিশেষ চিতিরেব কেবলা।"

অবিদ্যার বা অজ্ঞানের যাহা আশ্রয় তাহাই বিষয় ইহা স্বতঃপ্রমাণ, কেননা তমঃ বা অন্ধকার যে স্থানে আশ্রয় লাভ করে, তাহাকেই বিষয় বা আবৃত করে; তমোরূপিণী অবিদ্যাও সেইরূপ যে চিদাত্মাতে আশ্রয় লাভ করে, তাহাকেই আবরণ করে; অর্থাৎ সেই চিদাত্মারই স্বপ্রকাশত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করে। সুতরাং চৈতন্যকে আশ্রয় করে বলিয়া আর বলিতে পারনা যে অবিদ্যা জড়। চৈতন্য প্রকাশাত্মক বলিয়া তাহাকে অপ্রকাশাত্মক অবিদ্যা আশ্রয় করিতে পারে না, একথা বলিতে পারা যায় না; কেননা "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ অহঙ্কার প্রণোদিত উল্লেখ জনিত যে অন্তঃকরণবৃত্তি, অন্তঃকরণ-উপহিত আত্মা তাহার সাক্ষী হইয়া থাকেন। "সংসারদশায়াং চিদাত্মনি অজ্ঞানদর্শনং প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে পেচকদৃষ্টান্ধকারবদ্ধ্রুপপদ্যমেব" অর্থাৎ মধ্যাহ্ন সূর্য্যে পেচক যেমন অন্ধকার দর্শন করে, সংসারী চিদাত্মাতে সেইরূপ অবিদ্যাবরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শিষ্য। অজ্ঞানকে অবিদ্যা ও মায়া বলে, ইহার আর কিছু নাম আছে কি?

গুরু। আছে বৈকি—

"প্রকৃতিঃ প্রলয়াবস্থাঽব্যক্তমব্যাকৃতং তথা।
মহাসুষুপ্তিঃ কূটস্থ মক্ষরঞ্চ তদুচ্যতে॥
তথা তমোঽনৃতং মায়া নিদ্রাঽবিদ্যা গুণৈক্যকম্।
জড়িমা চ তমিস্রা চ বিষ্ণুশক্তিশ্চ গীয়তে॥"

অজ্ঞানের এই সকল পর্য্যায়। "প্রকৃতি" নাম কেন, না উক্ত অবিদ্যা সমস্ত প্রপঞ্চের মূল কারণ। "প্রলয়" অর্থাৎ সকল কার্য্য যাহাতে লয় হয়। "অব্যক্ত" ও "অব্যাকৃত"—undifferentiated, unmanifested অর্থাৎ নাম রূপ অবিভক্ত বলিয়া। "মহাসুষুপ্তি" অর্থাৎ অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তি উপরত বা নিরুদ্ধ হয় যাহাতে (সর্ব্বোপরমত্বাৎ বা সর্ব্ববৃত্তি নিরোধরূপাৎ wherein all internal functions find repose)। "কূটস্থ"—কূটবৎ (কামারের নাইয়ের ন্যায়) অবিকৃতরূপে অবস্থিত। "অক্ষর"—যাহা জ্ঞান বিনা ক্ষরিত বা তিরোহিত হয় না। "অনৃত"—মিথ্যা, তুচ্ছত্ব হেতু। "নিদ্রা"—কার্য্যবিশ্রান্তিরূপা বলিয়া। "অবিদ্যা"—বিদ্যার বা জ্ঞানের উদয়ে বিনাশ্য—জ্ঞানবিরোধী। "গুণৈক্য"—ত্রিগুণের ঐক্য বা সাম্যাবস্থা। "তমঃ" ও "তমিস্রা"—জ্ঞানরূপ প্রকাশ বা আলোকের তিরোধান সাধক বলিয়া। "জড়িমা"—চৈতন্য হইতে বিলক্ষণতা বা প্রভেদ বশতঃ। "বিষ্ণুশক্তি"—বিষ্ণোর্ব্যাপকস্য পরমাত্মনো অধীনত্বাৎ অর্থাৎ পরমাত্মার বিশ্বজননীশক্তি ("দেবাত্মশক্তিং"—"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া")।

শিষ্য। অবিদ্যার প্রধান কার্য্য কি?

গুরু। জীব ও ব্রহ্ম পৃথক বস্তু এইরূপ প্রদর্শন করাই ইহার প্রধান কার্য্য।

"জীবব্রহ্মবিভাগেঽপি হেতুত্বং চাস্য কীর্ত্তিতম্।
স্রষ্টৃত্বে ব্রহ্মণো, জীবকর্ত্তৃত্বেঽনাদিমত্যপি॥"

অর্থাৎ একমাত্র চিন্নিষ্ঠ অজ্ঞানই জীব ও ব্রহ্ম এই দ্বৈত জ্ঞানের হেতু; একদিকে ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা বলিয়া এবং অপর দিকে জীবকে কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ইত্যাদি অভিমানের আশ্রয় বলিয়া দেখাইতেছে। তাহা হইলে বুঝিতেছ যে, জীব ও ঈশ্বর এই দ্বৈতজ্ঞান অনাদি হইলেও মায়িক বা অবিদ্যাজনিত, বাস্তব নহে। অবিদ্যা বা মায়া জীবের অদ্বৈতজ্ঞানকে বিকৃত করিয়া দ্বৈতের অবভাস সৃজন করে; ইহাই বেদান্তী বা অদ্বৈতবাদীর মত। জীব ও ঈশ্বর এই বিভাগ অনাদি বা অজন্য হইলেও, অজ্ঞানের কারণতা অনুপপন্ন বা অযৌক্তিক হয় না। অদ্বয় ব্রহ্মের অনবভাস অবস্থাতেই তাহাদের, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের, ভেদজ্ঞানের অবভাস হইয়া থাকে এবং তাহাদের অস্তিত্বজ্ঞানও অজ্ঞান বা অবিদ্যার অধীন; কেননা, যেখানে অজ্ঞান নাই সেখানে জগৎপ্রপঞ্চ এবং সে সকল হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন এই জ্ঞানের অস্তিত্বই থাকে না; সুতরাং অনাদি অবিদ্যাই সেই ভেদজ্ঞানের অনাদি কারণ।

অনাদিত্ব দুই প্রকার—স্বরূপতঃ অনাদি ও প্রবাহতঃ অনাদি; তন্মধ্যে যাহা জন্য নহে তাহাই স্বরূপতঃ অনাদি—যথা অদ্বয়ব্রহ্ম; আর যাহা জন্য তাহা প্রবাহতঃ অনাদি—যেমন জীবব্রহ্ম বিভাগ। মহাপ্রলয় স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে, যতবার প্রলয় হয় ততবারই জীবব্রহ্মের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়, আবার আবির্ভূত হয়, এইরূপ প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং এই ভেদজ্ঞান জন্য, অথচ প্রবাহতঃ অনাদি। মহাপ্রলয় প্রবাহান্তর্গত মহাপ্রলয়ের ব্যক্তি বা অভিব্যক্তিকে স্বাদি স্বীকার করিলে সেই সেই প্রলয়াবসানান্তর কল্পপ্রারম্ভকালে জীবেশ্বর বিভাগ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হওয়ায় তাহার সাদিত্ব প্রমাণিত হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা অবিদ্যার কারণতার কোন ক্ষতিই হয় না।

পঞ্চদশিকার এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

"কূটস্থাসঙ্গমাত্মানং জড়ত্বেন করোতি সা।
চিদাভাস স্বরূপেণ জীবভাবপি নির্ম্মমে॥"

"মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতৌ শ্রুতম্।
মেঘাকাশজলাকাশাবিব তৌ সুব্যবস্থিতৌ॥"

"মায়াখ্যায়া কামধেনো র্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ।
যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বন্ত্বদ্বৈতমেব হি॥"

ইহার অর্থ :—মায়ার এমন একটী অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে যে সেই শক্তি দ্বারা কূটস্থ অসঙ্গচৈতন্য আত্মাকে জড়বৎ প্রতিপন্ন করিতে পারে এবং চৈতন্যের আভাস দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগের প্রভেদ প্রতিপাদন করে। মায়ার শক্তি প্রভাবেই জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে।

জীব ও ঈশ্বর উভয়ই মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, মায়াই উভয়বিধ আভাস দ্বারা এক অখণ্ড চৈতন্যকে জীব ও ঈশ্বররূপে কল্পনা করে।

শিষ্য। যদি জীব ও ঈশ্বর উভয়ই এক মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইল, তাহা হইলে জীবে ও ঈশ্বরে প্রভেদ কি ?

গুরু। সেইজন্য বলিতেছি, যেমন একই আকাশ মেঘেতে প্রতিবিম্বিত হইলে অস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় এবং ঐ আকাশ জলেতে প্রতিবিম্বিত হইলে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই অখণ্ডচৈতন্য উভয়বিধ আভাস দ্বারা জীব ও ঈশ্বররূপে প্রতীয়মান হন। যখন সেই অখণ্ডচৈতন্য বাসনাবিশিষ্ট হ'ন, তখনই জীব, আর যখন চিদাভাসে প্রতিবিম্বিত হ'ন, তখনই তাঁহাকে ঈশ্বর আখ্যা দেওয়া যায়।

জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ই মায়ারূপিণী কামধেনুর দুইটী বৎসস্বরূপ। ইহারা সেই কামধেনুর দ্বৈতরূপ দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, অর্থাৎ মায়াদ্বারাই জীব ও ঈশ্বরের ভেদজ্ঞান হয় ; কিন্তু অদ্বৈতই প্রকৃত তত্ত্ব, ইহার ব্যত্যয় হইতে পারে না।

শিষ্য। তাহা হইলে সকলই যদি এক ব্রহ্ম, দুই কিছু নাই, তবে এ নানাত্বের জ্ঞান আসে কোথা হইতে এবং কেন হয় ?

গুরু। অদ্য অনেক বকিয়াছি। তোমার এ প্রশ্নের উত্তর আর একদিন দিব। (স্বগতঃ) বাবাজী ঠাউরেছেন আমি একজন মস্ত বিদ্যাদিগ্‌গজ। যথাসাধ্য বলিব, তা'তে আমারওতো শিক্ষা হ'বে। এক ভরসা, বাবাজী দোষ গ্রহণ করিতে জানেন না।

(ক্রমশঃ)

সরল বিশ্বাস।

মানব দেবতা হয় বিশ্বাসের বলে,
বিশ্বাসীর সদা জয় এ মহীমণ্ডলে।
বিশ্বাসবিহীন নর পশুর সমান,
জন্ম জন্ম আসে যায়, নাহি পরিত্রাণ।

জনৈক সাধুর পত্নী, একটী শিশুসন্তান রাখিয়া, অকস্মাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। সাধু সেই শিশুসন্তানটী লইয়া, নিকটবর্ত্তী এক অরণ্য মধ্যে চলিয়া গেলেন। তথায় চিরদিন বাস করিবেন, লোকসমাজে আর আসিবেন না, এইরূপ স্থিরসংকল্প হইয়া, সাধু একটী কুটীর রচনাপূর্ব্বক, সেই স্থানেই কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

সাধুর তপ, জপ ও শিশুর লালন পালন ব্যতীত, আর অন্য কিছু কার্য্য ছিল না। প্রাতঃকালে উঠিয়া যখন তিনি তপ জপ করিতেন, শিশুটী তখন তাঁহার পার্শ্বে থাকিত। শিশুটী কাঁদিলেই তিনি অমনি তাহাকে কোলে করিতেন, ক্ষুধার সময় দুগ্ধ আনিয়া পান করাইতেন। সাধু এইরূপ কার্য্যকে মায়িক কার্য্য বলিতেন না; কারণ তাঁহার শিশুর প্রতি মায়া ছিল না, কেবল ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া তিনি তাহাকে ভালবাসিতেন। আরও তিনি বলিতেন, নিষ্কাম সংসার-সেবার নামই ঈশ্বর-সেবা।

শিশুটী শশি-কলার ন্যায় দিন দিন বড় হইতে লাগিল। ক্রমে এক এক বৎসর করিয়া, প্রায় সাত আট বৎসর হইল। ইতি মধ্যে সে কখন স্ত্রীলোক দেখে নাই। কেবল তাহার পিতাকে দেখিয়া, তাহার মনে মনে একরূপ ধারণা হইয়াছিল, এই পৃথিবীতে আর যদি কেহ থাকে, তাহারা ইঁহারই মত।

দৈবক্রমে সাধু অসুস্থ হইলেন, তিনি তাঁহার শিশুকে ডাকিয়া বলিলেন, এক্ষণে আমি আর উঠিতে পারিতেছি না, তুমি ঐ অদূরে গ্রামের মধ্যে যাইয়া, কিছু ভিক্ষা করিয়া আন। শিশু তাহার পিতার কথায় উত্তর করিয়া বলিল, গ্রামের মধ্যে কোথায় যাইব এবং কাহার কাছে কি বলিয়া ভিক্ষা চাহিব?

সাধু তাঁহার কুটীর দেখাইয়া বলিলেন, গ্রামের মধ্যে এইরূপ বড় বড় কুটীর আছে, তথায় আমার মত মানুষেরা বাস করে, তুমি তথায় গিয়া ভিক্ষা চাও; তাহাতে তাহারা যাহা দিবে তাহাই লইও।

বালক তখন ভিক্ষার ঝুলি লইয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং এক

গৃহস্থের বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা চাহিল। সেই বাটীর কর্ত্রী তাহার কন্যাকে ভিক্ষা দিতে কহিলেন; কন্যাটী যুবতী, সে যখন ভিক্ষা দিতে আসিল, বালক তাহার স্তনদ্বয় দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, ইহার বক্ষস্থল উচ্চ কেন? বোধ হয় ইহার কোন পীড়া হইয়া থাকিবে। বালক তাহাকে কহিল, তোমার বক্ষস্থল উচ্চ দেখিতেছি কেন? কি পীড়া হইয়াছে? যুবতী বালকের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল। বালক পুনরায় ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। বাটীর কর্ত্রী তাহার কন্যাকে কহিলেন, তুমি কি ভিক্ষা দিয়া আইস নাই?

কন্যা কহিল, ও আমাকে দেখিয়া পরিহাস করিল, তাই ভিক্ষা দিই নাই।

কর্ত্রী তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বালকের নিকট আসিলেন। বালক তাহারও বক্ষে স্তনদ্বয় দেখিয়া বলিল, তোমার বক্ষে ও কি হইয়াছে? কোন পীড়া হইয়াছে? কর্ত্রী শিশুর সরল ভাব দেখিয়া বলিলেন, তুমি কি কখন স্ত্রীলোক দেখ নাই? তোমার কি মা নাই?

বালক উত্তর করিল, স্ত্রীলোক কাহাকে বলে? আর মা-ই বা কাহাকে বলে আমি জানিনা।

কর্ত্রী বালকের কথায় বুঝিলেন, ইহার অল্প বয়সে মা মরিয়া গিয়াছে। তখন তিনি বালককে বলিলেন, যখন তুমি শিশু ছিলে, যখন তোমার চিবাইয়া খাইবার দাঁত ছিল না, তখন তোমাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত ভগবান্ ইহার ভিতর দিয়া দুগ্ধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার নাম স্তন, ইহা কোন পীড়া নয়। আমাদের নামই স্ত্রীলোক, আমার মত তোমার একটী মা ছিলেন, যাঁহার গর্ভে তুমি জন্মিয়াছিলে।

বালক এই কথা শুনিয়া, কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া, বলিল, হাঁ! তবে তুমি ভিক্ষা ফিরাইয়া লইয়া যাও। কারণ যখন আমার দাঁত ছিল না, তখন ভগবান্ আমাকে কত কৌশল করিয়া খাওয়াইয়াছেন, এক্ষণে যখন দাঁত হইয়াছে তখন তিনি অবশ্যই ভাত দিবেন। এই বলিয়া বালক চলিয়া গেল এবং সেই অবধি আর ভিক্ষা করিত না, ক্ষুধা পাইলে, ভগবানের নিকট অন্ন ভিক্ষা করিত।

মানবের ভালবাসা।

তোমারে দিয়ে মাটির ঘরে,
ধুলির বিছানা,
শিয়রে রাখি ভাঙ্গা ঘট,

সাধের ঝুলনা,
ঘুম পাড়ায়ে চিতার বুকে,
নিবিড়-ঘন-তিমিরে ঢেকে,

চলিয়া আসে সঙ্গীরা সব
ভুলিয়া বেদনা।
যদি কেহ আবেগ ভরে,
ফিরিয়ে চায় তোমার পরে,
সঙ্গীরা সব তাহারে ডে'কে,
চাইতে করে মানা;
অন্ত-বিহীন রাত্রি দিন,
পড়িয়া থাক সঙ্গীহীন,
তোমার পথে ফিরিয়ে কেহ,
করেনা আনা-গোণা!
বনের পাখী তোমারে ডাকি,
করে জ্বালাতন,
সন্ধ্যা-সকাল বৃক্ষ-লতা
করে আবাহন,
তারা তোমায় ভালবাসে,
ঘিরিয়া থাকে আশে-পাশে,
মেলিয়া থাকে করুণ-দৃষ্টি
সজল নয়ন।
তোমারে পাছে কুড়ায়ে পায়,
পথের পান্থ সরিয়ে যায়,
সরিয়ে যায়! পলায়ে যায়!
যত প্রিয়জন।
তাদের তুচ্ছ মায়ায় ভুলে,
আপন পূজা ছিলে যে ভুলে
প্রভাত বেলা পূজার কিছু
করনি আয়োজন।
এখন হায়! কেহত তারা,
নহে আপনজন,
যদি ফিরে পাও জীবন
ভয়ে ভীত প্রাণ।
উষার মুক্ত বাতাস জাগি,
শিশির বারি হৃদয়ে লাগি,
শ্মশান ঘরে নূতন প্রাণ,
যদি তুলে গান!
প্রভাতে যদি রবির কর,
পরশি ফিরে প্রাণের পর,
কাঁপায়ে পাতা বৃক্ষলতা
সরস করে প্রাণ,
চাঁদের কাছে মন্ত্র মাগি,
সাঁঝের তারা দুয়ারে জাগি,
চিতার বুকে নূতন প্রাণ
যদি তুলে গান,
নবজীবন ফিরিয়ে পে'লে
ভাঙ্গা পরাণ দিয়ে,
আবার ফিরে জুটিতে গেলে
তাদের সাথে গিয়ে,
আকুল তারা সে ভয়েতে,
ছড়ায় কাঁটা দুয়ারে পথে,
তোমার ছবি মুছিয়া ফেলে
আঁখির জলে ধুয়ে।
এমন তাদের যতন দেখে,
বাজিছে প্রাণে বাজিছে বুকে,
দুখের দিনে দেবতা তুমি
এস নিকট হয়ে,
শিয়রে ঢাল তোমার প্রেম,
শ্মশান হবে তীর্থধাম,
উঠিবে নাচি দগ্ধপ্রাণ,
চরণ ধূলি পেয়ে।

শ্রীরেবতীমোহন চৌধুরী।

কল্পতরু-শ্রীরামকৃষ্ণ।*

বৎসরান্তে পুনঃ আজ কল্পতরু-মূলে
একত্রিত তব ভক্তগণ;
যাহা যে চেয়েছে তাহা পাইয়াছে সবে,
তবু যেন অসন্তুষ্ট মন!
বুঝেছি হে প্রভো, মোরা চাহিতে জানি না,
কি চাহিতে কি চাহিয়া ফেলি!
বিষ। বিষ।। এ সংসার চাহিছে সর্ব্বদা
অনিত্যের মোহে সদা ভুলি।!
সুধাময়! যদি কেহ ছুটে সুধাপানে
মায়া-রজ্জু বেঁধে রাখে তারে;
তাই গো সন্ধান তব পাইতে পাবে না—
লোক কোথা? সুধাইবে কারে?
যদি কারু কাছে তার আতুর পরাণ ধায়
জিজ্ঞাসিতে তোমারি সন্ধান,—
অমনি স্বার্থান্ধ দুষ্ট স্ববশে লভিয়া তারে
শিক্ষা দেয় মান, অভিমান!
সবই ত তোমারি খেলা দোষ দিই কার?
খেলনায় ভুলাও সন্তানে;
তুমি যদি গুরুবেশে আঁখি না ফুটায়ে দাও
কিবা ফল বল এ জীবনে?
এবার ধরহ প্রভু এ মিনতি সবাকার;
শুদ্ধচক্ষু করহ প্রদান,
দাও দাও শুদ্ধা-ভক্তি সে রাঙা চরণতলে—
বিনিময়ে সঁপিব পরাণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণকমলাশ্রিত
সেবকবৃন্দ, কটক।

---

* কটক উৎসবে উপহার। ১লা জানুয়ারী, ১৯১০ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

মাঘ, সন ১৩১৬ সাল।

ত্রয়োদশ বর্ষ, দশম সংখ্যা।

ভাগ্য ও পুরুষকার।

আমাদের দেশের ছোট, বড় বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি সকলের মুখেই শুনিতে পাই যে, ভাগ্য যদি প্রসন্ন থাকে, দৈব যদি সহায় থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধ হয়। একজন এক কার্য্য করিয়া জয়লাভ করিলে, সকলেই বলিয়া থাকে যে, উহার ভাগ্যে ছিল তাই সিদ্ধি লাভ করিল। আবার একজন এক কার্য্য আরম্ভ করিয়া বিফল মনোরথ হইলে, সঙ্গে সঙ্গে সকল কণ্ঠেই সমুচ্চারিত হইয়া থাকে যে, উহার দৈব প্রতিকূল ছিল তাই নিষ্ফলকাম হইল। এরূপ বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহা বোধ হয় সুধীমাত্রই স্বীকার করিবেন।

দৈব সহায় থাকিলেই যে কার্য্য সিদ্ধ হয়, একথা অতি অমূলক ও ভিত্তিহীন। দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের যোগে কার্য্য সিদ্ধ হয়। দৈব পূর্ব্বজন্মের কৃত পুরুষকার——

"দৈবে পুরুষকারেচ কর্ম্ম-সিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকং॥"

দৈবের সহিত পুরুষকার যোগ না হইলে কিছুতেই কর্ম্ম-সিদ্ধ হয় না, একথা অতি সমীচীন। আমরা যদি পুরুষকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করত

কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে কি বাস্তবিকই আমরা দৈবানুগ্রহে কর্ম্মে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিব? না,—যেহেতু ঈশ্বর আমাদের হাত দিয়াছেন, পা দিয়াছেন, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা এমন কি ভালমন্দ, সদাসৎ বিচার করিবার উপযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে অক্ষম করিয়া এ সংসারে প্রেরণ করেন নাই। সর্ব্বকার্য্যক্ষম করিয়া এ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। চেষ্টা না করিয়া কেবল মুখে, আমার ভাগ্যে যদি থাকে, আমার দৈব যদি সহায় থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই অর্থ ও বিদ্যালাভ করিব বলিয়া, চুপ করিয়া যদি বসিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি কি প্রকারে অর্থ ও বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হইব?

এক জনের অদৃষ্টে আছে যে, সে একজন উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী হইবে, কিন্তু সে যদি যত্ন ও চেষ্টাপূর্ব্বক লেখাপড়া শিক্ষা করিবার প্রয়াসী না হয়, তাহা হইলে সে কিরূপে অদৃষ্ট-লিখিত পদ প্রাপ্ত হইবে? সে যদি অধ্যবসায় সহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধিভূষণে ভূষিত হইতে পারে, তাহা হইলে হয়ত সে সহজেই দৈবনির্দ্দিষ্ট পদলাভ করিতে পাবে। নতুবা দৈব অসমর্থ হইয়া পড়ে। চেষ্টাবিহীন দৈব যে সর্ব্বত্র সকল সময়ের জন্য ক্লীবের ন্যায় অফল-প্রসূ হইয়া থাকে, একথা সংসারস্থ মনুষ্যমাত্রেরই স্মরণ রাখিয়া চলা উচিৎ।

এইরূপ একজনের নিয়তি-পটে চিত্রিত আছে যে, সে রাজা হইবে, একজনের আছে যে, সে এককালীন বহু অর্থ লাভ করিবে, কিন্তু ইহারা যদি নিজ নিজ ভাগ্যের সহিত পুরুষকার যোগ করিবার চেষ্টা না করে, ইহারা যদি তত্তৎ কর্ম্ম সিদ্ধির জন্য যতদূর চেষ্টা ও যত্ন করা আবশ্যক, তাহা যদি না করে, তাহা হইলে কিরূপে দৈব সেই সেই কর্ম্ম সিদ্ধি করিয়া দিবে? তোমার টাকা পয়সা যথেষ্ট আছে, তুমি যদি চেষ্টা যত্ন করিয়া আহারের বন্দোবস্ত কর, তাহা হইলে উত্তমরূপে আহার করিতে পার। আর যদি তাহা না করিয়া কেবল আলস্যের ক্রোড় আশ্রয় করিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে কি দেবতা আসিয়া আহার সংগ্রহপূর্ব্বক তোমার মুখে তুলিয়া দিয়া যাইবে? না,—তাই বলিতেছি যে, পুরুষকার অভাবে দৈব কোন কার্য্যই সিদ্ধ করিতে পারে না।—"যথা পুরুষকারেন বিনা দৈবং ন সিদ্ধতি।" তবে যে, কচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন এককার্য্য অতি সহজে সম্পাদন করিয়া তাঁহার

অমৃতময় ফললাভ করিতেছে,—আবার অপর একজন সেই কার্য্য পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিয়াও অপূর্ণকাম হইতেছে, ইহার কারণ আর কিছুই না, যাহার দৈব অনুকূল ছিল, সে-ই সহজে সফলকাম হইল। আর যাহার দৈব প্রতিকূল ছিল, সে সহজ-সিদ্ধ ব্যক্তির অনুরূপ পুরুষকার প্রকাশ করিয়া অসিদ্ধকাম হইল। এরূপ স্থলে তাহার আরও অধিকতর প্রযত্নের দ্বারা কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। তীব্র পুরুষকারের দ্বারা নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু দৈব ভরসা করিয়া থাকিলে কখনই ইষ্ট সিদ্ধ হয় না।

কোন এক গ্রাম হইতে, একজন ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি জগন্নাথদেব দর্শন করিবার অভিলাষে শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিল। আমি, যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে আজকালকার ন্যায় এ দেশে রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল না, সর্ব্বত্রই পদব্রজে গমনাগমন করিতে হইত। সে ব্যক্তি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কোন এক লোকের বাটীতে অতিথিরূপে উপস্থিত হইল, দেখিল,—সে লোকটি বেশ সবলকায় তাহার সাংসারিক অবস্থাও বেশ উন্নত, কিন্তু সে নিজে বড়ই অলস, কেবল তামাক টানিয়া ও বাজে গল্প করিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সেই গৃহাগত ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি তাহাকে বলিল, মহাশয়। দেখিতেছি, সংসারে আপনার কোন অভাবই নাই, ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে আপনার শরীরও বেশ ভাল আছে, অতএব চলুন, জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া আসি। এই কথা শুনিয়া, সে বলিল, মহাশয়! কোন গণক আমার হাত দেখিয়া বলিয়াছে যে, জগন্নাথদেব দর্শন আমার অদৃষ্টে আছে, আমি নিশ্চয়ই জগন্নাথদেব দর্শন করিব। এরূপ অবস্থায় আমার আর অনাহার, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি কষ্ট সহ্য করিয়া তথায় যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। অদৃষ্টে যখন আছে, তখন নিশ্চয়ই জগন্নাথ দর্শন হইবে। এই কথা শুনিয়া সেই অতিথি আর কালবিলম্ব না করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল। কিছুকাল পরে সে ঐ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। যাহা যাহা দেখিবার ও শুনিবার সমস্তই দেখিয়া শুনিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। পুরাকালে জগন্নাথদেব দর্শন করিতে হইলে, যেরূপ পুরুষকার প্রকাশ করিতে হইত, তাহা যে করিয়াছিল সে-ই ভগবান দর্শনরূপ সাধুকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। আর যে, তাহা না পারিয়াছিল, সে-ই বঞ্চিত হইয়াছিল।

উদ্যম, উৎসাহ, সাহস, বীর্য্য, শক্তি, বুদ্ধি, পরাক্রম এই গুণ সমষ্টিই পুরুষকার নামে অভিহিত। এই গুণ সমষ্টি সম্পূর্ণভাবে যাহার বিদ্যমান

আছে, তাহাকে দেখিয়া অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারা পর্য্যন্তও ভীত হন—

"উদ্যমং সাহসং বীর্য্যং শক্তির্বুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ।
যড়েতে যত্র তিষ্ঠন্তি তস্মাদ্দেবোঽপি শঙ্কতে॥"

যে মহাত্মা প্রকৃত পুরুষকার লাভ করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রতিকূল দৈবকে প্রতিহত করিয়া অনুষ্ঠিত কর্ম্মের আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারেন। "প্রতিকূলং তদা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে।"

মহাশক্তি, প্রথমে পুরুষকারের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন না করিয়া দশাননকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থানদান করিয়াছিলেন, তাই সে সময়ে সীতানাথ তাঁহার বধসাধন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। পরে যখন লোক পিতামহ হিরণ্যগর্ভের উপদেশ অনুসারে অকাল বোধন করিলেন, অসীম পুরুষকারের প্রভাবে যখন রাবণের শক্তি বিনষ্ট করিয়া নিজে লাভ করিলেন, তখন তিনি অনায়াসে দশগ্রীবকে হত করিয়া সীতা উদ্ধাররূপ মহাকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিলেন। আবার মহাভারত-প্রসিদ্ধ ভীষ্মদেবও পুরুষকারের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, তাই তিনিও মহাশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ দুর্জ্জয় কার্য্য করাইতে পারিয়াছিলেন।

বড়ই দুঃখের বিষয় ইহাই যে, আমরা এই সমস্ত জ্বলন্ত উদাহরণ দেখিয়া শুনিয়াও শিক্ষা লাভ করিতে পারিনা। বলিতে পারি না,—আমরা কাহার অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়াছি, তাই পুরুষকারের মহিমা ভুলিয়া গিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া কেবল অদৃষ্ট, অদৃষ্ট, বলিয়া চীৎকার করিতেছি। আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের এখনও যথেষ্ট ছিদ্র, যথেষ্ট ত্রুটি, বিদ্যমান আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াও সে দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিতেছি না। এজন্য আমাদের লজ্জিত হওয়া কর্ত্তব্য। আর যে পশু, তাহার আর লজ্জা কোথায় যে হইবে? আমরা যদি মানুষ হইতাম, আমাদের যদি মনুষ্যত্ব থাকিত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ছিদ্রাদি সমস্ত দোষ সংশোধন করিয়া প্রযত্নের দ্বারা কর্ত্তব্যের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া জগন্মাতার কৃপাকণা লাভ করিতে পারিতাম।

এই সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া যে মহাত্মা পুরুষকারের দ্বারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মনুষ্য। আর যিনি নিরুৎসাহী, কর্ত্তব্যকর্ম্মে পরাঙ্মুখ এবং আলস্যপ্রিয়, তিনিই

আত্মবিদ্বেষী। এইরূপ আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিই চিররুগ্নের ন্যায় দৈবের উপর নির্ভর করতঃ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সকলই বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়া দেয়—

"যে সমুৎযোগ মুদস্থজ্য স্থিতা দৈবপরায়ণাঃ।
তে ধর্ম্মমর্থকামঞ্চ নাশয়ন্ত্যাত্ম বিদ্বিষঃ॥"

এ সংসারে যাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কামের উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে দৈব বিস্মিত হইয়া পুরুষকারকে আশ্রয় করাই শ্রেয়স্কর। পুরুষার্থই জীবের একমাত্র হিতকারী। "পুরুষার্থ মহারাজ জীবানাং হিতকারকঃ।" ভাই হে! এখন আমাদের দৈব প্রতিকূল, এখন যদি আমরা পুরুষকার ভুলিয়া গিয়া দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে শত সহস্রবৎসরেও আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; তাই বলি, অদৃষ্ট ভুলিয়া যাও, অদৃষ্ট ভুলিয়া গিয়া উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে পৌরুষের দ্বারা কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে থাক। পথে যদি কোনরূপ ছিদ্রাদি দোষ দেখিতে পাও, তাহা হইলে তখনই সে দোষ সংশোধন করিয়া বাঞ্ছিত ফল যে স্থানে বিদ্যমান আছে, সেখানে উপনীত হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রতিকূল দৈব বিনষ্ট হইবে, তাহা হইলে নিশ্চিতই জগন্মাতা কর্ম্মের ফল, তোমাদিগকে অর্পণ করিবেন। কিন্তু ভাই। সাবধান, দেখ যেন, তোমাদের প্রকাশিত পুরুষকার ছল, প্রবঞ্চনা, কপটতা দোষে দুষ্ট না হয়। যদি হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনের পুরুষকারে পরিণত হইবে। হিংসা, দ্বেষ-পরিশূন্য যে পুরুষকার, তাহাই ইষ্টদানে সমর্থ।

সংসারে যাহারা অলস ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি, তাহারাই এ বিশ্বজগতের দুর্ভাগা প্রাণী, তাহারাই দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ইহকালের ও পরকালের যাবতীয় শুভফলে প্রবঞ্চিত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন লোকই কাপুরুষ নামে অভিহিত। ইহাদের সংস্রব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা উদ্যমশীল, তাঁহারা এই শ্রেণীর লোকের উপদেশ পদদলিত করিয়া নিশ্চয়ই যে, সঙ্কল্পিত কর্ম্ম সিদ্ধির জন্য চেষ্টিত হইবেন, সে বিষয়ে আমরা অণুমাত্রও সন্দিগ্ধ নহি। তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, কার্য্য মনে মনে চিন্তা করিলে সিদ্ধ হয় না, চেষ্টার দ্বারাতেই সিদ্ধ হয়। মৃগ যদিও সিংহের অবশ্য খাদ্য, তথাপি সে কখনই নিদ্রিত সিংহের মুখের ভিতরে প্রবেশ করে না। সিংহের নিত্য

খাদ্য যে মৃগ, তাহাও চেষ্টা দ্বারা তাঁহার সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। নতুবা অনাহারে উপবাসে সিংহকে মরিতে হয়—

"উদ্যমেন হি সিদ্ধ্যন্তি কার্য্যানিন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥"

শ্রীকান্তিবর ভট্টাচার্য্য।

সুখী কে?

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদ্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে, জীবমাত্রের আশা ও আশানুরূপফল অবগত হইলে, দেখা যায় যে, জীবগণ সুখী হইবার জন্য প্রয়াসী। ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ সকলেই সুখের জন্য ব্যস্ত, কিন্তু সুখ কোথায়? সুখী কে?

মনের আশানুরূপ ফলকে সুখ, আর আশার প্রতিকূল বেদনীয় ভাবকে দুঃখ বলা যায়। সকলেই দুঃখকে বিদূরিত করিয়া সুখ ভোগ লালসায় মগ্ন, কিন্তু পায় কৈ? দরিদ্র দুর্দ্দশাগ্রস্তব্যক্তি মনে করে, ধনী হইলে সুখী হইতাম; ধনী—আবার অপর ধনীর নিকট ধন বিষয়ে দরিদ্র, সুতরাং তাহারও তৃপ্তি নাই—তাহারও আশা বলবতী। যিনি পৃথিবীর রাজা, যিনি বসুন্ধরা-গর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডার গ্রাস করিয়া কুবেরকেও ভাণ্ডারী করিয়াছেন—তিনিও তাহাতে অসুখী। তখন তাহার ত্রিলোকেশ্বরত্ব পাইবার আশা বলবতী, সুতরাং কোথায়ও সুখ নাই।

আমি দরিদ্র, উদরান্ন সংগ্রহে অক্ষম। কোন প্রকারেই আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূরণকারী আশার পরিতৃপ্তি হইতেছে না। পদে পদে, বিপদ—দুঃখ—লাঞ্ছনা—যাতনা—অনুতাপ। ভাগ্যক্রমে যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ হইলে, সৌভাগ্যফলে আমার অভিপ্সিত আশা ফলবতী হইলে, ধনীজন ভোগ্যজগতে কতিপয় দিবস আশা ফলবতীজনিত সুখ, সুখ বলিয়া বিবেচিত হইবে, কিন্তু তৎপরে সুখ কোথায়?

পূর্ব্বে, ছিন্ন জরাজীর্ণ কন্থা'পরি শায়িত হইয়া, নিদ্রার পরিবর্ত্তন কোন দিন সুখের নিদ্রা বা কোনদিন দুঃখের নিদ্রা বলিয়া অনুভূতি হইত, আজ আমার পূর্ব্বাশা প্রদফল হইয়াও, আজ সুধাধবলিত নানা চিত্রবিচিত্রিত সুরম্য অট্টালিকাভ্যন্তরে পর্য্যঙ্কোপরি কমলকুসুম সম সুকোমল শয্যায় শুভ্র

করিয়াও, সেই সুখ বা সেই দুঃখ। যে আশা পূর্ণ হওয়ায় সুখী হইলাম—আমার সে সুখ কোথায়? পূর্ব্বে আমার পেটের চিন্তাই বলবতী ছিল। সমস্ত দিন খাটিয়া যে অর্থোপার্জ্জন করিতাম, তাহাতেই আমার সুখ বা দুঃখ নিবদ্ধ ছিল। পূর্ব্বে বিষয়ের অভাবে, সম্পদের অভাবে, ঐশ্বর্য্যের অভাবে যে, সকল বিষয়েই পবিত্র ছিলাম। এখন বিষয়, সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যরূপ কণ্টকবৃক্ষের বিষময় কণ্টকজালে আবদ্ধ। পূর্ব্বে যদিও আমার বিষয়, সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য ছিল না, তবু আমার মন নিষ্পাপ ছিল, আমার মন অহঙ্কার শূন্য ছিল। এখন ঐশ্বর্য্য সম্পদ ও বিষয়জড়িত দোষের কালিমা রেথায় অন্তর কলুষিত। পূর্ব্বে মান অপমান, দ্বেষ হিংসা ও অহঙ্কার ছিল না। পূর্ব্বে বড় ছোট জ্ঞান ছিল না, পূর্ব্বে সংস্পর্শতা-জ্ঞান আসিতে পারিত না। কিন্তু বিষয় মদিরায় মত্ত হইয়া আর আমার সেদিন নাই, এখন আমার দুই সের ভারবহন করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়; এখন আমার ছোট বড় জ্ঞান হইয়াছে, এখন আমি সকলের সঙ্গে মিশি না—এখন আমি অহঙ্কারে মাথা নীচু করিয়া চলি না। পূর্ব্বে যথা ইচ্ছা বিচরণ করিতে, বিচরণ করিয়া প্রকৃতির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে পারিতাম, কিন্তু এখন মর্য্যাদা রক্ষায় ব্যাপৃত। তবে সুখী কে?

ধনী ব্যক্তিরা বিপুল সুখৈশ্বর্য্যপূর্ণ বিলাসসমুদ্রে সন্তরণ করিতেছেন, কিন্তু স্বজনাভাবে স্বজনমুখসন্দর্শন সুখহীন। দরিদ্রের পর্ণকুটীর জনপূর্ণ হইলেও ধনাভাবে মুখকান্তি মলিন ও শরীর রুগ্ন। মূর্খ দরিদ্র দুর্দ্দশাপন্নব্যক্তি বিদ্যা-শিক্ষা করিতে পারিল না বলিয়া, আক্ষেপ করিতেছে ও উষ্ণনিঃশ্বাস ছাড়িতেছে, আবার বিদ্বান ব্যক্তি অর্থোপার্জ্জনাশায় গোলাম সাজিয়া, গঞ্জনা ও যাতনা ভোগ করিতেছে। সকলেই এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক সুখের লালসায় ভিন্ন ভিন্ন পথের পথিক সাজিয়া, ভবের হাটে পণ্যসঞ্চয় করিতেছে,—অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া আয়ুক্ষয় করিতেছে—কিন্তু হায়, "পেটও ভরে না, সাধও মিটে না"—মনের আশা মনেই থাকে; দেখিতে দেখিতে ভবের হাটের কেনা বেচা ফুরাইয়া যায়। অতএব সুখী কে?

বাল্যকালে বালোচিত সুখে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই অল্প-বোধ সময়েও সুখ পাও নাই।—ক্রমে কিশোর আসিল—কিশোর আসিলে ভাগ্যফলানুসারে সুখা-শায়, ব্যবসায় সাধনোপযুক্ত বিষয়গুলি অভ্যাস করিলে, এবং ভাবিলে যৌবন আসিলে—যৌবনের অধিকারভুক্ত হইলে সুখী হইব। ক্রমে যৌবন আসিল, যৌবন তোমার মনে এক নবভাব আসিয়া উপস্থিত হইল, আর কে যেন

তোমাকে বলিয়া দিতে লাগিল "অভাব!" "অভাব!!" তুমি অমনি অভাব পূরণার্থে ছুটিলে—তখন ভাবিলে না যে প্রকৃতই তোমার কিসের অভাব? যা দেখ তাহারই অভাব। একে একে তোমার সকল অভাবগুলি পূরণ হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও তুমি সুখী নও। তখন তোমার মনে উদয় হইল, এ জগতে সুখী কে? কি পাইলে সুখী হওয়া যায়? কি করিলে সুখ মিলে? ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলে,—লোকে বিবাহ করে ও সুখী হয়। কিছুদিনের মধ্যে তুমিও বিবাহ করিলে—ভাবিলে সুখী হইবে। প্রেয়সীর মুখকমল অবলোকন করিলে, দু'এক দিন সংসারের সুখে আনন্দিত হইয়া উৎফুল্ল হইলে; কিন্তু তাতেই বা তোমার স্বস্তি কৈ?

তোমার এখন আর একটা ভাবনা বাড়িল, তখন আরো একটা অভিনব আশার কুহকজালে তোমার হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত করিল। শয়নে স্বপনে চিন্তা হইল, কিসে প্রিয়তমাকে সুখী করিবে, কিসে তাহার মন শান্তিতে থাকিবে। তখন গৃহচিন্তা, গৃহিণীচিন্তা, ভবিষ্য সন্তান-সন্ততির চিন্তা, ধনচিন্তা, জনচিন্তা, চিন্তায় চিন্তায় মনপ্রাণ ক্ষীণ হইতে লাগিল। তবে সুখী কৈ? "সংসারে দুঃখের অন্ত নাই" অথবা "কাহারও সুখ নাই।"—ইহা বড়ই-বিড়ম্বনা! সকলেই আশা-মদিরায় উন্মত্ত হইয়া সুখী হইবার লালসায় জীবন অতিবাহিত করিতেছে, কিন্তু কাহারো ভাগ্যে সুখ জুটিতেছে না। কখন ঘটিয়া উঠিলেও সুখী হয় না। কখন বা ঘটিয়াও ঘটিতেছে না। সংসার ইন্দ্রজাল—সংসার ভেল্কীবাজি, সংসার মায়া-মরিচীকা। যতদিন জীব এই ভেল্কীবাজির কুহকজালে আবদ্ধ থাকিবে, যতদিন এই আশামরিচীকার মায়াচক্রে চক্রাকারে ঘুরিতে থাকিবে, যতদিন মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবে, ততদিন সুখী কে? এ জগতের সুখ বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় ক্ষণকাল আনন্দ দিয়া কোথায় লুকাইয়া যায়, দেখিতে দেখিতে আর দেখিতে পাই না, ধরিব ধরিব মনে করি, অমনি পলাইয়া যায়—পাইতে পাইতে আর পাই না। আমি তাহাকে আমার করিব মনে করি, কিন্তু সে চঞ্চলার ন্যায় মুখ দেখাইয়াই চলিয়া যায়। কোথায় যায় জানি না;—যাহাকে জিজ্ঞাসা করি,—পথ বলিয়া দিতে পারে না, কেহই পথ পায় না—কেহই পথ জানেনা। তবে মনীষিগণ বলিয়া দিতেছেন—"তৃপ্তিই সুখ।" মনে স্থির করিয়া রাখ "তৃপ্তিই সুখ। সন্তোষ প্রেম ও সত্যানুরাগই অমূল্য রত্ন। প্রেমধনে ধনী হইলে আর দুঃখ নাই কেবলই সুখ।" কিন্তু খেপা মন যে প্রবোধ মানে না—ভাবিয়া বুঝে না—কেবল অতৃপ্ত থাকিয়া

অধিকতর সুখ চায়। সে যে প্রথমেই সুখী হতে চায়—সে যে দুঃখের লেশমাত্র স্পর্শ করিতে কাতর। খেপা মন ইন্দ্রিয়াদি দলে মিশিয়া বিষয়-মদিরা পানার্থে লোলুপ। বিষয় বাসনার সঙ্ঘটন হইলে, কত আনন্দ;—কিন্তু সে আনন্দে ক্ষণিক বিভোর হইয়াই আবার অধিক বা অন্যরূপ চায়। এ আশার বিরাম নাই—সুখ-শৈলের পার নাই—প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নাই—সুতরাং সুখ কৈ?

সুখ অন্তরে বাহিরে, দেশে বিদেশে, স্ববাসে প্রবাসে, সকল স্থানেই আছে—সকলেই প্রার্থনা করে কিন্তু প্রার্থনা পরিপূরণ হয় কৈ? সুখ আছে, অথচ পাইব না, মানব-জীবনে এতদপেক্ষা বিড়ম্বনার বিষয় আর কি হইতে পারে? "ভাই! আমাকে সুখের পথ দেখাইয়া দাও"—এরূপ কাতরোক্তি যাহার নিকট করিবে, তিনিও তোমার মত কাতর। তিনিও একটা পথ বলিয়া দিবেন, কিন্তু তিনিও সে পথে সুখ পান নাই। তবে উপায় কি? উপায়—"উপদেষ্টা, শাস্ত্র ও সংসার তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর,—পাইলেও পাইতে পারিবে। যদি তাহাতেও না পাও, তবে সুখ নাই—অথবা যদি থাকে, তবে তাহা দুষ্প্রাপ্য বা দুঃসাধ্য।"

জগতে যে দিকে তাকাই সে দিকেই সুখ নাই—তবে সুখী কে? তবে কি পাইলে সুখী হওয়া যায়? প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ! শৈশবের সুখ, বাল্য-কালের সুখ, যৌবনের সুখ, সমস্ত কালের সুখই আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম, কিন্তু সুখী কে? কিছুতেই ত সুখসাধ মিটিল না। যে সংসার কত মধুর, কত ললিতললাম হইয়া সংসার-সেবকের চক্ষে অবিরত প্রতিভাত হয়; যাহার উন্মাদিনী মদিরায় মত্ত হইয়া মানুষ জীবন-সংগ্রামে অবিরত ধাবিত হইতেছে—তাহার মোহনমূরতি ছুঁই ছুঁই করিয়া কতবার দৌড়াইয়া যাই—কিন্তু হায়! সে অপূর্ব্ব চান্দ্রমা আমার নিকট হইতে ক্রমশই সরিয়া দাঁড়ায়, তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারি না। এমন বিড়ম্বনা আর আছে কি? ভগবান সংসার-সেবার উপকরণ সমস্তই আমাকে প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন, কিন্তু সকলে সেই সমস্ত উপকরণ লইয়া যেমন তন্ময় হইয়া—তদেকাগ্রচিত্ত হইয়া তাহার রস পান করে—সেরূপ স্বাদিকাবৃত্তি আমাতে নাই। কেন? তাহারা যেরূপ সুখানুভব করে, আমি তাহা পারি না কেন? যখন আমি তাঁহাদের নিকট সুখী হইবার কথা জিজ্ঞাসা করি, তখন তাঁহারা একবাক্যে বলেন, "আমি সুখী কৈ?" বলবতী বিষয় বাসনায় জগৎ বিমোহিত, জগতের সাধ্য কি যে নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রেমিক হয়! যদি সংসার উপাদেয় বলিয়াই

চিরদিন জীবন শেষ করিলে, অশনে ও পানে উদর পরিপূর্ণ করিলে, তবে পরিণাম ভাবিলে কৈ? তবে সুখের পথ—শান্তির পথ চিনিলে কৈ? যদি সংসার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া থাক, তবে স্বার্থের বাঁধনকে ছিন্ন করিয়া দাও। কিন্তু সে স্বার্থের বাঁধন ত কাটে না—এখন উপায় কি? এখন কোন পথে যেতে হবে? সংসারে সুখ আছে তথাপি পাই না—ক্লেশভোগ করি, তথাপি সংসার ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। আজ যাহার বদনকমল হাস্যময়, কাল হয় ত সে মহানিদ্রায় নিদ্রিত। আজ অমুক মরিল, আমার মনে একটা দুঃখ হইল—কিন্তু আমি যে মরিব এ কথাও জানি, কিন্তু বুঝি না। সংসারের লীলাখেলা এরূপ জানি, তথাপি বুঝি না। যাহা হউক, এস,—আমরা ব্রহ্ম ও প্রকৃতি (অর্থাৎ পিতা ও মাতা) এই উভয়ের চরণে স্মরণ লই। যে পিতামাতার স্নেহে ও যত্নে লালিতপালিত হইয়া আমাদের শ্রদ্ধাবৃত্তি অঙ্কুরিত হইয়াছে, সেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা কেন্দ্রীভূত করিয়া তাঁহাদেরই চরণে আমাদের সমস্ত বিষয় অর্পণ করা আমাদের পক্ষে যেরূপ স্বাভাবিক এমন আর কিছুই নাই। ভগবানকে পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির ভিতর দিয়া উপাসনা করা, সাধকের সহজসিদ্ধ সাধনা। যে ভাব আমাদের মর্ম্মগত, ধর্ম্মরাজ্যে তাহারই পরিপুষ্টি আমাদের সহজ উপায়।

যিনি সর্ব্বভূতে সেই প্রেমস্বরূপ নিত্যানন্দময়কে বিশ্বাসের দ্বারা উপলব্ধি করিবার জন্য—

"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়চ"

জগতের সেবায় তিনি সদা নিযুক্ত হন এবং তখন তিনি জগতময় প্রেমময়ের প্রেমতরঙ্গের ঢেউ দেখিতে থাকেন এবং বলিতে থাকেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

যখন সর্ব্বজীবে সমভাব হইয়াছে, যখন ছোট বড় জ্ঞান বিদূরিত হইয়া সর্ব্বজীবে ভগবানের বিকাশ জ্ঞান হইয়াছে—তখন তাহার দুঃখ কোথায়? যাঁহার এরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই চিরসুখী।

ব্রহ্মচারী প্রেমব্রত।

বেদান্তের আভাষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২০৮ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় প্রস্তাব।

একত্ব ও নানাত্ব-জ্ঞান।

শিষ্য। এই যে একত্ব ও নানাত্ব জ্ঞান, ইহার কারণ কি?

গুরু। দেখ এই যে অজ্ঞান বা অবিদ্যার কথা শুনিলে ইহা দুই প্রকার যথা—সমষ্ট্যজ্ঞান ও ব্যষ্ট্যজ্ঞান। সমষ্টি অর্থাৎ কোন বস্তুর সকল অংশকে একত্র করিয়া একটী বলিয়া মনে করা (taken collectively as one whole); ব্যষ্টি অর্থাৎ প্রত্যেক অংশ গুলিনকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লইয়া বহু মনে করা (taken distributively as many)। এই সমষ্ট্যজ্ঞান একত্ব জ্ঞানের কারণ এবং ব্যষ্ট্যজ্ঞান নানাত্ব বা বহুত্ব জ্ঞানের কারণ। শ্রুতিতে আছে "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" এক অজা বা জন্মরহিত প্রকৃতি লোহিত (রজঃ বা তেজঃ), শুক্ল (সত্ব বা অপ্) ও কৃষ্ণ (তম বা অন্ন) রূপ ধারণ করিয়াছে ("যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য" ছান্দোগ্য ৬ ৪-১)। এস্থলে প্রকৃতি সমষ্টিরূপে গৃহিত হইয়াছে এবং "ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপমীয়তে" ইন্দ্র স্বীয় মায়া দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন—এস্থলে ব্যষ্টি বা বহুভাবে গৃহিত হইয়াছে; যেমন বৃক্ষের সমষ্টিকে একত্ব বোধক বন, বা জলের সমষ্টিকে একত্ব বোধক জলাশয় বলে এবং প্রত্যেক বৃক্ষটী পৃথকভাবে বা জলের প্রত্যেক অংশকে পৃথকভাবে লইলে নানাত্ব বা বহুত্ব ব্যপদেশ হইয়া থাকে। অতএব একত্ব-বোধক শ্রুতি ও নানাত্ববোধক অন্যান্য শাস্ত্রাদির মধ্যে কোন বিরোধ নাই বুঝিয়া রাখ, কেবল সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে গ্রহণই ইহার কারণ।

শিষ্য। তবে কি সমষ্ট্যজ্ঞান ও ব্যষ্ট্যজ্ঞানে কোন প্রভেদ নাই?

গুরু। প্রভেদ আছে বৈকি,—

"সমষ্টিস্তীশ্বরোপাধির্মায়া শব্দেন ভণ্যতে।
বিশুদ্ধসত্বপ্রাধান্যমত্রোক্তং বেদবাদিভিঃ॥"

সমষ্ট্যজ্ঞান সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের উপাধি এবং সেই সমষ্ট্যজ্ঞানের নামই মায়া। বেদবাদিরা, বলেন এই অজ্ঞানসমষ্টিরূপা মায়াতে বিশুদ্ধ অর্থাৎ

রজঃ ও তমদ্বারা অকলুষীকৃত, সত্ত্বগুণের আধিক্য আছে। বেদান্তসারে আছে :—"ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্ট উপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদি-গুণকং সদসদব্যক্তমন্তর্যামি জগৎকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে" অর্থাৎ এই অজ্ঞানসমষ্টি উৎকৃষ্ট উপাধিবিশিষ্ট, অতএব তাহা বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান ; এই অজ্ঞানসমষ্টি দ্বারা যিনি উপহিত, কিনা উপাধি-বিশিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, আছে বা নাই বলিয়া অবচনীয়, অন্তর্যামী ও জগৎকারণ "ঈশ্বর" এই অভিধা বা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে ; সকল অজ্ঞানের অবভাসক, তাই তিনি সর্ব্বজ্ঞ ; যথা মুণ্ডক উপনিষৎ, প্রথম মুণ্ডক, প্রথম অধ্যায়, নবম শ্লোকে :—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে॥"

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বজ্ঞ (যিনি সাধারণতঃ সমুদায় জানেন who knows all generally) সর্ব্ববিৎ (যিনি সমুদায় বিশেষরূপে জানেন who knows all particularly) এবং যাঁহার তপ জ্ঞানময়, তাঁহা হইতেই (হিরণ্যগর্ভাখ্য) ব্রহ্ম নাম, রূপ এবং অন্ন জন্মে। পঞ্চদশিকার শ্রীমৎবিদ্যারণ্য মুনীশ্বর, ইহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"চিদানন্দময়ব্রহ্ম প্রতিবিম্বসমন্বিতা।
তমোরজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা॥
সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যা চ তে মতে।
মায়াবিম্বোবশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥"

ইহার অর্থ এই যে :—চিদানন্দময় পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যাহাতে বর্ত্তমান, তিনিই (লোহিত শুক্লকৃষ্ণরূপা) সত্ত্ব রজ ও তম গুণের সাম্যাবস্থারূপা (in a state of equlibrium) প্রকৃতি ; এই প্রকৃতি দ্বিবিধা। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সত্ত্বের প্রাধান্য অনুসারে সেই প্রকৃতি মায়া ও অবিদ্যা নামে অভিহিতা হন। মায়াবিম্ব, কিনা মায়াতে প্রতিফলিত চিদাত্মা, মায়াকে স্বীয় বশবর্ত্তিনী করিয়া সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ঈশ্বর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সমষ্টি অজ্ঞানই অখিল প্রপঞ্চের কারণশরীর।

শিষ্য। জগৎপ্রপঞ্চের আবার কারণশরীর কি ?

গুরু। সেই সমষ্ট্যজ্ঞানরূপা মায়া নিখিল প্রপঞ্চের উপাদান কারণ এবং লীয়মানস্বভাবা (তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নাশ হয়) বলিয়া তাহাকে কারণশরীর বলে।

"সা কারণশরীরং স্যাদানন্দময়কোষকঃ।
সুষুপ্তিশ্চ লয়স্থানমুৎকৃষ্টোপাধিরেব সা॥"

অর্থাৎ সেই সমষ্ট্যজ্ঞানরূপা মায়া কারণশরীর এবং ইহাতে আনন্দপ্রাচুর্য্য থাকায় এবং উহা কোষের ন্যায় আচ্ছাদক বলিয়া উহাকে আনন্দময়কোষ বলে; আবার, তাহাতে সর্ব্বোপরমত্ব বা স্বঃ অর্থাৎ তাহাতে চিত্তের সকল বৃত্তি উপরত বা নিরোধ প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাকে সুষুপ্তিও বলে, এবঞ্চ, তাহা ব্যষ্টি ও সমষ্টি, স্থূল এবং সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয়ের আধার বলিয়া উহাকে লয়স্থান বা প্রলয় নাম দেওয়া হয় অথচ এই মায়া সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের একটী উপাধি বিশেষ। বেদান্তসারে আছে:—"অস্যেয়ং সমষ্টিরখিল কারণত্বাৎ কারণশরীরং, আনন্দ প্রচুরত্বাৎ কোষবদাচ্ছাদকত্বাচ্চ আনন্দময়কোষঃ, সর্ব্বো-পরমত্বাৎ সুষুপ্তিঃ অতএব স্থূল সূক্ষ্মলয়স্থানমিতি চ উচ্যতে।"

শিষ্য। সমষ্টি অজ্ঞান বা মায়া এইরূপ। এক্ষণে ব্যষ্টি অজ্ঞান বা, পঞ্চদশিকায় যাহাকে অবিদ্যা বলচেন, তাহা কিরূপ বলুন।

গুরু। ব্যষ্ট্যজ্ঞান কি তাহা বলিতেছি, শোন,—

"জীবোপাধিস্তু তদ্ব্যষ্টিস্তস্যাঃ সংজ্ঞাশ্চ পূর্ব্ববৎ।
মলিনসত্ত্বপ্রধানাহসৌ নিকৃষ্টোপাধিতাং গতা॥

অর্থাৎ সমষ্ট্যজ্ঞান যেমন ঈশ্বরের উপাধি, ব্যষ্টি অজ্ঞান সেইরূপ প্রত্যেক জীবের উপাধি; সমষ্ট্যজ্ঞানের ন্যায় ইহারও পূর্ব্বোক্ত কারণ শরীরাদি সংজ্ঞা আছে। ইহা নিকৃষ্টের, অর্থাৎ জীবের (as opposed to উৎকৃষ্টের অর্থাৎ ঈশ্বরের), উপাধি বিশেষ বলিয়া মলিনসত্ত্বপ্রধানা অর্থাৎ রজঃ ও তম দ্বারা মলিনীকৃত সত্ত্বগুণাধিক্য বিশিষ্ট। এই ব্যষ্ট্যজ্ঞানে উপহিত যে চিদাত্মা তাহাকে "প্রাজ্ঞ" বলে। তাই বেদান্তসার বলিতেছেন:—"ইয়ং ব্যষ্টির্নিকৃষ্টোপাধিতয়া মলিনসত্ত্বপ্রধানা। এতদুপহিতং চৈতন্যমল্পজ্ঞত্বানীশ্বরত্বাদি-গুণকং 'প্রাজ্ঞ' ইতি উচ্যতে। একাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য প্রাজ্ঞত্বং অস্পষ্টো-পাধিতয়াহনতিপ্রকাশকত্বং অস্যাপীয়মহঙ্কারাদিকারণত্বাৎ কারণশরীরং আনন্দ প্রচুরত্বাৎ কোষবদাচ্ছাদকত্বাৎ চ আনন্দময়কোষঃ সর্ব্বোপরমত্বাৎ সুষুপ্তিঃ অতএব স্থূলসূক্ষ্মশরীরলয়স্থানমিতি চ উচ্যতে।" এই ব্যষ্ট্যজ্ঞান নিকৃষ্টের অর্থাৎ জীবের উপাধি, সুতরাং মলিনসত্ত্বপ্রধান এবং ইহাতে উপহিত চৈতন্য অল্পজ্ঞত্ব, অনীশ্বরত্বাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া "প্রাজ্ঞ" এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। পৃথক্ পৃথক্ অজ্ঞানের অবভাসক বলিয়া উক্ত অজ্ঞানব্যষ্টিকে প্রাজ্ঞ এবং

উপাধির অস্পষ্টত্ববশতঃ অনতিপ্রকাশক বলা যায়। ইহা জীবের অহঙ্কারাদির কারণ এবং শীর্য্যমান স্বভাব (জ্ঞানোদয়ে শীর্ণ বা নষ্ট হয়) বলিয়া কারণ-শরীর, আনন্দপ্রাচুর্য্য হেতু এবং কোষের ন্যায় চিদাত্মাকে আচ্ছাদন করে বলিয়া আনন্দময়কোষ, কারণশরীরে সকল চিত্ত- বৃত্তি উপরত বা নিরোধ প্রাপ্ত হয় বলিয়া সুষুপ্তিঃ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের লয়স্থান। এ বিষয়ে শ্রীমৎ বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর লিখিয়াছেন :—

"অবিদ্যাবশগস্তন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ ॥"

অর্থাৎ উক্তব্যষ্ট্যজ্ঞান বা অবিদ্যাতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সমন্বিত যে চৈতন্য তিনি অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া "অন্য" অর্থাৎ "জীব" নামে কীর্ত্তিত হ'ন এবং সেই অবিদ্যার নির্ম্মলতা ও মলিনতার তারতম্য প্রযুক্ত ঐ জীব দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি নানা প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অবিদ্যাই কারণশরীর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে এবং সেই কারণশরীরাভিমানী জীবের নাম "প্রাজ্ঞ"। যেমন অজ্ঞান দুই প্রকার, এইরূপ সূক্ষ্মশরীর দুই প্রকার।

শিষ্য। সূক্ষ্ম শরীর কাহাকে বলে ?

গুরু। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রোত্রত্বকচক্ষুর্জ্জিহ্বাঘ্রাণ), পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্‌পাণিপাদপায়ু উপস্থ), পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ অপান ব্যান, উদান ও সমান) এবং বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট শরীর সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গশরীর। এই সূক্ষ্মশরীর আবার দুই প্রকার,—

"দ্বেধা সূক্ষ্ম শরীরং স্যাৎ সমষ্টীব্যষ্টিভেদতঃ।
সমস্তৈক্যৈকবুদ্ধিস্থং সমষ্টিঃ স্যাদরণ্যবৎ ॥
ভেদবুদ্ধিকৃতা ব্যষ্টির্ব্বিজ্ঞেয়া বৃক্ষবত্তথা।
সমষ্টিঃ সূক্ষ্মদেহানামুপাধিঃ পদ্মজন্মনঃ ॥"

অর্থাৎ সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর ও ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীর, যেমন অনেক গুলিন বৃক্ষের সমষ্টিকে বন বলা যায় এবং প্রত্যেক বৃক্ষ পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করিলে ব্যষ্টি হয়। সেইরূপ সূক্ষ্মশরীরসমূহকে একটী মনে করিলে সমষ্টি এবং প্রত্যেক সূক্ষ্মশরীর পৃথক্ পৃথক্ লইলে ব্যষ্টি হয়। এই সূক্ষ্ম শরীর সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্যকে "সূত্রাত্মা," "হিরণ্যগর্ভ" ও "প্রাণ" বলিয়া উক্ত হয়, কেননা ইহা সূত্রের ন্যায় সকল সূক্ষ্মশরীরকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। পঞ্চদশিকার বলিয়াছেন :—

"বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি এই সপ্তদশ অঙ্গে সূক্ষ্ম শরীর গঠিত, তাহাই লিঙ্গশরীর নামে কথিত হয়।

শিষ্য। সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরকে তো বল্লেন হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়; ব্যষ্টিসূক্ষ্ম শরীরকে কি বলে?

গুরু। তৈজস বলে, যথা—

"প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসত্বং প্রপদ্যতে।
হিরণ্যগর্ভতামীশ স্তয়োর্ব্ব্যষ্টি সমষ্টিতা॥"

পূর্ব্বে উক্ত মলিনসত্ত্বপ্রধানা অবিদ্যা উপাধিক প্রাজ্ঞ নামক জীব তেজোময় অন্তঃকরণ উপলক্ষিত ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরে অভিমানবশতঃ (আমিই সেই, এইরূপ মনে করায়) "তৈজস" নাম প্রাপ্ত হ'ন। তাহা হইলে দেখিতেছ, সূক্ষ্মশরীরাভিমানী জীবের নাম "তৈজস" এবং সূক্ষ্মশরীরাভিমানী ঈশ্বরের নাম "হিরণ্যগর্ভ।"

শিষ্য। হিরণগর্ভ ও তৈজস উভয়েই যদি সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী হইলেন, তাহা হইলে দুইটীর মধ্যে প্রভেদ কি?

গুরু। এই তো বলিলাম, তৈজস ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী এবং হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরাভিমানী, অর্থাৎ এক একটী সূক্ষ্মশরীরাভিমানী জীব এক একটী তৈজস এবং সমস্ত সূক্ষ্মশরীরাভিমানী ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ নামে বেদান্ত শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। হিরণ্যগর্ভ এক, তৈজস নানা।

শিষ্য। স্থূল শরীরেরও কি এইরূপ ব্যষ্টি সমষ্টি আছে? যদি থাকে তাহা কি?

গুরু। আছে বৈ কি। স্থূল শরীর চারি প্রকার, যথা—জরায়ুজ অর্থাৎ যে সকল শরীরের জরায়ু বা মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম; অণ্ডজ অর্থাৎ অণ্ড বা ডিম হইতে জাত শরীর; স্বেদজ অর্থাৎ পূতিপ্রাপ্ত জলাদি হইতে জাত শরীর এবং উদ্ভিজ্জ কি না মৃত্তিকা ভেদ করিয়া যাহা জন্মায়।

"তৎসমষ্টিরুপাধিঃ স্যাদ্বিরাজোব্রহ্মণস্তথা।"

অর্থাৎ এই চতুর্ব্বিধ স্থূলশরীর সমষ্টিতে উপহিত চিদাত্মাকে শ্রুতিতে "বিরাট্" বলে। এবঞ্চ—

"হিরণ্যগর্ভঃ স্থূলেহস্মিন্ দেহে বৈশ্বানরো ভবেৎ।"

অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভই সমষ্টি স্থূলদেহে অভিমানী হইয়া, অর্থাৎ স্থূলদেহে অহং বুদ্ধি—আমি এইরূপ জ্ঞান—করিয়া "বৈশ্বানর" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। অতএব বুঝিতেছ সমষ্টি স্থূল শরীরে উপস্থিত চৈতন্যের দুইটী নাম, "বিরাট" ও "বৈশ্বানর।" আর,—

"ব্যষ্টিঃ স্থূলশরীরাণাং বিশ্বোপাধিরিতীর্য্যতে।"

ব্যষ্টি স্থূলশরীর সকল "বিশ্ব" নামক জীবের উপাধি, অর্থাৎ ব্যষ্টিস্থূলশরীরে উপহিত চৈতন্যকে "বিশ্ব" এই আখ্যা দেওয়া হয়। পঞ্চদশকার বলিতেছেন,

"তৈজসা বিশ্বতাং যাতা দেবতির্য্যঙ্ নরাদয়ঃ।"

অর্থাৎ তৈজস সংজ্ঞক জীবগণই একৈক স্থূল দেহের অভিমানে দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইত্যাদি নানা প্রকারে "বিশ্ব" এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ব্যষ্টিস্থূলশরীরাভিমানী তৈজসকে বিশ্ব বলিবার কারণ বেদান্তসারে এইরূপ আছে,— "সূক্ষ্মশরীরাভিমানমপরিত্যজ্য স্থূলশরীরাদিপ্রবেষ্টৃত্বাৎ"—অর্থাৎ তাঁহাকে "বিশ্ব" বলিবার কারণ এই যে ঐ চৈতন্য সূক্ষ্ম-শরীরের অভিমান পরিত্যাগ না করিয়াই স্থূলশরীরে (বিষ্ট) প্রবিষ্ট হ'ন (বিশ ধাতু কন্ = বিশ্ব)।

চতুর্থ প্রস্তাব।

অবিদ্যার শক্তিদ্বয়।

শিষ্য। সে দিবস আপনি বলিয়াছিলেন যে জীব ও ব্রহ্মবিভাগে মায়াই হেতু। এরূপ প্রভেদ মায়া কিরূপে দেখায়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সেইটী আরও উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিবেন কি ?

গুরু। দেখ বাবা, পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, শ্রবণ কর, মায়ার দুইটী শক্তি, একটী "আবৃতি" শক্তি, অন্যটী "বিক্ষেপ" শক্তি, যথা—

"অজ্ঞানস্য তু শক্তি দ্বে স্ত ইত্যুক্তং মনীষিভিঃ।
আবৃতিশ্চৈব বিক্ষেপঃ ক্রমাদ্দ্বে নামনীতয়োঃ॥
অন্তর্দৃক্‌দৃশ্যয়োর্ভেদং বহিশ্চ ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
কিঞ্চ লোকস্থিতুর্বুদ্ধিং প্রচ্ছাদ্যাত্মস্বরূপকম্॥
আবৃণোতীতি তত্ত্বজ্ঞৈরাবৃতিঃ শক্তিরুচ্যতে।
বিক্ষেপশক্তিরুক্তা চ ভবনাদ্বহুরূপতঃ।"

অর্থাৎ জগৎকারণ অবিদ্যার দুইটী শক্তি আছে, আবৃতি বা আবরণ ও বিক্ষেপ; প্রথমে আবরণশক্তি, পরে বিক্ষেপশক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে; যেমন অজ্ঞান প্রথমে রজ্জুটাকে আবৃত করে, পরে তাহার উপর সর্পরূপ বিক্ষিপ্ত (project) করিয়া রজ্জুটাকে সর্পাকারে অবভাসিত করে। যে শক্তিদ্বারা অবিদ্যা দৃক্‌দৃশ্য, অর্থাৎ দ্রষ্টারূপ চিদাত্মাকে এবং তৎপ্রকাশ্য বুদ্ধি প্রভৃতিকে আবরণ করিয়া আত্মা ও বুদ্ধি প্রভৃতিকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তুরূপে প্রতিভাসিত করে, কিম্বা শরীরবহিঃস্থিত সৃষ্টি, অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ ও ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপে অবভাসিত করে, সেই শক্তির নামই আবৃতি বা আবরণ শক্তি (power of envelopment), অধিকন্তু যে শক্তিদ্বারা অবিদ্যা দ্রষ্টার দৃষ্টিসাধনী বুদ্ধিকে স্বীয় অন্তরালে রাখিয়া আত্মস্বরূপকে, অর্থাৎ অখণ্ডসচ্চিদানন্দাত্মভাবকে, আবরণ করে, কিম্বা আত্মস্বরূপকে স্বরূপে প্রকাশ হইতে দেয় না, সেই শক্তি আবৃতি শক্তি (power of projection) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শিষ্য। আচ্ছা, ব্রহ্মের তুলনায় অবিদ্যা অতি ক্ষুদ্র, তবে এই ক্ষুদ্র অবিদ্যা কিরূপে যিনি সর্ব্বজগন্ময়, তাঁহাকে আবরণ বা envelope করে?

গুরু। উত্তম কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, বাবা। সসীম অবিদ্যা কিরূপে অসীম ব্রহ্মকে আবরণ করে, ইহার উত্তর শুন,—

"অল্পোঽপি মেঘোঽনেক যোজনায়তমাদিত্যমণ্ডল-
মবলোকয়িতৃবুদ্ধিপিধায়কতয়াচ্ছদয়তীব তাদৃশং সামর্থ্যং।"

অর্থাৎ, মেঘখণ্ড অতি ক্ষুদ্রতর হইলেও, দ্রষ্টার দৃষ্টিপথ রোধ করে বলিয়া বহু যোজনায়ত সূর্য্যমণ্ডলকে আচ্ছাদন করিয়াছে মনে হয়, সেইরূপ অবিদ্যা বা অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইলেও সংসারী অবলোকয়িতার বুদ্ধিকে আবৃত করে বলিয়া অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে আবরণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাই লিখিয়াছেন—

"ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়া।"

ইহার অর্থ,—অজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকে যে সূর্য্য মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রভাশূন্য হইয়াছে, কিন্তু তাহার নয়ন যে মেঘে আচ্ছাদিত হইয়াছে, সে তাহা জানেনা।

শিষ্য। এক্ষণে যাহা বলিতেছিলেন, বলুন।

গুরু। এইবার বিক্ষেপশক্তির কথা বলিতেছি, শুন। অবিদ্যা যে শক্তি দ্বারা আবৃত বস্তুকে অভিনবরূপার্থ বিক্ষেপ করে বা সম্ভাবিত করে, সেই শক্তিকে

বিক্ষেপ শক্তি বলে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, অধিষ্ঠান বা সম্মুখস্থিত বস্তুটী, বিশেষরূপে অবধারিত হইতে না হইতেই তাহাতে তাহার বিপরীত বস্তু দৃষ্ট হয়, যেমন ঈষদন্ধকারে সম্মুখে পতিত শুক্তিকাখণ্ড বা রজ্জুখণ্ড, জিনিষটা প্রকৃত কি তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই, রৌপ্য বা সর্পরূপে অবভাসিত হয়। এ বিষয়ে পঞ্চদশিকার, শ্রীমৎ বিদ্যারণ্য, এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"অয়ং জীবো ন কূটস্থং বিবিনক্তি কদাচন।
অনাদি রবিবেকোহয়ং মূলাবিদ্যেতি গম্যতাম॥
বিক্ষেপাবৃতি রূপাভ্যাং দ্বিধাবিদ্যা প্রকল্পিতা।
ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইত্যাপাদানমাবৃতিঃ॥
* * * * * * *
অবিদ্যাবৃতকূটস্থে দেহদ্বয়যুতা চিতিঃ।
শুক্তৌরূপ্যবদধ্যস্তা বিক্ষেপাধ্যাস এব হি॥
ইদমংশস্য সত্যত্বং শুক্তিগং রূপ্য ঈক্ষ্যতে।
স্বয়ন্ত্বং বস্তুতা চৈবং বিক্ষেপে বীক্ষ্যতেঽন্যগম্॥
নীলপৃষ্ঠত্রিকোণত্বং যথা শুক্তৌ তিরোহিতম্।
অসঙ্গানন্দতাদ্যেবং কূটস্থেঽপি তিরোহিতম॥
আরোপিতস্য দৃষ্টান্তে রূপ্যং নাম যথা তথা।
কূটস্থাধ্যস্তবিক্ষেপ নামাহমিতি নিশ্চয়ঃ॥"

অর্থাৎ,—সংসারী জীব কোন মতে কূটস্থ চৈতন্যের স্বরূপ বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় না, সেই অবিবেচনা শক্তিকে অনাদি অবিদ্যা বলা যায় এবং তাহাকেই মূলাবিদ্যা বলে। এই অজ্ঞানই সর্ব্বাধারভূত কূটস্থচৈতন্যকে অনুভব করিতে দেয় না এবং জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই অবিদ্যার শক্তি দুইটী; আবরণশক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি। তন্মধ্যে যে শক্তি কূটস্থচৈতন্যকে আবরণ করিয়া রাখে এবং নিত্য স্বপ্রকাশ স্বরূপ চিদাত্মাকে প্রকাশ পাইতে দেয় না, সেই শক্তিই অবিদ্যার আবরণ শক্তি। আর, যেমন শুক্তিকাদি দর্শন করিলে তাহাকে রজত বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ যে শক্তির প্রভাবে অবিদ্যার আবরণশক্তি দ্বারা সমাবৃত কূটস্থ চৈতন্যকে স্থূলশরীর ও লিঙ্গশরীর-বিশিষ্ট জীবচৈতন্য বলিয়া বোধ হয়, সেই শক্তিকে অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তি বা বিক্ষেপাধ্যাস বলিয়া থাকে।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ যে, শুক্তিকাদিতে রজত ভ্রম স্থলে, সেই

রজতের সমুদায় অংশ মিথ্যা হইলেও, যেমন পুরোবর্ত্তী অংশ মিথ্যা নহে, তদ্রূপ কূটস্থ চৈতন্যে জীবচৈতন্যের আরোপ যথার্থ স্বরূপ না হইলেও, তাহাতে যে স্বয়ংস্বরূপ ও বস্তুস্বরূপ ব্যবহার, তাহা অযথার্থ নহে। আর সেই ভ্রমকালে যেমন শুক্তির নীল বর্ণ ও ত্রিকোণ স্বভাব তিরোভূত থাকে, তদ্রূপ কূটস্থ চৈতন্যেরও অসঙ্গত্ব ও আনন্দস্বরূপত্ব বুদ্ধি তিরোভূত থাকে। ভ্রমস্থলে শুক্তিকাদিতে আরোপিত যে জ্ঞান, তাহারই নাম যেমন রজত বলা যায়, সেইরূপ চৈতন্যে বিক্ষেপশক্তি দ্বারা অধ্যস্ত যে জ্ঞান, তাহাকেই জীব বলা যায়। শ্রুতিতে এই মায়াধীন চিদাভাস মায়ী, মহেশ্বর, অন্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ ও জগদযোনি নামে উক্ত হইয়াছেন।

শিষ্য। মায়ী, মহেশ্বর, অন্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ ও জগদ্‌যোনি এরূপ বিভিন্ন আখ্যা দিবার কারণ কি?

গুরু। ঈশ্বরই মায়াকে সংসার রক্ষার জন্য নিয়োজিত করেন বলিয়া তাঁহাকে "মায়ী" বলা হয়। এই মায়াশক্তি দ্বারাই তিনি সংসারী জীবের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন :—

"দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।"

পূর্ব্বেই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছি।

"অয়ং যৎস্জতে বিশ্বং তদন্যথয়িতুং পুমান্।
ন কোঽপি শক্তস্তেনায়ং সর্ব্বেশ্বর ইতি শ্রুতঃ॥"

এই ঈশ্বর যে কিছু বিশ্ব রচনা করেন তাহাকে অন্যথা করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই, এই জন্য তিনি "সর্ব্বেশ্বর"।

"অশেষপ্রাণিবুদ্ধিনাং বাসনাস্তত্র সংস্থিতাঃ।
তাভিঃ ক্রোড়ীকৃতং সর্ব্বং তেন সর্ব্বজ্ঞ ঈরিতঃ॥"

যে হেতু জগতের সমস্ত প্রাণিবর্গের বুদ্ধি বাসনা সকলই সেই ঈশ্বরে অবস্থিত হয় এবং সেই সকল বুদ্ধিবাসনা দ্বারাই এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত আছে, সুতরাং সকল বুদ্ধি ও বাসনার আধার ঈশ্বরকে "সর্ব্বজ্ঞ" বলা হয়।

"বিজ্ঞানময়মুখ্যেষু কোশেষন্যত্র চৈব হি।
অন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তি তেনান্তর্যামিতাং ব্রজেৎ॥"

বিজ্ঞানময় প্রভৃতি কোষ সকলের ও অন্যান্য বস্তু সকলের অন্তরে অবস্থিতি করিয়া, ঈশ্বর যথানিয়মে তাঁহাদিগকে "যমিত" বা নিযুক্ত করেন বলিয়া তাঁহাকে "অন্তর্যামী" বলা যায়।

"বুদ্ধৌ তিষ্ঠন্নান্তরোঽস্যাধিয়ানীক্ষ্যশ্চ ধীবপুঃ।
ধিয়মন্তর্যময়তীত্যেবং বেদেন ঘোষিতম্॥"

যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়াও বুদ্ধির অন্তরে থাকেন এবং যিনি বুদ্ধিময় হইয়াও বুদ্ধির বিষয়ীভূত নহেন, তিনিই বুদ্ধির অন্তরে অবস্থিতি করিয়া বুদ্ধিকে নিযুক্ত করেন, বেদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

"তন্তুঃ পটে স্থিতো যদ্বদুপাদানতয়া তথা।
সর্ব্বোপাদানরূপত্বাৎ সর্ব্বত্রায়মবস্থিতঃ॥
পটাদপ্যান্তরস্তন্তু স্তন্তোরপ্যংশুরান্তরঃ।
আন্তরত্বস্য বিশ্রান্তির্যত্রাসাবনুমীয়তাম্॥"

যেমন তন্তু সকল পটের উপাদান কারণরূপে পটে অবস্থিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্ববস্তুর উপাদান কারণরূপ ঈশ্বর সকল বস্তুতে অবস্থিত আছেন। পটের অভ্যন্তরে তন্তু এবং তন্তুর অভ্যন্তরে অংশু (আঁশ) অবস্থিতি করে, ইত্যাদি রূপে যাঁহাতে অভ্যন্তরত্বের বিশ্রান্তি বা নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ যাঁহার পরে আর কিছু নাই, তাঁহাকে অনুমান কর। সেই বিশ্রান্তি স্থলে পৌঁছিলেই জীবের নিঃশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। নিঃশ্রেয়স কি ?

গুরু। আজ আর থাক। অন্য দিনে ইহা বুঝাইয়া দিব।

(ক্রমশঃ)

কস্যচিৎ দীনস্য।

গুরু-পূজা।

(স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত।)

বাজিল দুন্দুভি-নাদ, গেল বাদ বিসম্বাদ,
জাগ জাগ প্রেমময়ী ধরা!
শুন মা নূতন কথা, সুসন্তান গায় গাথা,
নব রস, নব তত্ত্বে ভরা!

উঠ হে জগতবাসি, ধর জ্ঞান অবিনাশী,
তত্ত্ব-সুধা ত্রিদিববাঞ্ছিত!

গুরুদত্ত মহাধন, বিলাইতে মহাজন,
"সমন্বয়" জগত ঈপ্সিত।

যেখানে যে ভাবে থাক, বিভুরে যে নামে ডাক,
পাবে তাঁরে ইথে নাহি আন।
বাঁকা কিম্বা সোজা পথে, রুচি হয় যেই মতে,
"যত মত তত পথ" জান।

'উঠ জাগ' মহাগান, যাঁহার মাতান তান,
বেদ-শেষ 'তত্ত্বমসি' কথা।
প্রতি জনে দেন গুরু, মহাবীর কল্পতরু,
সমস্বরে গাও গুরুগীতা!

জীবে শিবে নাহি ভেদ, সতত কহিছে বেদ,
নিত্য দাও নরে দেব-সেবা।
ভুলে যাও আত্ম-পর, ভাই ভাই হৃদে ধর,
এক ভিন্ন দ্বিতীয় বা কেবা।

এক বিভু সনাতন, ঘটে ঘটে নারায়ণ,
মিছে কেন ভেদ-দ্বন্দ্ব-মাঝে।
ধর গুরু উপদেশ, হইবে মোহের শেষ,
ওই শুন শুভ শঙ্খ বাজে।

ভাঙ সুখ-স্বপ্ন-ঘোর, ছিন্ন কর মায়া-ডোর,
বীরভাবে হও আগুয়ান।
কামিনী কাঞ্চন কায়া, সকলি মিছার ছায়া,
গুরু দেন সত্যের সন্ধান।

ওই শুন্ গুরু কয়, 'ত্যাগে শুধু মোক্ষ হয়,
ত্যাগ শুনে হ'ওনা চকিত!
ত্যাগেই পরম ভোগ, সদানন্দ সনে যোগ,
নিত্যানন্দ কার না বাঞ্ছিত?'

ত্যাগী বলে—'মিথ্যা ছাড়ি, সত্যেরে আশ্রয় করি,
হও তুমি মহা ধনবান!
সত্যের বিমল জ্যোতি, জ্ঞানের অপূর্ব্ব ভাতি,
উজলিবে তোমার পরাণ!'

'সাজে না তোমার আর,' কন গুরু বারম্বার,
'মোহাবেশে জীবন যাপন।
স্বার্থ মানে পদে দলি, সিংহ সম গর্জ্জি চলি,
লভ আজ(ই) পরমার্থ ধন।'

অমৃত-সন্তান মোরা, অমৃতে হৃদয় ভরা,
এস ভাই অমৃত বিতরি।
ফুটুক অদ্বৈত-তত্ত্ব, বেদান্তের মহা সত্য,
ধন্য হই জগতে প্রচারি।

যাঁর শুভ আগমনে, ভাসে দেশ মহাজ্ঞানে,
আসে সেই জ্ঞান গরীয়ান।
এস আছ কে কোথায়, দীন অভাগার প্রায়,
গুরুপদে অর্ঘ্য করি দান!

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ অষ্টকালীন পদাবলী।

(সমালোচনা)

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার একখানি অভিনব উপাদেয় গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে সমস্ত মধুর স্বর্গীয় ভাব-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এ প্রকার আর কুত্রাপি নাই। পাঠক এই পুস্তক পড়িতে পড়িতে পুলকে 'প্রেমাশ্রু' বর্ষণ না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিবেন না। প্রেমিক ভাবুক ভক্তগণ ইহা পাঠে ঠাকুরের নব নব মনোমোহন ধ্যানমূর্ত্তি হৃদয় মধ্যে দেখিতে ও ভাবিতে পারিবেন।

ঠাকুরকে অষ্টপ্রহর নূতন নূতন ভাবে ধ্যান-ধারণা ও স্মরণ-মনন করিবার বিষয়গুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হওয়ায়, ইহার 'শ্রীরামকৃষ্ণ অষ্টকালীন পদাবলী' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি অতি সুন্দর প্রতি-মূর্ত্তিও সংযুক্ত রহিয়াছে।

ইহাতে যে যে বিষয়গুলি আছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

১। বন্দনা (শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তৎসম্বন্ধীয় তীর্থাদি ও ভক্তগণের মহিমাপূর্ণ) ২। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাতী (শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া যে ভাবে দেবদেবী স্মরণ-মনন করিয়া ভাব-বিভোর-চিত্তে অবস্থিতি করিতেন,—সেই অপূর্ব্ব প্রেমছবি ও ধ্যানমূর্ত্তি) ৩। প্রভাতী,—ভক্ত-সম্মিলন (প্রভাতে ভক্তগণ সহ প্রভুর মিলন দৃশ্য) ৪। শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠযাত্রা (শিশু রামকৃষ্ণ যে ভাবে পাঠশালায় যাইতেন,—বাল্যের সেই প্রফুল্ল মনোমোহন ছবি) ৫। শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠলীলা (বালক গদাধর যে ভাবে পাঠশালায় অতিবাহিত করিতেন—সেই পঞ্চম বর্ষীয় প্রহ্লাদ-মূর্ত্তি) ৬। শ্রীরামকৃষ্ণ-গোষ্ঠলীলা (শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকালে যে ভাবে রাখালগণ সহ মাঠে ক্রীড়া করিতেন—সেই সদানন্দ চিত্র) ৭। শ্রীরামকৃষ্ণ-রাজলীলা (রামকৃষ্ণকে রাজবেশে সাজাইয়া রাখাল বালকগণ প্রজা সাজিয়া যে খেলা হইত—সেই রাজদরবার) ৮। শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবালীলা (ভক্তের গৃহে ঠাকুরের শুভাগমন, উৎসব ও ভোজনলীলা) ৯। শ্রীরামকৃষ্ণ-কীর্ত্তনলীলা (ভক্তগণ সহ ঠাকুরের অলৌকিক কীর্ত্তন গান, মধুর নৃত্য ও ভাব-সমাধির অপূর্ব্ব মূর্ত্তি) ১০। শ্রীরামকৃষ্ণ-আরতি (ঠাকুরের আরতিকালে নিত্য-পাঠ্য-স্তুতি) ১১। শ্রীরামকৃষ্ণ-শয়ন-লীলা (রাত্রিকালে ঠাকুর যে ভাবে নিদ্রিত থাকিতেন এবং ভক্তগণ তাঁহার সেবা করিতেন, সেই ভাবমূর্ত্তি) ১২। শ্রীরামকৃষ্ণ-মকর-মঙ্গল (পৌষ সংক্রান্তির দিনে, ঠাকুর যে ভাবে হরিগুণ-গানে বিভোর থাকিয়া ভক্তগণ সঙ্গে অতিবাহিত করিতেন—সেই মধুর লীলা-রহস্য) ১২। প্রার্থনা—শ্রীরামকৃষ্ণের স্তুতি গাঁথা—ভক্তের নিত্য-পাঠ্য) ১৪। মাতৃ-গীতি—(দেবী-চরণে ভক্তের সকরুণ নিবেদন) ১৫। গুরু-স্তুতি—(শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণার্থে শিষ্যের নিত্যপাঠ্য স্তব) ইত্যাদি।

পদাবলী সম্বন্ধে অভিমত।

(হাওড়া আদালতের সুবিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল, মহোদয় যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।)

ভাই বিজয়—

তোমার শ্রীরামকৃষ্ণ অষ্টকালীন পদাবলী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। পদগুলি বেশ ভাবপূর্ণ, ভাষাও প্রাঞ্জল, আঁকরগুলি যে কি মধুর হইয়াছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যেন কবিকঙ্কণ কি চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করিতেছি বলিয়া মনে হয়। পাঠে ঠাকুরের ছবিখানি যেন প্রত্যক্ষীভূত হইল। যদিও ভাগ্যহীন আমি—তাঁহার দর্শনসুখে বঞ্চিত ছিলাম,—আজ তোমার কৃপায় যেন কাঙ্গাল ও দীনের ঠাকুরকে বাল্যভাব হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ভাবেই দেখিলাম,—দেখিলাম সেই কামারপুকুরে বালক গদাই, দেখিলাম সেই দক্ষিণেশ্বরে সাধক রামকৃষ্ণ, দেখিলাম সেই নিত্যভাবে যোগোদ্যানে বিরাজিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি ধন্য; ঠাকুর তোমায় দীর্ঘজীবী করুন, এই তোমার অভিন্নহৃদয় ভাগ্যহীন বন্ধুর—শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণে ঐকান্তিক এবং নিয়ত প্রার্থনা ইতি—

সালিখা,
২৫শে মাঘ, ১৩১৬ সাল।

তোমারই—
দেবেন্।

সংবাদ।

গত ২৪শে মাঘ, রবিবার বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দিবস শাস্ত্রালাপ, সংগীত, সংকীর্ত্তন, ঐক্যতান বাদ্য প্রভৃতি আমোদ আহ্লাদ হইয়াছিল। প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত সমবেত হইয়াছিলেন। অগণন দীন-নারায়ণগণের পরিতোষভাবে সেবা করা হইয়াছিল। এ দৃশ্য অতীব হৃদয়গ্রাহী ও মুগ্ধকর।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

ফাল্গুন, সন ১৩১৬ সাল।

ত্রয়োদশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা।

দেব-স্বপ্ন।

সোণার স্বপন হায়, কি দেখিনু আমি।
সফল হবে কি স্বপন, জানো ওহে অন্তর্য্যামি॥
কত কথা পড়ে মনে, দেখিনি যায় অযতনে,
সে দেব-বাঞ্ছিত-ধনে, দেখালে হে তুমি॥
দেখালে স্বর্গের ছবি, জ্ঞানময় মহাকবি,
বিবেক-বৈরাগ্য-রবি, ওহে জগতের স্বামি॥
হাসি-মুখে কথা কোয়ে, গেছে চোলে আশা দিয়ে,
সেই আশা-বাণী বুকে নিয়ে, সুপ্রভাত হোলো যামী॥
কৃপা কর ওহে নাথ, এ সাধে না ঘটে বাদ,
রামকৃষ্ণ-নামাস্বাদ, পায় যেন বিশ্বপ্রাণী॥

সেবক শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

ভালবাসা।

"সর্ব্বথা ধ্বংস রহিতং সত্যাপি ধ্বংস কারণে।
যদ্ভাববন্ধং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

ভালবাসা মানে সুন্দর গৃহ। এ গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রং-বেরং করা কারুকার্য্য বিমণ্ডিত প্রাসাদ নহে। এ গৃহ সর্ব্বদা সুখ শান্তি পরিপূর্ণ। এ গৃহ ভিন্ন সংসার চলে না, জীবন থাকে না, শান্তি থাকে না। যাহার গুণে মানুষ দয়া মমতা, আদর যত্ন, সেবা শুশ্রূষা, আমোদ প্রমোদ রত হয়—নিঃস্বার্থ ত্যাগ স্বীকার করে—যাহাতে জীবের জীবত্ব বজায় থাকে, যাহাতে বাঁচে, যাহাতে জীব সুখী হয়,—শান্তি পায়—তারই নাম ভালবাসা। কিন্তু এই শান্তিপ্রদ চিত্ত-বিশুদ্ধকর ভালবাসা জগতে বড়ই বিরল, ইহার পরিমাণ বড়ই অল্প। মানুষের মধ্যে ভালবাসার ছড়াছড়ি। মানুষের মুখে কেবল ভালবাসার কথা। কাগজে ভালবাসার কথা—কলমে ভালবাসার কথা—পত্রিকায় ভালবাসার কথা—নাটকে, উপন্যাসে ভালবাসার কথা—সর্ব্বত্রই ভালবাসা—ভালবাসা! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজে ও বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালবাসা বড়ই বিরল। কেবল পরশ্রীকাতরতা, কেবল দ্বেষ হিংসাপূর্ণ। আমাদের সমাজ আজকাল প্রাকৃতিক চাকচিক্য দর্শনে বিমুগ্ধ, তাই উপরের চাকচিক্য দেখিয়া ভালবাসিতে ছুটিতেছে। সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৎপ্রতি যে অনুরাগ জন্মে, সে কি ভালবাসা? সে মোহ।

আজ কাল প্রায়ই দেখা যায়—"মনে রেখো ভুলনা"—"আমি তোমারই" ইত্যাদি পদবাচ্য ভাষায় পত্র সমাপ্তি হইয়া থাকে। এগুলি কি ভালবাসার কথা বলিয়া বোধ হয়? ভালবাসায় ত প্রতিদান চায় না—ভালবাসায় ত ভালবাসো ভালবাসো রব নাই—তবে কি ইহাকে নিঃস্বার্থ ভালবাসা বলিবে? ইহাতে কি স্বার্থ নাই? যদি স্বার্থ না থাকে, তবে "মনে রেখো ভুলনা" ইত্যাদি পদ প্রয়োগ করা উচিত নয়। আমাদিগের মতে একটী ভালবাসা আছে যাহাকে "প্রেম" বলে। যাহার ফলে সেই মহৎ এবং মোহন ফল লাভ করা যায়। সম্পূর্ণরূপে সমস্ত ভুলিয়া আপনাকে এবং সমস্ত জীবজগতকে সেই পরম প্রেমভাজন সচ্চিদানন্দের বিকাশ ভাবিয়া—সমস্ত শ্বাপদ জীবজন্তু কীট প্রভৃতি সমস্ত বিশ্বকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিতে পারিলে, তবে পৃথিবীতে নির্ব্বিবাদে প্রেমের রাজ্য বিস্তার হইতে পারে। যাহাকে ভালবাসিব, সে ভালো

কি অন্ধ, খোঁড়া কি গলগণ্ড, তাহা দেখিবার দরকার কি? সে ভাল হইলেও ভালবাসিব, মন্দ হইলেও ভালবাসিব। কারণ যে ভাল, সেও সচ্চিদানন্দের বিকাশ, যে মন্দ, সেও সচ্চিদানন্দের বিকাশ। আমার হৃদয়ে একমাত্র ভালবাসারই বন্যা প্রবাহিত হইবে। যাহাকে ভালবাসিব, তাহার হৃদয়ে আমার ভালবাসা-বন্যার প্রতিদান বন্যা প্রবাহিত হইতে দিব কেন? জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে যেমন মেদিনী-বক্ষের উপর তারকাখচিত সুনীল আকাশ-পট দিগন্ত ব্যাপিয়া আনন্দোৎগার করিতে থাকে, প্রেমের প্রশান্ত ক্ষেত্রে অবতীর্ণ প্রেমিক, তেমনি প্রকৃত পুরুষের (প্রেমাস্পদের) প্রেমসুধা নিশিদিন পান করিয়া আত্মাকে চিরপরিতৃপ্ত মনে করেন।

প্রেমে ভেদাভেদ নাই—জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রেমিক সকলের নিকট সমভাবে অবস্থিত। তাই সাধারণে বলিয়া থাকে "প্রেমেতে মজেছে মন, কেবা হাড়ী কেবা ডোম।" পাঠকগণের নিকট জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রেমিকের প্রেমের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না—আপনারা হয় ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা শুনিয়া থাকিবেন। তিনি কাহারও নিকট কোন শিক্ষা বা উপদেশ লাভ না করিয়া কেবল ভগবানের প্রেমে কিরূপ উন্মত্ত ও পবিত্র প্রেমময় জীবনলাভ করিতে হয়, তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার যেমন শান্ত ভাব, তেমনি বৈষ্ণব ভাব ও তেমনি ঋষিভাব ছিল। তিনি যে গৃহে বাস করিতেন, সেই গৃহে গৌর নিতাই, মা কালী, মা তারা, মা দুর্গা, মা সরস্বতী, মা লক্ষ্মী, বাবা মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও যীশুখ্রীষ্টের ছবি দেওয়ালে লটকান ছিল। তাঁহার নিকট হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম খ্রীষ্টিয়ান কোন ভেদাভেদ জ্ঞান ছিল না। তিনি বিষ্ঠায় চন্দনে এক জ্ঞান করিতেন। তিনি বিশ্বে ভগবানের বিকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন,—তিনি ভগবানের বিশ্বময় প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাই তিনি জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন,—সেই জন্যই আজ আমরা তাঁহাকে ভগবানের প্রেমের অবতার বলিতেছি।

মাতৃভাবে, সন্তানভাবে, স্ত্রীভাবে, পতিভাবে, বন্ধুভাবে, সখাভাবে ও বীরভাবে ভালবাসার বিস্তার করিতে পারা যায়। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ও পবিত্র ভাব, এতে কোন বিপদ নাই। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেনকে ভগবানের মাতৃভাব সম্বন্ধে উপদেশ দেন। সরল শিশুর মত ভগবানকে অনবরত মা মা বলিয়ে সম্বোধন এবং তাঁহার নিকট শিশুর মত প্রার্থনা ও

আবদার করা এবং মাতৃপ্রেমে গদগদচিত্তে ভগবানকে মা মা বলিয়া ডাকিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র ভগবানের মাতৃভাব ব্রাহ্মসমাজে প্রচারিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্ত্রীলোক দেখিলে প্রণাম করিতেন, এবং তাহার মধ্যে মাতৃশক্তির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ দেখিতেন। তিনি ভগবানের নামে ও ভগবদ্‌-প্রেমের গভীর কথা সকল বলিতে বলিতে এবং গান গাহিতে গাহিতে প্রেমে উচ্ছসিত ও উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন এবং সমাধিমগ্ন হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে থাকিতেন। কখন বা ভগবদ্‌-প্রেমে হাসিতেন—কাঁদিতেন—নাচিতেন। আবার কখন বা সুরামত্তের ন্যায়—শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন।

যশোদা ভগবানকে সন্তানভাবে ভালবাসিয়াছিলেন, তাই ভগবান কৃষ্ণ ভক্তের প্রেম রক্ষা করিবার জন্য সন্তানরূপে যশোদার গৃহে আসিয়াছিলেন।

স্ত্রীভাব বড় কঠিন। ভগবান কৃষ্ণ, রাধাকে স্ত্রীভাবে ভালবাসিয়াছিলেন এবং রাধা কৃষ্ণকে স্বামীভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণের উভয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা পুরাণ মতে ব্যক্ত করিতেছি—

"যথা ত্বঞ্চ ভেদোহি নাবয়োর্দ্ধ্রুবম্।
যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্নৌ জ্যোতি॥
যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথা হং ত্বয়ি সন্ততম্॥
বিনা মৃদা ঘটং কর্ত্তুং বিনা স্বর্ণেন কুণ্ডলম্।
কুলাল স্বর্ণকারশ্চ ন হি শক্তঃ কদাচন॥
তথা ত্বয়া বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্ত্তুমহং ক্ষমঃ।
সৃষ্টে রাধাবভূতা ত্বং বীজরূপোঽহমচ্যুতঃ॥

* * *

কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকাস্ত্বয়ৈব রহিতং যথা।
শ্রীকৃষ্ণশ্চ তথা তে হি ত্বয়ৈব সহিতং পরং॥
ত্বঞ্চ শ্রীস্ত্বঞ্চ সম্পত্তি স্ত্বমাধারস্বরূপিনী।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাসি সর্ব্বেষাঞ্চ মমাপি চ॥
ত্বং স্ত্রী পুমানহং রাধে নেতি বেদেষু নির্ণয়ঃ।
ত্বঞ্চ সর্ব্বস্বরূপাসি সর্ব্বরূপো ঽহমক্ষরে॥
যদা তেজঃ স্বরূপোঽহং তেজরূপাসি ত্বং তদা॥
ন শরীরী যদাহঞ্চ তদা অশরীরিনী॥

সর্ব্ববীজ স্বরূপোঽহং যদা যোগেন সুন্দরি।
ত্বঞ্চ শক্তি স্বরূপাসি সর্ব্বস্ত্রীরূপধারিণী॥

(শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে)

অর্থ—

"তুমি যেখানে আমিও সেইখানে, আমাদিগের ভিতরে নিশ্চিত কোন ভেদাভেদ নাই। দুগ্ধে যেমন ধবলতা, অগ্নিতে যেমন দাহ্যতা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনি সর্ব্বদাই আমি তোমাতে অবস্থিত। কুম্ভকার মাটি ব্যতীত ঘট গড়িতে সক্ষম হয় না—স্বর্ণকার সোণা ব্যতীত কুণ্ডল গড়িতে পারে না। তুমি সৃষ্টির আধারভূতা, আমি অচ্যুত বীজরূপী। আমি যখন তোমা ব্যতীত থাকি, তখন আমাকে লোকে "কৃষ্ণ" বলে, আর তোমার সহিত থাকিলে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলে। তুমি শ্রী তুমি সম্পদ্ তুমি আধার স্বরূপিনী, সকলের এবং আমার সর্ব্বশক্তিস্বরূপা। হে রাধে। তুমি স্ত্রী আমি পুরুষ, বেদও ইহা নির্ণয় করিতে পারে না। হে অক্ষরে। তুমি সর্ব্বস্বরূপা, আমি সর্ব্বরূপ। আমি যখন তেজঃস্বরূপ তুমি তখন তেজরূপা। আমি যখন শরীরী নই—তখন তুমিও অশরীরিনী। হে সুন্দরি। আমি যখন যোগের দ্বারা সর্ব্বজীবস্বরূপ হই তখন তুমি শক্তিস্বরূপা সর্ব্বস্ত্রীরূপধারিনী হও।"

ভগবান কৃষ্ণ ও রাধিকার প্রেমের কথা শুনিলেন। প্রেমের দ্বারা প্রেমিক এক হইয়া যায়, জগতে আর দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পায় না। সমস্তই সেই এক ভগবানের প্রেম—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" দেখিতে পায়!

ভগ্নি ও ভ্রাতৃভাবে প্রেম বড় শক্ত। আজকাল আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্ম-সমাজে ভ্রাতৃ ভগ্নিভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যখন মানব জগতে ভগবানের বিকাশ এবং প্রতি কীটাণু, পরমাণু পর্য্যন্ত সেই চিদানন্দের স্বরূপাংশ বলিয়া প্রেমিকের মনে উপলব্ধি হয়, তখন ভ্রাতৃ ও ভগ্নি ভাবের ভালবাসায় উপযুক্ত হয়। কিন্তু আমাদের সে বিশ্বাস কৈ? আমরা অত প্রেমিক হইতে পারি কৈ? আমাদের সর্ব্বজীবে ব্রহ্মজ্ঞান হয় কৈ? "একব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি" এ ভাব আমাদের কৈ? তাই বলিতেছি, ভ্রাতৃ ও ভগ্নিভাবের ভালবাসা বড় কঠিন। স্ত্রী ভাবে ও বীর ভাবে আরো কঠিন। ঠিক রাখা যায় না। তবে এটা ঠিক রাখা প্রয়োজন যে, যিনি যে পথেই তাঁহাকে ভালবাসুন না—সকলেরই যে লক্ষ্য এক। তাই ভগবান রামকৃষ্ণ উপদেশে বলিয়াছেন "যেমন কালীঘাটে যেতে হবে, কেউ বা নৌকায় যায়, কেউ বা হেঁটে যায়, কেউ বা গাড়ীতে

যায়। কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য কালীঘাটে যাওয়া।" যদি তাঁহার প্রেম সাগরে ডুব দিতে পার, তবে দশ হাজার হরি, পাঁচলক্ষ শিব, তেত্রিশকোটী দেবতা, ইহার কিছুই দরকার হইবে না—তখন বোধ হইবে "তিনিই আমি"—"আমিই তিনি।" তখন তোমার প্রেমাস্পদকে পৃথক বলিয়া বোধ হইবে না—তখন তোমার প্রেমাস্পদ তোমার সহিত মিশিয়া যাইবেন। তখন তুমি চারিদিকে যাহা দেখিবে, তাহাতেই মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইবে, তাহাকেই আলিঙ্গন করিতে ছুটিবে। প্রেম জগতের সার, অমূল্য পদার্থ, স্বর্গ হইতে প্রেরিত হয়—ধরাকে স্বর্গে পরিণত করিবার জন্য। তাই ইংরাজী কবি গাহিয়াছেন—

"The love is heaven,
And heaven is love."

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে যাহা দেখিতেছ সকলেই প্রেমময়। সবই পরস্পর ভালবাসা দ্বারা আবদ্ধ থাকায় জগৎ ভগবানের রাজ্য। জগতের অস্তিত্ব প্রেমে। আমাদের আহার আসে প্রেমে, বায়ু বহে প্রেমে, বৃষ্টি পড়ে প্রেমে, স্রোতস্বতী চলে প্রেমে, সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড প্রেমবন্যায় প্রবাহিত, তবু প্রেম কি জানি না—তবু প্রেমময়ের পায়ে আত্ম-প্রাণ-মন বিসর্জ্জন করিতে পারিনা। প্রেম কি এবং কোথা হ'তে আইসে, তাহার তত্ত্বতল্লাস লই না। যাঁহার শ্রীপদ হইতে পতিতপাবনী প্রেমপ্রবাহিনী প্রেমগঙ্গার উৎপত্তি, তাঁহার বিষয় না জানিলে প্রেমের খবর জানিবে কোথা থেকে? তাঁহার তত্ত্বও লইনা, প্রেমও পাইনা। কোন প্রতিদান না পাইয়া ভালবাসা, বা কোনও প্রত্যাশায় লুব্ধ না হইয়া ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা। এক সময়ে এই ভারত প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট ছিল। জল যেমন এক স্থান হইতে নাড়া দিলে সমস্ত জলাশয়ের জল আন্দোলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ ভারতেরও একদিন ছিল, যে দিন ভারতের এক প্রান্তে কোন বিশৃঙ্খল ঘটিলে আ-সমুদ্র হিমাচলবাসী প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইত। আজ এক প্রান্তের কথা অপর প্রান্তে পৌঁছায় না কেন? কারণ প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। প্রেমের টান বড় টান—তাই কবি গাহিয়াছেন,—"সাধে কি টেনে আনে, প্রেমের টানে টেনে আনে।"

যেখানে ভগবানে বিশ্বাস ঘনীভূত হয় নাই, সেখানে প্রেম দাঁড়াইতে পারেনা। ভগবানই যে প্রেমের ভিত্তি। ভগবানে বিশ্বাস জন্মিল না—প্রেমও হইল না। সুতরাং ভালবাসো—ভালবাসো বলিয়া ছুটিলে কেবলই আকৃতি।

প্রেম পবিত্র নিত্য সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল সদৃশ—তাহাতে মলিনতা নাই, তরলতা নাই—পেষণ নাই—তাহাতে বিবাদ নাই—উদ্বেলতা নাই—তাহাতে অপমান নাই। যেখানে পবিত্রতা এবং নিত্যতার অভাব, আর যেখানে মলিনতা, তরলতা, পেষণ, বিবাদ, উদ্বেলতা ও অপমান আছে, সেখানে প্রেম নাই। যদি সেখানে কেহ প্রেমের বাস মনে করেন, তবে সে প্রেম নহে, সে মোহ। প্রেম—প্রেম স্বরূপের সত্বা—পবিত্রতাময়। পৃথিবীর কোন কলঙ্ক যে প্রেমে স্পর্শ করিয়াছে—সে প্রেম কখন প্রেমপদবাচ্য হইতে পারে না। আজকাল অনেকেই কলঙ্কিত মোহ কামকে প্রশ্রয় দিয়া, তাহাকে প্রেম নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। তাহারা দেখেন না যে আমাদের মধ্যে মলিনতা, তরলতা, বিবাদ, উদ্বেলতা ও অপমান আছে কি না? যদি থাকে তবে জানিবে যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তখন যিনি প্রেমরাজ্যের অধীশ্বর—যাঁহার প্রেমে সূর্য্য কিরণ দেয়, পবন বাতাস প্রদান করে, চন্দ্র সুস্নিগ্ধ সুশীতল রশ্মিদান করিয়া সুধাকর নামে অভিহিত হয়,—মন প্রাণ হৃদয়ের সহিত অন্তরের সমস্তটুকু ভালবাসা তাঁহার পদে অর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিবে—"হে জগৎপতে, হে জগদানন্দ, হে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াধিপতি প্রেমময়, আমাদিগকে রক্ষা কর! আমাদিগের এ পাপকলুষিত কাম মোহাদির মধ্য দিয়া যে প্রেম প্রবাহিত হইতেছে, সে মোহপূর্ণ প্রেম দূরীভূত করিয়া, তোমার পবিত্রাঙ্কিত প্রেম দান করিয়া কৃতার্থ কর।" তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে, তাঁহার নামে কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু পরিষ্কার হইবে, মন খাঁটি হইবে, তখন আর জগতের আবর্জ্জনাময় দৃশ্য তোমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইবে না। মনের মলিনতা কাটিয়া যাইবে, হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইবে। তখন বাহ্যজগতের অপবিত্র কামমোহাদিপূর্ণ ভাব তোমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। তখন কেবল তাঁহার প্রেমেই ডুবিতে ইচ্ছা হইবে। তখন প্রকৃত প্রেম আসিবে, প্রাণ মন, আশা ভরসা, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সকলই জুড়াইবে—তখন আর ভালবাসো ভালবাসো বলিয়া ছুটিবে না।

সংসারে প্রেমের নামে কাম বিকায়। সংসার স্বার্থসুখে মুগ্ধ!" কেবল "স্বার্থ" "স্বার্থ" এই মাত্র রব। সংসারে যাহাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মন্ ব্যক্তিগণ "দাম্পত্য-প্রণয়" বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যেও স্বার্থ। যদি প্রণয়েই স্বার্থ বলিয়া জানিলাম, "তবে ভালবাসা কোথায় পাইব? ভালবাসা কি স্বার্থ? ভালবাসা কি টাকা কড়ির বিনিময়? ভালবাসা কি ভোগ বিলাস?

ভালবাসা কি এতই তুচ্ছ! আজকাল সমাজের ভালবাসা টাকা কড়ি—টাকা কড়ির সঙ্গে ভালবাসার সম্বন্ধ। এখানে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের কথা মনে পড়ে— "যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্ত, স্তাবন্নিজপরিবারানুরক্ত।" আপনারা কি বলিতে পারেন, আপনাদের কি ধারণায় আইসে, ভালবাসা যাহা স্বর্গীয়—তাহা কি অর্থের দ্বারা হইয়া থাকে, না ভালবাসা কথার দ্বারা সম্পাদিত হয়। মেলামেশার দ্বারা কি প্রকৃত প্রেম লাভ হইয়া থাকে? যদি তাহাকে ভালবাসা বলা হয়, আমরা তাহাকে বলিব মোহ—কামপূর্ণ মোহ।

শ্রীচৈতন্য কোন্ শক্তির দ্বারা হিন্দু মুসলমান সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, কোন শক্তির দ্বারা মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ নানা সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহারই উপদেশ বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, তাঁহার প্রেমে মাতিয়াছিলেন। চুম্বক সংঘর্ষণে লৌহ যেমন চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়, লোহাকার ধারণ করিলেও তাহার আর লৌহ প্রকৃতি থাকে না, সেইরূপ প্রেমিকের মনুষ্য দেহ কি এক অভূতপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সংঘর্ষণে এমন চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয় যে, তাহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাকে ভগবানের অবতার জ্ঞানে তাঁহার প্রেমে মাতিয়া উঠে। চৈতন্যের জীবনেই এইরূপ ঘটিয়াছিল।" কোন্ শক্তির বলে ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রী "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া নাচিয়া উঠিয়াছিল! কোন শক্তির তেজে মত্ত হস্তী প্রেমাবেশে আবিষ্ট হইয়াছিল! সে কেবল তাঁহার প্রেমে। প্রেমিকের জ্ঞান এইরূপ—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টুমামদর্শনা ন্মর্ম্মহতাং করোতু বা
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটোমৎ প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ॥

প্রেমিকের স্বভাব কেমন—

"চিনিনা তাহারে কভু, তবু তারে ভালবাসি।
দেখিনি কখন তারে, তবু মনে পড়ে হাসি॥"

পাঠক। ধ্রুবের প্রেম দেখ—পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব, ভগবান বিষ্ণুর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যমুনাতীরে মধুবনে প্রবেশ করিলেন। এখানে ধ্রুব ভগবদ্ প্রেমে মনোনিবেশ করিলেন। পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর কঠোর ভগবৎ-প্রেমে নদ-নদী সমুদ্র স্থাবর জঙ্গম ও সমস্ত বিশ্ব প্রেমাপ্লুত হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া মন্ত্রণাপূর্ব্বক মায়াদ্বারা সুনীতির রূপ ধারণ করিয়া ধ্রুবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবদ্-প্রেমে সমাহিত ধ্রুবের অন্য বিষয়ে আর

কিছুতেই চিত্ত আকর্ষিত হইল না। ধ্রুব তখন আত্ম-মন-প্রাণ সমস্তই সেই প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছিলেন—তাঁহার ধ্যান, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার মন, তাঁহার প্রবৃত্তি সমস্তই তাঁহার প্রেমাস্পদকে অর্পণ করিয়াছিলেন;—তাই সুনীতির শত চেষ্টা বিফল হইল। তখন তাঁহার প্রেমাস্পদ ধ্রুবের নিকট আসিয়া বলিলেন—"বৎস! তোমার প্রেমে আমি প্রীত হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" ধ্রুব তাঁহার প্রেমাস্পদকে দর্শন করিয়া বলিলেন—"যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন তবে এই বর দিন, যেন আমি আপনার প্রেমে নিশিদিন মগ্ন থাকিতে পারি; আমি বালক, আপনার প্রেমে মাতিবার ক্ষমতা আমার নাই।" ধ্রুব তাঁহার প্রেমাস্পদের নিকট কি চাহিলেন? "তাঁহার প্রেমে মাতিবেন!" রাজ্য সম্পদ কিছুই চাহিলেন না—কেবল তাঁহার প্রেমে নিশিদিন মগ্ন হইতে চাহিলেন। যে চরণ সেবার জন্য তাঁহার হৃদয় পিপাসাকুলিত হইয়াছিল, যে বদন নিরীক্ষণ করিবার জন্য তাঁহার নয়ন কাতর হইয়াছিল, সে চরণ সেবা,—সে বদন নিরীক্ষণ করা,—তাঁহার মনে থাকিল না, তিনি কেবল তাঁহার প্রেমে মাতিতে চাহিলেন।

প্রহ্লাদ হস্তীপদতলে পতিত হইয়াও তাঁহার প্রেমাস্পদকে ভুলিয়াছিলেন না—হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে নানা প্রকার কষ্ট, নানা প্রকার উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু বালক প্রহ্লাদ অবহেলে সমস্তই সহ্য করিয়াছিলেন,—কেবল তাঁহার প্রেমে মাতিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া। তিনি সমস্ত জগতময় শ্রীহরির বিকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন, জগতময় তাঁহার বিশ্বপ্রেমে আপ্লুত উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই স্ফটিক-স্তম্ভেও তাঁহার প্রেমাস্পদকে দেখিয়াছিলেন।

হে আমার প্রেমিক সাধক! জগতই যখন ভগবানের প্রেম-রাজ্য তখন তুমি যাহা কর, সবই যে তোমার প্রেম। তোমার জন্ম মৃত্যু সবই ভালবাসা! তোমার জন্ম হইলে তোমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তাঁহাদের মন আনন্দে বিহ্বল হইল, তাঁহারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। সমস্ত রাত্রির অন্ধকারের পর যেমন পূর্ব্বাকাশ রক্তিমাভা ধারণ করিলে সোণার দিনমণি হাসিমুখে দেখা দিতে থাকেন, মেঘমালা যেমন পবন সঞ্চালনে মৃদুমন্দগতিতে অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হয়, ও উজ্জ্বলকান্তিতে সুশোভিত হইয়া ভূমণ্ডলে তদাগমনবার্ত্তা প্রচার করে, সেইরূপ তোমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ তোমার প্রেমাকৃষ্ট হইয়া প্রতিবেশীমণ্ডলীর নিকট তোমার জন্মবার্ত্তা প্রচার করিলেন।

ক্রমে তোমার বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জগতে তোমার ভালবাসার প্রসার হইতে লাগিল। ক্রমে পল্লী, দেশ প্রদেশাদিতে তোমার ভালবাসা প্রবাহিত হইল। তখন তুমি চারিদিকে যাহা দেখিতে লাগিলে তাহাতেই ভালবাসা উপলব্ধি করিতে লাগিলে। যখন তোমার ভালবাসা সমাজ, জাতি ধর্ম্ম, দেশে বিদেশে সর্ব্বত্রই বিস্তার হইল, তখন ভালবাসা যে স্বর্গীয় বস্তু তাহা বেশ ভালরূপে বুঝিতে পারিলে। তখন জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তোমার ভালবাসার প্রসার হইল। সমস্ত জগত এক হইল। তখন প্রতি অণু পরমাণু পর্য্যন্ত তোমার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন পর মন বেদনে, পরদুঃখে আপনার দুঃখ বলিয়া বিবেচিত হইল। তুমি তখন জগতব্রহ্মাণ্ডে প্রেমাস্পদের প্রেম দেখিতে সমর্থ হইলে। মৃত্যুতেও যে ভালবাসা। তুমি মরিতেছ, সে মরিতেছে, সকলেই যে সেই প্রেমস্বরূপের নিকট পৌঁছাইতেছে, সকলেই যে সেই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে মিশিতে চলিয়াছে। সুতরাং মৃত্যু ও যে আনন্দ। মৃত্যু ও যে ভালবাসা।

হে আমার প্রেমিক সাধক। এই ভালবাসা যাহা স্বর্গীয়, তাহাকে লোক-গত, সমাজগত, ধর্ম্মগত করিলে চলিবে না—যখন তুমি ভগবানের এবং জগত যখন ভগবানের বিকাশ—তখন জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভেদাভেদ ভুলিয়া আত্মাভিমানকে বিসর্জ্জন দিয়া ভালবাসার সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে হইবে। ভাবনা কি? তোমরা যে সকলেই সেই পরব্রহ্মের। তোমরা যে সকলেই সেই ভগবানের বিকাশ। এস আমারা তাঁহাকে ভালবাসি, যাঁহার কৃপায় এ জগত ব্রহ্মাণ্ডে "আমি" মানুষ বলিয়া জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব স্থানের অধিকারী। জন্মাবধি যাঁহার ক্রোড়ে রহিয়াছি, জন্মাবধি যাঁহার লালনপালনে বর্দ্ধিত হইয়া জগতের নিকট আমি মানুষ। এখন মানুষের মনুষত্ব দেখাও। মনে রেখো তুমি পশু নও। পশু প্রবৃত্তি ত্যাগ কর? যখন জীব ভগবানের অংশ—অবগত হইয়াছ, যখন বিশ্বে ভগবানের বিকাশ উপলব্ধি করিয়াছ, যখন ভগবানে তোমার বিশ্বাস ও ভালবাসা জন্মিয়াছে, তখন এ রণে জয়ী কাহারা? প্রেম যাঁহাদের অস্ত্র, সাম্য যাঁহাদের রণনিনাদ, সত্য যাঁহাদের আশ্রয়, আর প্রেমাস্পদ ভগবান যাঁহাদের অধিনায়ক, তাঁহারা কি কখন প্রেমরণে পরাজিত হইবে? ইহা সত্য যে, আমরা সকলেই ক্ষুদ্র, আমাদের শক্তিও ক্ষুদ্র। কিন্তু আমরা যে সেই মহাশক্তির অংশ। আমাদের ভালবাসার প্রসারিণীশক্তি যে "তিনি"। আবার ইহাও সত্য যখন সেই ক্ষুদ্র মানবের ভিতরে অনন্ত প্রেমশক্তিকণা প্রবেশ করিয়া তাহার

প্রাণকে অনুপ্রাণিত করে, তখন সেই ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রত্ব কোথায় পড়িয়া থাকে। তখন তাহার ন্যায় এক ব্যক্তির শক্তি ও অসীম তেজ দেখিয়া জগত অবাক্ হইয়া যায়। ঐ বলে বলীয়ান্ হইয়া মহাত্মা "পার্কার" লক্ষ লক্ষ শক্তি পরিবেষ্টিত হইয়াও ভীষণ দাসত্ব প্রচার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এই অনন্তশক্তির আভা অন্তরে প্রতিভাত হইলে ক্ষুদ্র বালক পর্য্যন্ত এত শক্তির অধিকারী হয় যে, তাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলির আঘাতে সুদৃঢ় প্রস্তরময় গিরিরাজ শূন্যে মিলাইয়া যায়।

যাহার হৃদয়ে প্রেমবন্যা প্রবাহিত তাহার নিকট শত্রু মিত্র ভেদ নাই—শত্রুও তাহার মিত্র। পাঠক! মনে করুন, আপনার সহিত কাহারও ভালবাসা হইয়াছে, আপনার শত্রু আপনার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল; আপনার মধ্যে যে পথ শিথিলভাব ধারণ করিয়াছে, সেই পথ লইয়া আপনাদের মধ্যে কুৎসা রটাইতে লাগিল। শত্রু মনে করিতে লাগিল, বড় জব্দ করিতেছি; কিন্তু কি হইল—আপনাদের মধ্যে যে তরলতা ছিল—আপনাদের মধ্যে যে গলদ ছিল—তাহা শত্রুর শত্রুতায় কাটিয়া গেল। প্রেমের যে বেড়াটা আলগা ছিল, তাহা শত্রু কর্ত্তৃক শক্ত হইল। আবার দেখুন, যীশুর শত্রুরা যীশুকে মারিয়া ফেলিয়া ভাবিল, কণ্টক গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার শত্রুরাই যে মিত্রের কাজ করিল! তাঁহাব মৃত্যুর পর তাঁহার প্রচারিত মত চারিদিকে মানিয়া লইল। তাঁহার জীবিত থাকার সময় তাঁহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল না, শত্রুর শত্রুতায় তাহা ঘটিল। সুতরাং শত্রু কোথায়? যীশুর শত্রুরাই যে মিত্রের কর্ম্ম করিল। আজ সমাজে ও ধর্ম্মে যে সকল শত্রুর শত্রুতা দেখিয়া ভীত ও ত্রস্ত হইয়া নীরবে কালাতিপাত করিতেছ, যদি ভালবাসার ক্ষমতা থাকে, যদি প্রেমাস্পদে বিশ্বাস থাকে, যদি সর্ব্বজীবে সমপ্রেম থাকে, তবে দেখিবে যে, তোমার শত্রুরাই মিত্রের কাজ করিয়াছে।

ব্রহ্মচারী দেবব্রত।

জন্ম-স্মৃতি।

(শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ স্বামি পাদানাং জন্মোৎসব তিথৌ।)

বন্দনা।

মূর্ত্তমহেশ্বরমুজ্জল ভাস্করমিষ্টমমর-নরবন্দ্যং।
বন্দে বেদতনু মুজ্‌ঝিত গর্হিত কাঞ্চন-কামিনী বন্ধং॥
কোটিভানুকর দীপ্তসিংহমহো কটিতটকৌপীনবস্তং
অভিরভিহুঙ্কার নাদিতদিঙ্‌মুখ প্রচণ্ড তাণ্ডবনৃত্যং—
ভুক্তিমুক্তি কৃপাকটাক্ষাপেক্ষণমঘদলবিদলনদক্ষং
বালচন্দ্রধরমিন্দুবন্দ্যমিহ নৌমি গুরু বিবেকানন্দং॥

জন্ম।

১॥ নিরাধার আকাশবিস্তার স্থির যথা সুষুপ্তির ছায়।
রবিশশী, জ্যোতি জালে মিশি, স্থিত যেই নির্লেপ সত্তায়॥
দেশকাল, ছন্দসুরতাল, সুবিশাল যে অখণ্ডে লীন্।
লুপ্তসত্তা, কার্য্য-কারণতা, বিচিত্রতা- তরঙ্গ-বিহীন্॥
গতিশূন্য, জ্যোতিষ্ক অগণ্য, মহাশূন্য নাহি সৃষ্টিভান্।
অপ্রতর্ক অজ্ঞেয় জগৎ সুপ্ত যথা সহ মহাপ্রাণ্॥
মহাস্তোম, মরুমেরুব্যোম, সূর্য্যসোম অভিন্ন যথায়।
জ্ঞাতা জ্ঞান্ দুর্জ্ঞেয় মহান্ একপ্রাণ্ যে ভূমআত্মায়॥
দিগ্ দেশ কালে, জ্যোতি জালে, গ্রাসে যথা আঁধির পলকে
বারম্বার সৃজনসংহার স্বপ্নসম যথায় ঝলকে॥
আছ বসি, কে তুমি সন্ন্যাসি, হেন দীপ্ত অখণ্ডমণ্ডলে।
যোগাসীন সমাধিবিলীন সুপ্তমীন মহাম্বুধি জলে॥

২॥ স্নেহভরে, কে ডাকে অদূরে রাখিবারে জপতপোধ্যান্।
প্রাণপণ—মহাআকর্ষণ—বজ্রঘোষ "জীবের কল্যাণ্"॥
ভাঙ্গিলনা সমাধিসাধনা তবু মগ্ন অখণ্ডআত্মায়।
ধ্যানস্থির অনমিতশির মহাবীর নাহি ফিরে চায়॥

দয়াময় শঙ্কিতহৃদয় পুনঃ কয় চল মম সনে।
ঘোরঘন কামিনী-কাঞ্চন আবরিল আব্রহ্ম ভুবনে॥
হাহাকার, ভীতি ব্যভিচার, ধরা ভার না সহিছে আর।
ধ্যান ছাড়ি, উঠ ব্রতধারি, সহকারী হও হে আমার॥
সবিস্ময় অরুণ উদয় মৃত্যুঞ্জয় চাহে তাঁর পানে।
আজ্ঞা শিরোধার্য্য, তব কার্য্য, সাধিব হে জীবের কল্যাণে॥
অলক্ষিতে জনম জগতে উভয়েতে অলক্ষ্য মিলন।
ভাগ্যবান্ পায় চক্ষুদান, মর্ত্তে হেরি নরনারায়ণ॥

পুণ্যস্মৃতি।

ও॥ আজি তাঁরি জন্মতিথি স্থিতি যাঁর ব্রহ্মধামে।
মিলেছি হেথায় সবে তাঁহারি পবিত্র নামে॥
স্মরি তাঁর গুণগ্রাম, নিয়ে তাঁর পুণ্য নাম,
পবিত্র হইব সবে——করিব জীবন পণ॥
তদুদ্দিষ্ট উপদেশে গঠিতে নব-জীবন॥ ১।

জ্ঞান॥ শোন নাকি দূরে তাঁর সিংহ-ভৈরব-গর্জ্জন ?
"তত্ত্বমসি" মহামন্ত্রে ধ্বনিত-পূর্ব্ব-গগণ॥
ভারতের চারিধারে, মহাসাগরের পারে,
উঠিয়াছে মহারোল——মহামন্ত্র আরাধনা।
নাহি মুক্তি পরিত্রাণ আত্মাবলম্বন বিনা॥ ২।

দৃঢ়ভক্তি নিষ্ঠা ভরে শ্রবণাদি প্রয়োজন।
মনন সহায়ে পরে হয় আত্ম দরশন॥
সুপ্ত মহাসিংহ তবে, পুন জাগিয়া উঠিবে,
ভয় ভীতি যাবে টুটি যাবে জন্ম মৃত্যু জরা।
অভিনব বজ্রনাদে কাঁপিবে সাগর ধরা॥ ৩।

আত্মজ্ঞানহীনতায় ক্লীবতা প্রশ্রয় পেয়ে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম নীতি নিষ্ঠা সকলি গিয়েছে খেয়ে॥

"যে দিকে ফিরিয়ে চাই, প্রাণের স্পন্দন নাই,"
বলিতেন প্রভু সদা মৃত-কঙ্কালাস্তি প্রায়।
শ্রদ্ধাহীন-কর্ম্মকাণ্ড অতীত স্মৃতি জাগায়॥ ৪।

বলিতেন প্রভু মোরে স্নেহভরে নিরবধি।
"আন্ নাচিকেতা-শ্রদ্ধা আত্মজ্ঞান্ চা'স যদি"॥
নাহি জীব-পরিত্রাণ, বিনে আত্মতত্ত্বজ্ঞান্,
জ্ঞান-নিষ্ঠ হ'লে তবে কর্ম্মে হয় অধিকার।
পদে পদে বিস্খলন জ্ঞানের অভাব যাঁর॥ ৫।

কর্ম্ম॥ তন্ময় হইলে মন লয় করমের পার।
ফলাফল বিচারের অবসর নাহি তার॥
সেরূপ করমে যার, হইয়াছে অধিকার,
সে হয় নিষ্কাম-কর্ম্মী জগতের হিতকারী।
অহেতুকদয়াসিন্ধু দীনবন্ধু ভবতরি॥ ৬।

ভক্তি॥ যথার্থ ভক্তির রূপ সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান্।
আচণ্ডালে প্রেম যার সেই ভক্ত মতিমান্॥
দুঃখী দরিদ্র মহান, ভূতে ভূতে ভগবান,
জানিয়া যে সেবা করে সেই ভক্ত শ্রেষ্ঠ হয়।
মুক্তি করতলে তাঁর পরার্থে যে দেহ বয়॥ ৭।

ভক্তিতে গোঁড়ামী, আর জ্ঞানে শুষ্ক তার্কিকতা।
ইতেই বন্ধের বীজ, সৃজে সাম্প্রদায়িকতা॥
অবরুদ্ধ স্রোতপ্রায়, অকালে পচিয়া যায়,
পূতিগন্ধে সমাচ্ছন্ন হয় কালে পথ-মত।
উভয়ে সতর্ক হ'তে আদেশ দিতেন কত॥ ৮।

করমে অশেষ বন্ধ ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি যায়।
যত কেন সাবহিত কর্ম্ম কর ধরি কায়।
মঠ করি এত ভয়, "না জানি আঁসিতে হয়,"
বলিতেন বার বার প্রভু গুণকর্ম্মহীন।
জীবের কা কথা যারা কামকাঞ্চনমলিন্॥ ৯।

যোগ ॥ একাগ্র হৃদয় যার সূক্ষ্মপথ সুষুম্নায়।
চক্রে চক্রে জ্যোতি হেরি তবু যে উঠিয়া যায় ॥
অলৌকিক্ শক্তি পেয়ে, যে যোগী থাকে সহিয়ে,
যোগ মার্গে সে সাধক অন্তে পরমার্থ পায়।
যোগপথে বহু বিঘ্ন সিদ্ধি প্রমাদ ঘটায় ॥ ১০।

কায়মনোবাক্যে যেবা যে পথে করে সাধনা।
বিলম্বে কিম্বা অচিরে পূর্ণ তাহা'র কামনা ॥
উদ্দাম উন্মত্ত যেই, পরমার্থ লভে সেই,
মত-পথ-ভিন্নতায় কিছু নাহি আসে যায়,
আত্মজ্ঞান লাভে তারা নাহি হয় অন্তরায় ॥ ১১।

নিজের জীবনে প্রভু এই তত্ত্ব বুঝাইতে।
আসিলেন দেহ ধরি অখণ্ডমণ্ডল হ'তে ॥
গুরু কার্য্য সাধিবারে, আজি তিনি ধরা পরে,
জন্ম লভি করিলেন সুপবিত্র ধরাধাম।
গাও সবে আজি শ্রীবিবেকানন্দ পুণ্য নাম ॥ ১২।

যাঁহার জীবন-গাথা পরম পুণ্যের খনি।
একধারে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মবীর-চূড়ামণি ॥
তাঁহারি চরণ যুগে, ক্রীতদাস যুগে যুগে,
'বাঙ্গাল' স্নেহের আখ্যা দিলা যারে গুণমণি।
জন্মতিথি পূজি সেই সার্থক মানে জীবনী ॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

ফকির লালনসাঁই।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫৮ পৃষ্ঠার পর)

লালন গৃহে গিয়া দেখিলেন,—স্বীয় স্ত্রী বিধবাবেশধারিণী, ব্রহ্মচারিণী। শুনিলেন, তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়াদি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া লালন হৃদয়ে কেমন একটা দারুণ যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন, অন্তরের

অন্তস্তলে কেমন একটা ভীষণ আঘাত, কেমন একটা দুর্ব্বিসহ বেদনা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। লালনকে দেখিয়া তাঁহার পিতামাতা আত্মীয় স্বজন সকলেই যুগপৎ স্তম্ভিত বিস্মিত ও পুলকে পুর্ণিত হইলেন। লালন তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই হৃদয়বান, দেবচরিত্র মুসলমান ও তাঁহার দেবীস্বরূপিণী স্নেহময়ী গৃহিণীর সেবাশুশ্রূষা ও করুণার বার্ত্তা জানাইলেন। আর স্বীয় পিতার নিদ্দয়তা ও নিম্মমতার কথা বলিতে বলিতে লালন বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া, ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। হিন্দুর কঠোর নিয়মে লালনের আজ পিতৃগৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, লালন আজ পিতার রন্ধন গৃহে যাইবার অধিকার হারাইয়া বসিয়াছে; কেন না, লালন আজ আর হিন্দু নাই। লালন আজ মুসলমান, লালন আজ যবন! লালন আজ মুসলমান কি ভাগ্যবান, তাহা কে বলিতে পারে?

এ কালের মত সে কালের হিন্দুসমাজের বন্ধন এত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল না। সে সময় কেহ যদি নিষিদ্ধ খাদ্য বা অখাদ্য ভোজন করিত, আর সেই সংবাদ যদি সমাজের কর্ণকুহরে পৌঁছিত, তাহা হইলে তাহাকে সমাজ-চ্যুত বা দণ্ডাহ হইতে হইত। সমাজরক্ষক গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ লালনকে কহিলেন—"লালন! তুমি যখন যবনের অন্নজল গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমাকে প্রায়শ্চিত্তাহ হইতে হইবে। যথারীতি স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ ও পবিত্র হইলে, সমাজ তোমাকে গ্রহণ করিতে পারে। তদুত্তরে লালন বলিলেন, "আর আমার সমাজে কাজ নাই, আর আমার জাতি-কুলে প্রয়োজন নাই। জাতির "বেড়ার" মধ্যে—কুলের গণ্ডীর ভিতর—সমাজের কূপের মাঝে আর আমার চিরাব্দিকাল অবস্থান করিবার সাধ নাই।" মনে হয় লালন এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই একদিন গাহিয়াছিলেন—

"কুলের বৌ হ'য়ে রে মন! আর কতদিন থাকবি ঘরে।
ঘোম্‌টা ফেলে চল্‌নারে যাই সাত বাজারে॥
কুলের ভয়ে কাজ হারাবে, কুল কি তোর সঙ্গে যাবে,
সে দিন, তুই পস্তাবি, শ্মশানে নিয়ে, যে দিন ফেলবে তোরে॥
দিস্ না তুই আচার কড়ি, হও গিয়ে নাড়ানাড়ি,
তোর—দূরে যাবে কর্ম্মফল, থাক্‌বি ভাল এ সংসারে॥
কুলের মান যেজন বাড়ায়, গুরুর কৃপা সে নাহি পায়,
ফকির লালন থাকে ফাত্‌বার বেড়ায় কুল ঢেকেরে॥"

প্রকৃতই ভাই, জাতিতে কেবল কর্ম্মভোগ। জাতিকুল কখনও ভগবানের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে না। বন্ধন ছাড়া মুক্তির পথ দেখাইতে কখনই সমর্থ নহে। তাই অমৃত ভবন ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্রজের ব্রজাঙ্গনাগণকে, ভগবৎ প্রেমবিরোধী বন্ধনকারণ জাতিকুল লজ্জা-ভয়কে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ভগবান ত ভাই, জাত অজাতি বুঝেন না। যে শরণাগত হয়, ভগবান ত তাহাকেই আপন শান্তি ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করেন। যে ভক্ত, জগন্নাথ ত ভাই, তাহারই অধীন! ভক্ত লালন এক সময় গাহিয়াছিলেন—

জগন্নাথে দেখরে গিয়ে।
চণ্ডালে এনে দেয় অন্ন, ব্রাহ্মণে তাই খায় চেয়ে॥
ধন্য প্রভু জগন্নাথ, সে চেনেনা জাত অজাত,
ভক্তের অধীন সে—
দুরাচারী কুলবিচারী খেদায়ে দেয় সে দূর ক'রে।
জোলা ছিল কুবীর দাস, তার "তোড়নী" বারমাস,
উঠছে উথলিয়ে—
সেই "তোড়নী" খায় যে ধনী, সেই আসে ঠাকুর দরশন পেয়ে॥
জাত না গেলে পাইনে হ'র, কি ছার একটা গৌরব করি,—
ছুঁস্‌নে বলিয়ে—
লালন কয় জাত হাতে পেলে পুড়াতাম আগুন দিয়ে॥

লালন ধর্ম্মোদ্দেশে গৃহ ত্যাগ করিয়া ফকির সাজিতে কৃতসংকল্প হইলেন। পিতা লালনকে গৃহত্যাগ করিতে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব লালনকে গৃহে থাকিবার জন্য কত কাতর অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভার্য্যার চক্ষের সহস্রধারা লালনকে গৃহে অবস্থিতির প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। জননী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "লালন। তুই যে আমার হারানিধি! একবার হারাইয়াছিলাম, হারান ধন ভগবান আমাকে মিলাইয়া দিয়াছেন, আর তোকে ছাড়িব না। এই বয়সে ধর্ম্মোদ্দেশে তুই কোথায় যাইবি! মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়া, মাকে চিরদুঃখভাগিনী করিয়া, কোন্ প্রাণে বাপ! সংসার ছাড়িয়া ফকির সাজিবি! তোর সংসার ত্যাগের কথা শুনিয়া কি বাপ! আমি স্থির থাকিতে পারি? আমার যে বুক ছিঁড়িয়া যাইতেছে। মায়ের কথা রাখ্। মায়ের

প্রাণে কষ্ট দিয়া, মাকে চিরদুঃখিনী করিয়া, তোমাকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়া কোথাও যাস্‌না বাপ্‌! লালন তুমি ত আমার অবুঝ ছেলে নও। জান ত বাপ, মায়ের কথা রাখাও ছেলের পরমধর্ম্ম। ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে হয়, বাপ! ঘরে বসিয়া কর। জননীকে শোকে দুঃখে রোদন করিতে দেখিয়া হৃদয়বান লালন অশ্রুসিক্ত নয়নে, রুদ্ধকণ্ঠে মাকে বুঝাইতে লাগিলেন—"মা! আর কাঁদ কেন? পূর্ব্বেই ত আমাকে চিরবিদায় দিয়া অনেক কাঁদিয়াছ! তোমারা ত মনে প্রাণে জান মা! আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহাই এখন মনে করিয়া রাখ না মা! আমি যদি দেশে ফিরিয়া না আসিতাম, তাহা হইলেত মা সমস্তই সহ্য হইত। মা! আমার জন্য তুমি অনেক কষ্ট, অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছ, আমার বিয়োগ শোকে অনেক কাঁদিয়াছ। নিষেধ করি মা! আর কাঁদিও না। আর চক্ষের জলে ধরাতল সিক্ত করিও না। ভগবানে নির্ভর কর, হরিনাম জপ কর। সকল দুঃখের, সকল কষ্টের অবসান হইবে। মা! এ সংসারে কে কাহার জননী? শুধু মা! মিছে মায়ায় আমার আমার করা। আমার বলিতে মা! এ সংসারে একমাত্র জগদীশ্বর! মা! তাঁহাকে ডাক, হৃদয়ে আরাম, প্রাণে প্রকৃত শান্তি পাইবে। আমি ত মা! ভগবানের নামে, ভগবানের প্রেমে ফকির সাজিব, স্থির সংকল্প করিয়াছি। মা! আমার এ সদিচ্ছায় আর বাধা দিস্ না। মা! শান্ত হইয়া ধর্ম্মপথযাত্রী তনয়কে আশীর্ব্বাদ কর যেন তাহার মনোবাসনা, হৃদয়ের অভিলাষ পূর্ণ হয়। মা! তুমি যতদিন বাঁচিয়া আছ, ততদিন মধ্যে মধ্যে, যদি জীবনে বাঁচিয়া থাকি, এক একবার আসিয়া তোমার চরণ দর্শন করিয়া যাইব।" এইরূপ ভাবে মাকে সান্ত্বনা করিয়া, লালন মায়ের পদ-যুগলে প্রণত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে একটু সদর্পে বালক লালন আত্মীয় স্বজনকে বলিলেন—"আমি যখন একদিন মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তখন আর কেহ আমাকে হিন্দুর গৃহাশ্রমে রাখিতে সক্ষম হইবে না। আর এ সংসারে স্ত্রীপুত্র লইয়া মিছে দোকানদারী করিবারও অণুমাত্র ইচ্ছা রাখি না; আর এ সংসারে থাকিয়া কাহারও এস্তেজারি করিতেও চাহি না। মহানুভব লালন এক সময় এই মর্ম্মে একটী গান রচনা করিয়া প্রাণের আবেগে গাহিয়াছিলেন—

দেখ না মন! ঝাকমারি এই দুনিয়াদারি।
পরিয়ে কৌপীন ধ্বজা, কি মজা উড়ায় ফকিরি॥

যা কর তা কর রে মন, তোমার পাছের কথা রেখ স্মরণ, বরাবরি।
তোমার পাছে পাছে ফিরছে শমন, তোর কোন্ দিন হাতে দেবে ডুরি॥
তোমার দরদের ভাই বন্ধুজনা, সঙ্গের সাথী কেউ হবে না, মন তোমারি।
খালি হাতে একা পথে বিদায় ক'রে দেবে তোরি॥
তোর বড় আশার বাসা যে ঘর,
কোথায় প'ড়ে রবে রে মন, ঠিক নাই তারি।
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, লালন ভেড়ো,
এ ভবে করিস্ নে কারো এস্তেজারি॥

অল্পবয়স্ক লালন, একে একে পিতা মাতা, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে চিরদিনের জন্ম জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিয়া কুলের বাহির হইলেন। কপর্দ্দকহীন নিঃসম্বল নিঃসহায় লালন আজ সাধ করিয়া ফকির সাজিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লালন আজ একাকী দুঃখে ক্ষোভে কষ্টে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, বড় পিপাসিত প্রাণে বড়ই তৃষিত হৃদয়ে শান্তি-সরোবরের অন্বেষণে ছুটিলেন। পিতার অনুরোধ, জননীর কাতরোক্তি, লালনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিল না। বালিকা পত্নীর দুনয়ন বিগলিত দরদর তপ্ত অশ্রুধারা, যৌবনের ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য, স্থির প্রতিজ্ঞ লালনের গতি প্রতিহত করিতে পারিল না, বন্ধুবান্ধবগণের বিনীত অনুনয়ে লালনের মন প্রাণ অণুমাত্রও বিচলিত হইল না। কেমন করিয়া তাঁহার গতিরোধ করা যাইবে? সংসারের স্বার্থপরতা, অপবিত্রতা, সংসার-প্রেমের পরিণাম, অসার মায়িক ভাব, তিনি যে প্রাণে প্রাণে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সংসারে বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল, হৃদয়ের অন্তস্তলে আঘাত লাগিয়াছিল,—তাই আজ জনক জননী, স্ত্রীপরিজন, বাল্যসহচরগণকে ত্যাগ করিয়া জন্মের মত সংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্মবীর লালন, ভগবানের অন্বেষণে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আত্মোৎসর্গ করিলেন। জগতের একটী সামান্য কোণ; সংসারের একটী ক্ষুদ্র অংশ; একটী ক্ষুদ্র নগণ্য পল্লী এক দণ্ডে নীরব নিস্তব্ধভাবে বালক লালনের এই সংসার ত্যাগ, এই মহান্ আত্মোৎসর্গ দেখিল;—দেখিল ধর্ম্মবীরের প্রতিজ্ঞা স্থির, অবিচলিত। দেখিল,—স্ত্রীপরিজন-পরিবৃত সংসার একদিকে, ধর্ম্মবীরের ভীষণ প্রতিজ্ঞা অন্যদিকে; ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্নিগ্রহ রিপুনিচয় একদিকে, সত্যসেবীর অনন্ত সত্য অন্যদিকে। দেখিল,—সংসার-বিরাগীর দিব্য বিবেকালোকের কাছে

সংসারানুরাগী মূঢ়দিগের মোহান্ধকারের পরাজয়। বিবেকী বিরাগীকে মায়াময় সংসারে টানিয়া আনিবার জন্য লোকের আহ্বান নিষ্ফল। দেখিল জাতি গৌরব, মান সম্ভ্রম, ভোগলিপ্সার আহ্বান, বিবেকী বৈরাগীর কাণে পৌঁছে না।

লালন সংসারকে ভ্রূকুটি করিয়া দেশান্তরিত হইলেন। সংসারে হাহাকার পড়িয়া গেল। লালনের অভাবে সংসার শূন্য হইল। লালনের মৃত্যুজনিত শোক তাঁহার পিতা মাতা স্ত্রী সকলেই একরূপে সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু লালনের গৃহত্যাগ জন্য বিয়োগ ব্যথা সকলেরই যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। বিদায়গ্রহণকালে লালন তাঁহার পত্নীকে তাঁহার অনুগমন করিবার জন্য নম্র ভাবে বারকতক বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী পতিপদ অনুসরণে সাহস করিলেন না। কিরূপেই বা সাহস করিবেন? কেন তিনি বালিকা, আশৈশব হিন্দুভাবে অনুপালিত, তাহার পর আবার কখনও কোনদিন বাড়ীর বাহির হন নাই। চিরদুঃখিনী বালিকা গৃহে থাকিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন প্রাণ পতির সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছিল। কিছুদিন পরে পতিবিচ্ছেদই তাঁহার কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। পতিবিচ্ছেদ তাঁহাকে বড় বেশীদিন এই পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিতে দিল না। বেশীদিন তাঁহাকে পতির বিরহ সহ্য করিতে হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল। বিষে বিষে নির্ব্বিষ হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী ভোলানাথ মজুমদার।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারস্বত-সম্মিলন।

গত ২রা ফাল্গুন, জেলা চব্বিশ পরগণা মজিলপুর গ্রামে মদীয় অগ্রজপ্রতিম রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের পল্লীবাস ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারস্বত-সম্মিলনে যোগদান করিয়া ধন্য হইবার জন্য আহূত হইয়াছিলাম। প্রাতে ৯ নয় ঘটিকার সময় মদীয় সালিখা ভবন হইতে বহির্গত হইয়া বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তথায় আচার্য্যপাদ ভগবদ্ভক্ত শ্রীমদ্ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, তত্ত্ব-মঞ্জরীর সম্পাদক আমার অভিন্নহৃদয় শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মজুমদার, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার পাত্র ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের সঙ্গ লাভ করিয়া পরমানন্দে ট্রেণযোগে বেলা প্রায় ১২॥০ ঘটিকার সময় মগরাহাট ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তথা হইতে

ডোঙ্গা-বাহনে আমরা পাঁচজন মাঠ মধ্যস্থ খালের মধ্য দিয়া বেলা প্রায় ৩ তিন ঘটিকার সময় মজিলপুরে উপস্থিত হইলাম। ডোঙ্গা যাত্রা ক্লেশকর হইলেও পথে দাঁড়িদিগের "বনবিবির" গল্প এবং পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয়ের রসময়ী টিপ্পনী আমাদের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতে থাকায়, আমাদের সকল ক্লেশ দূর করিয়াছিল। ডোঙ্গা হইতে উঠিয়া দেখি, হারাণদাদার (অতঃপর রায় সাহেবকে আমি স্নেহের দাদা বলিয়াই উল্লেখ করিব) অনুজ, পরমভক্ত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় এবং মজিলপুরবাসী কয়েকজন ভদ্রসন্তান, আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত আমরা মজিলপুরস্থ হারাণদাদার বাসভবন 'কর্ণধার কুটীরে' পঁহুছিলাম। তথায় হারাণদাদার আদর আপ্যায়নের কথা শতমুখে ব্যক্ত করিলেও শোধ করা যায় না। পঁহুছিয়া সর্বাগ্রে হারাণদাদার বাটীতে বাণীর চরণ-বন্দনা করিয়া আমরা বহির্ব্বাটীতে বিশ্রামার্থ বসিলাম এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসাদধারণ করিলাম। দেখিতে দেখিতে মজিলপুরের জমিদার, সুধীবৃন্দ, ছাত্রদল ও নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা বাটীর বহিরঙ্গনে মিলিত হইলেন, লোকে লোকারণ্য হইল। তৎপরে আমাদের পথের সঙ্গী চিত্রকর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ক্যামেরা যন্ত্র সাহায্যে সমাগত ব্যক্তিবর্গের ফটো লইলেন। সভা আরম্ভ হইল। এই উপলক্ষে বেলুড় মঠস্থ পরমারাধ্য স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ এবং তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যাদিগের মজিলপুর গমনের বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বিশেষ দুঃখিত অন্তরে তাঁহাদিগকে সে বাসনা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সেই কারণে সভাপতির আসন শূন্য থাকায় হারাণদাদা গোস্বামী মহাশয়কে একাধারে বক্তা ও সভাপতিত্বে বরণ করিয়া আসনগ্রহণ করিলে পর, হারাণদাদার স্বরচিত একটী শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক গীত পল্লীবালকদলের দ্বারা গীত হইয়া সভা-কার্য্য আরম্ভ হইল। গীতটী এই—

ঝিঁঝিট—একতালা।

জয় নারায়ণ, রামকৃষ্ণ, নররূপী ভগবান।
দাঁড়াও সম্মুখে, হাসি-হাসি মুখে, চরণামৃত করি হে পান॥
(আহা, চরণামৃত করি হে পান) (তব চরণামৃত করি হে পান)
ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলে পুড়ে আছি, ছোঁও নাথ মোরে একবার আসি,
ভূতের বেগার খেটে মোরে গেছি, কর হে পুন জীবন দান॥

(আহা, কর হে পুন জীবন দান) (প্রভু কর হে পুন জীবন দান)
সে জীবনে প্রভু তোমারি নাম, গাহি যেন সুখে অবিরাম,
হৃদয় মাঝারে ওহে গুণধাম, জাগায়ে শ্রীমূর্ত্তি করি হে ধ্যান ॥
(তব শ্রীমূর্ত্তি জাগায়ে করি হে ধ্যান) (আহা শ্রীমূর্ত্তি জাগায়ে করি হে ধ্যান)
দক্ষিণে কমলা, বামে বাণী, শিবরূপে তুমি কালী কাত্যায়নী,
তুমি পুরুষ কি নারী, বুঝিতে না পারি, কত ভাবে জীবে করিলে ত্রাণ ॥
(আহা, কত ভাবে জীবে করিলে ত্রাণ) (প্রভু, কত ভাবে জীবে করিলে ত্রাণ)
মা মা রবে কাঁদিয়ে আকুল, হরি বোলে নৃত্য কর হে অতুল,
অনন্ত সে ভাব, স্বভাবে অভাব, হেরিয়ে বিশ্ব পুলকিত প্রাণ ॥
(আহা, হেরিয়ে বিশ্ব পুলকিত প্রাণ) (কিবা হেরিয়ে বিশ্ব পুলকিত প্রাণ)
ডাকি সবে মিলে এ উৎসব মাঝে, এস দয়াময় অলক্ষিত ভাবে,
কাঙ্গাল-ঠাকুর, কাঙ্গালের পুর, কর হে তীর্থ, রাখ হে মান ॥
(দেব, কর হে তীর্থ, রাখ হে মান) (আহা, কর হে তীর্থ, রাখ হে মান)

তৎপরে নিত্যানন্দবংশাবতংশ বৈষ্ণবচূড়ামণি সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তিবলাপ্লুত বীণনিভকণ্ঠে এবং ওজস্বিনী ভাষায় "ভক্তিযোগ" সম্বন্ধে একটী ভাবপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার দ্বারা সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য সর্প সদৃশ মুগ্ধ করিলেন। 'ভক্তি' শব্দের অর্থ এবং অহমিকা ত্যাগ এবং ভক্তির দ্বারা ভগবদুপলব্ধি বিষয়ে নানা উদাহরণ দ্বারা শ্রোতৃগণকে বিশদ ভাবে বুঝাইলেন। তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতাচ্ছটায় যেন মজিলপুর মুখরিত এবং তাঁহার পদার্পণে মজিলপুর পবিত্র হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে পর প্রবীণ সাহিত্য-সেবী সুবিজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে গুটিকয়েক সারগর্ভ কথা বলেন। তৎপরে তত্ত্ব-মঞ্জরী সম্পাদক বিজয়বাবু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে, এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেব, বি, এ, মহাশয় এবং আর আর স্থানীয় ভদ্রলোকগণ কিছু কিছু বলিবার পর হারাণদাদা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্রলীলাকাহিনী ও উপদেশাবলী গ্রামবাসীদের অন্তরে জাগাইয়া দিবার জন্য তাঁহার স্বাভাবিক সরল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় একটী বক্তৃতা করেন এবং গ্রামবাসীদের অনুরোধ করেন, যাহাতে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের প্রদর্শিত দরিদ্র-

নারায়ণগণের সেবায় তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া তাঁহার চেষ্টার সাফল্য সম্পাদনে সহায়তা করেন। অবশেষে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভাভঙ্গ হয়।

এই সম্মিলনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, উক্ত দিবসে হারাণদাদা সাধ্যানুযায়ী দরিদ্রনারায়ণগণের সেবা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে আমার পরমবন্ধু জুজারসাহার জমিদার শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত শ্রীযুক্ত ভূদেবনাথ মান্না মহাশয় কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। সকলে মহানন্দে রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতে ৫ ঘটিকার সময় দাদাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া আমরা বিদায় হইলাম। এক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণশ্রীচরণে আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা, যেন হারাণদাদা দীর্ঘজীবী হইয়া প্রতি বৎসর এইরূপ জনসঙ্ঘ আহ্বান করিয়া মাজলপুরবাসীগণকে শ্রীরামকৃষ্ণ নামে মজাইয়া রাখেন, এবং যে মজিলপুর চারিশত বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণস্পর্শে পবিত্র হইয়াছিল, সেই মজিলপুববাসীগণ স্বয়ং মজিয়া এবং হারাণদাদার সদিচ্ছার পোষকতা করিয়া যেন আপনারা ধন্য হয়েন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

পদাবলীর অভিমত।*

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি শ্রীধাম কামারপুকুর হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিবরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে আশীর্ব্বাদ লিপি পাঠাইয়াছেন, তাহা এই—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
পাদপদ্ম ভরসা।

নিরাপদেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ—

ডাকযোগে তোমার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অষ্টকালীন পদাবলী পুস্তকখানি পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। বইখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করিতেছি,

---

* শ্রীরামকৃষ্ণ অষ্টকালীন পদাবলী। শ্রীরামকৃষ্ণলীলা বিষয়ক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের পুস্তক। মূল্য।• চারি আনা। ভি পি ডাকে মূল্য।/• পাঁচ আনা মাত্র। তত্ত্ব-মঞ্জরী কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়। গ্রাহকগণ সত্বর গ্রহণ করুন।

যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অচলা ও অমলা ভক্তি দিন দিন তোমাতে প্রকাশ পায়।

ঐ অষ্টকালীন পদাবলী শ্রীশ্রী৺ স্থানে আমি পাঠ করিব।

কামারপুকুর, ২৮এ মাঘ, ১৩১৬। } আশীর্ব্বাদক শ্রীশিবরাম চট্টোপাধ্যায়।

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রণেতা, মুগ্ধাক্বতি, আদর্শজীবন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা।

কলিকাতা,
৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১০।

প্রিয় বিজয়!

তোমার সুন্দর রামকৃষ্ণ-গীতিমালা পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমার মনে হয়, এই গানগুলি পুরুষানুক্রমে ভক্তমণ্ডলীমধ্যে গীত হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরিত্র, ইহাদের মধ্যে যাহা চিত্রিত আছে, সমস্তই তুমি ঠাকুর-পরিবারের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছ,—তাই এতো ভাল হইয়াছে।

আমার নমস্কার ও ভালবাসা জানিবে।

শ্রীম—

(৩)

জেলা যশোহরের সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র 'যশোহরে' ১২ই ফাল্গুন তারিখে, যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই—

"যাহাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত ভক্ত ও সেবকগণ দিবারাত্রির অষ্টপ্রহর, ঠাকুরের নাম গানে উন্মত্ত থাকিতে পারেন, তাহার জন্য দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়োপযোগী অনেকগুলি পদাবলী সমন্বিত এই সঙ্গীত পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। এই সকল সংগীতের মধ্য দিয়া ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকাহিনী সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে। যাঁহারা সঙ্গীতবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তাঁহারাও ইহা পাঠে, ভাবে পরিতৃপ্ত হইবেন। আরম্ভে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি মনোজ্ঞ আলেখ্য প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানির মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ উত্তম। আমরা আশা করি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত সেবকমণ্ডলীর নিকট ইহা অমৃততুল্য আদৃত হইবে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

চৈত্র, সন ১৩১৬ সাল।
ত্রয়োদশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

গোপনে, আপন মনে, কতদিন আর থাকবে মা!
পায়ে ধরি, ক্ষেমঙ্করি, দুটো কথা শোনাও না॥
লজ্জাবতী লতাসম, জড়সড় থাকো যেন,
এ সরম কি কারণ,—দিবেনাকি পূজ্‌তে পা॥
অবিদ্যা-অজ্ঞানে মরি, দে মা তোর ঐ চরণতরী,
কাজনি আর এ দোকানদারী, পার কোরে মা নিয়ে যা॥
বিশ্বমাতা তুমি সতি, আদ্যাশক্তি ভগবতী,
রামকৃষ্ণে দে মা মতি, নইলে আমার মাথা খা॥

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

পওহারী বাবা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৯৬ পৃষ্ঠার পর)

উপদেশ।

১। দাস নিজে গর্ত্তে পড়িয়া আছে, অন্যকে পথ কিরূপে দেখাইবে?

২। অন্তরে অনুরাগের উচ্ছ্বাস হয়, বাহিরে তাহাই হরিনামের শব্দে উচ্চারিত হয়।

৩। উপাসনা ছাড়িও না। সেব্যসেবক সম্বন্ধ কখনই যায় না।

৪। দুই বস্তুর একতাই যোগ।

৫। যিনি নৌকায় নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়াছেন, তাঁহার পরবর্ত্তী লোকদিগকে সেই নৌকাই দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু কালে এ পারের সমস্ত নৌকাই জীর্ণ হয়,—তখন পুরাতনের সংস্কার বা নূতন নৌকার প্র[illegible]জন হয়।

৬। যাঁহারা হৃষ্য স্বভাব, তাঁহারাই বাহিরে লোককে ধর্ম্ম দান করেন।

৭। মহাপ্রভু চৈতন্যের ভক্তি এক অপূর্ব্ব ব্যাপার, সে মহাভাব বিকাশের কথা মুখে বর্ণনা করা যায় না।

৮। প্রেম নেম (নিয়মবিধি) মানে না, নেম প্রেম জানে না।

৯। সংসার ধর্ম্মসাধনের একটী স্থান।

১০। প্রবৃত্তি সকলের উপর বল প্রয়োগ করিও না। যাহার যে স্থান, তাহাকে সেইস্থানে থাকিতে দাও। ঈশ্বরের কৃপায় তাহারা সংযত হইবে।

১১। যে সাধু দর্শন করিয়াছে, সেও সাধু হইয়াছে। সাধু দর্শন করিলে কোনও অসাধু ভাব অন্তরে স্থান পায় না।

১২। সাধন বিনা কেহই সিদ্ধ হইতে পারে না। গুরু যাহা উপদেশ দেন তাহা দৃঢ়তার সহিত পালন করিবে, সন্দিগ্ধচিত্ত হইবে না, অধ্যবসায় না থাকিলে সাধন সিদ্ধ হয় না। সাধন যেমন কঠিন তেমনি সহজ, এককালে কেহই চিত্তসংযম করিতে পারে না, চিত্তসংযম না হইলে সাধন সিদ্ধ হয় না। বড়সীবিদ্ধ মাছের সুতা যেমন খানিক ছাড়িয়া দিয়া ক্রমে ক্রমে টানিয়া লইতে হয়, তেমনি মনকেও একেবারে না বাঁধিয়া ধীরে ধীরে ক্রমশ সংযম করিতে হয়। এইরূপে চেষ্টা করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে।

১৩। আনুমানিক বিঘ্নাশঙ্কায়, কার্য্য হইতে কখনও নিবৃত্ত হইও না,

যতটা পথ সহজ বোধ হইতেছে ততদূর অগ্রসর হও, পরে আরও পথ আরও আলোক পাইবে, ও উৎসাহ এবং আনন্দ বৃদ্ধি হইবে।

১৪। সিদ্ধি হইতে সাধন বড়, সাধনের অবস্থা বড় মিষ্ট।

১৫। ষোল আনা বিশ্বাস করিয়া আপনার ভার ভগবানের উপর দিলেই মুক্তি হয়, যেমন মার্জ্জার শিশু মাতার উপর নির্ভর করিয়া স্থির ও শান্ত হইয়া থাকে, মাতা স্বীয় ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে পোষণ ও এক স্থান হইতে অন্য নিরাপদ স্থানে লইয়া যান, ভক্ত ঠিক সেই প্রকার ভগবানের উপর বিশ্বাস করিয়া আত্ম সমর্পণ করেন, তাঁহার কোন চিন্তা নাই,—ভগবান যেখানে রাখিবেন সেইখানেই থাকিবেন।

১৬। সাধন আর এক প্রকার আছে,—যেমন বানর শিশু মাতাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, কোন রকমে বিচ্ছিন্ন হয় না, মাতা যাহাই করুন, সে নিরাপদে থাকিয়া তাঁহার স্তন্যামৃত পান করিতে থাকে। ভক্ত সেইরূপ দৃঢ়ভাবে ভগবানকে ধরিয়া সংসারের শত পরীক্ষা প্রলোভনে পড়িয়াও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হন না। যে অবস্থায় থাকুন, ভগবানের প্রসাদ লাভ করিতে থাকেন। প্রথম উপায় সহজ ও শ্রেষ্ঠ।

১৭। যেখানে পওহারী বাবা বসিতেন, সেখানকার দালানের গায়ে অনেক উৎকৃষ্ট রামায়ণের শ্লোক সকল লেখা থাকিত। একবার একটী শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহাকে তাহার ভাবের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়; সে শ্লোকে রামের প্রতি ভরত ও লক্ষ্মণের অনুরাগের কথা লেখা ছিল। তিনি বলিলেন, রাম যখন পিতৃসত্য পালনার্থে বনে গমন করিলেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁহার চরণে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং অধীরভাবে বলিলেন যে, আমাকে ছাড়িয়া যাইও না, সঙ্গে লইয়া চল, তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিলেন ও বলিলেন, তোমার অযোধ্যাতেই থাকা কর্ত্তব্য, পিতার সেবা করিবে ও তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবে এবং রাজকার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবে। লক্ষ্মণ বলিলেন, আমি আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে, রাম ছাড়া হইয়া লক্ষ্মণ থাকিতে পারেন না। পরে রামচন্দ্র যখন গমন করিয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন ভরত পাত্র মিত্র ও প্রজাবৃন্দ সহ রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিতে যান, কিন্তু রামচন্দ্র ভরতকে বহু সান্ত্বনা প্রদান করিয়া রাজ্য-পালনের জন্য অনুরোধ করেন। ভরত কহিলেন, মহারাজ, আপনার যাহা আজ্ঞা তাহাই হইবে, আপনার আজ্ঞা পালন

করাই আমার সাধন, আপনার বিচ্ছেদে যদি আমার প্রাণ যায়, তাহা হইলেও আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই পালন করিব, আমার নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন দিলাম। আপনার ইচ্ছা পালনার্থে আমি রাজকার্য্য করিব।

দুজনেই রামের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, রামের বিচ্ছেদ দুজনের পক্ষেই তুল্য কিন্তু ভরতের সাধন উচ্চ, তিনি নিজের ইচ্ছা প্রভুর ইচ্ছানুসারে বিসর্জ্জন দিলেন।

১৮। হনুমানের ভক্তি। হনুমানের ন্যায় ভক্তি শ্রীরামের প্রতি স্থাপন কর। যাহার মধ্যে তিনি তাঁহার প্রভুকে দেখিতেন না, তাহার সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকিত না, সেইজন্য রাম বলিতেন, আমা হইতে আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

১৯। সাধু-প্রকৃতি অপেক্ষা সংসারে সুন্দর বস্তু কিছু নাই, যেমন কোমল, তেমনি দৃঢ়। মাখন কোনরূপ সামান্য উত্তাপে গলিয়া যায়, কিন্তু সাধুপ্রকৃতি নবনীত অপেক্ষাও কোমল, কারণ অন্যের উপরে সামান্য দুঃখ ক্লেশ আসিলেই সাধুর হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়, আবার দৃঢ়তার বল এত অধিক যে সহস্র আঘাতেও তাহার পরিবর্ত্তন হয় না।

২০। তিনি একদিন গল্প করিয়াছিলেন যে, একজন সাধু গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন। বর্ষাকালের ভরানদীর ঢেউয়ে একটা বিছা ভাসিয়া যাইতে লাগিল, তিনি উহার জীবন নষ্ট হইবার ভয়ে তাহাকে ডাঙ্গায় তুলিয়া ফেলিলেন, কিন্তু বিছা তাঁহার হস্তে দংশন করিল, তিনি ব্যথিত হইয়া স্নান করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে বিছা আবার জলের ঢেউয়ে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, সাধু আবার তাহাকে বাঁচাইলেন, বৃশ্চিক পুনবার দংশন করিল। বারম্বার এইরূপ হওয়াতে সাধুর মনে হইল, আর ইহাকে বাঁচাইব না, ইহার দংশন যাতনায় আমার প্রাণ যায়। তখনি সাধুর বিবেক সাধুকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল যে, তুমি যাহা চিন্তা করিলে ইহা তোমার যোগ্য নয়, দেখ ওই বৃশ্চিকের কাছে উপদেশ লও, তাহার উপকার তুমি বারম্বার করিলে, তাহার প্রাণরক্ষা করিলে, তথাপি সে তাহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ছাড়িল না, উপকারের পরিবর্ত্তে তোমাকে বারম্বার দংশন করিল। হে সাধো! কিরূপে তুমি তোমার সাধু প্রকৃতি ত্যাগ করিবে? সহস্র অপরাধ পাইলেও কাহারও উপকারে বিরত হইও না।

২১। তাঁহাকে একবার প্রশ্ন করা হয়, ভগবানের নাম লইলে কি ফল

হয়, এবং তাঁহার নামই বা কি? বলিলেন, ভগবান নামহীন, বাস্তবিক তাঁহার নাম কিছুই নাই। একটা পাত্রে যদি পাত্র পূর্ণ করিয়া জল লইয়া কেহ চলে, তার চলিবার সময় পাত্র আন্দোলিত হইয়া যেমন জল উছলিয়া পড়ে, তেমনি ভগবানের ভক্ত-হৃদয় তাঁহারই সত্তায় পূর্ণ, প্রেমরূপী বায়ুতে সেই সত্তা যখন উদ্বেলিত হয়, তখন যে শব্দ ভক্তমুখ হইতে উচ্চারিত হয়, তাহাই ভগবানের নাম।

২২। যখন দীক্ষা গ্রহণ করিবে, উনি ভাল, উনি মন্দ, সে বিচার করিবে না, এবং গুরুর নিকট যে উপদেশ লাভ করিবে, নিঃসন্দিগ্ধ অন্তরে তাহা সাধন করিবে।

২৩। জিজ্ঞাসা করা হইল,—এই ভবসাগর পার হইবার উপায় কি? বলিলেন, পৃথিবীতে যে সকল সাধুমহাজনগণ আগমন করেন, তাঁহারা ইহলোক হইতে চলিয়া যাইবার সময় আপনাদের চরিত্ররূপ নৌকা পৃথিবীতে রাখিয়া যান, সেই নৌকায় চড়িয়া বসিতে পারিলে নির্ব্বিঘ্নে ভবসাগর পার হইতে পারা যায়।

২৪। একজন বলিলেন, রিপুদ্বারা সকল অনিষ্ট হয়। তিনি বলিলেন,—না, রিপু বেচারারা নিরপরাধী, তাহারা তোমার পরিচর্য্যার নিমিত্ত আসিয়াছে, তুমি তাদের যেমন চালাইবে তারা তেমনি চলিবে।

২৫। হাম্ বুদ্ধি (অহমত্তা অর্থাৎ আমিত্ব) নাশ হওয়া উচিত, কিন্তু দাস-আমিত্বের নাশ নাই।

২৬। গাভী যেখানেই থাকুক, গাভী-বৎস নিশ্চিন্ত থাকে। সে জানে ক্ষুধায় কাতর হইয়া ডাকিবামাত্র মাতা আসিয়া দুগ্ধ পান করাইবেন, তেমনি বিশ্বাসী-ভক্ত কখনও কোন চিন্তা করেন না, তিনি জানেন, তাঁহার অন্তরে যে অভাব আছে, জানাইলেই তাহা পূর্ণ হইবে। (সম্পূর্ণ)

সেবক প্রিয়নাথ।

জেলা যশোহরের অন্তর্গত চেঙ্গটীয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের অতি সন্নিকটবর্ত্তী চেঙ্গটীয়া গ্রামে বিখ্যাত মজুমদারবংশে অনুমান ১২৭৭ বা ৭৮ সালে মহালয়ার অমাবস্যার রাত্রে প্রিয়নাথের জন্ম হয়। ইঁহারা রাঢ়ীশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। প্রিয়নাথের পিতার নাম বরদানাথ; মাতার নাম কাত্যায়নী। প্রিয়নাথের শৈশবকালে

পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, মাতা ও জ্ঞাতিবর্গের যত্নে তিনি লালিতপালিত হয়েন। বাল্যে তিনি তাঁহার গ্রাম্য পাঠশালায় বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করেন এবং অনুমান একাদশ বর্ষ বয়সে তিনি কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার আত্মীয় জীতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আবাসে থাকিয়া এবং পরে অপরাপর স্থলে আশ্রয় লইয়া, তিনি রিপণ কলেজে এনট্রান্স শ্রেণী পর্য্যন্ত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় রিপণ-কলেজে অধ্যাপনা করাইতেন, অনেকগুলি যুবক তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া অবসর মত তাঁহার নিকটে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেন। প্রিয়নাথ তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। এই যুবকগণ, মৎস্য, মাংস, তৈল ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া অতি শুদ্ধাচারে জীবনযাপন করিতেন। কখন কখন ইঁহারা রবিবারে ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন, এবং ভিক্ষালব্ধ চাউলাদি রন্ধন করিয়া পবিত্র অন্নজ্ঞানে আপনারা সেবন করিতেন এবং গরীব দুঃখীকেও আহ্বান করিয়া খাওয়াইতেন। কোথাও সাধু আছেন, শুনিলে ইঁহারা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার দর্শনে যাইতেন। কখন কখন সন্ধ্যাকালে ইঁহারা গঙ্গার তীরে যাইয়া অথবা নিভৃত কোনও উদ্যানে প্রবেশ করিয়া ধ্যান ও ঈশ্বর-চিন্তা করিতেন।

১২৯৭ সালের আষাঢ় কি শ্রাবণমাস, বর্ষাকাল, তাঁহারা এক রবিবারে ভিক্ষা করিয়া নারিকেলডাঙ্গার কোনও এক নিভৃত উদ্যানে সকলে মিলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পূজা ও ভোগরাগাদি দিয়া আনন্দ-উৎসব করিতে-ছিলেন। তাঁহারা প্রায় ১৪।১৫ জন ছিলেন। রামকৃষ্ণসেবক রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্র মহাশয়দ্বয় সে দিবস যোগোদ্যানে ছিলেন। তাঁহারা জনৈক লোকের মুখে এই সংবাদ পাইয়া প্রাণে পরম আনন্দ বাসিয়া অতি উৎসুক ও কুতূহলচিত্তে তৎক্ষণাৎ গাড়ী করিয়া ঐ যুবকগণকে দেখিবার মানসে সেই উদ্যানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে মাধবচন্দ্র ঘোষ নামে, রামবাবুর একজন ভৃত্য ছিল। মাধব ঠাকুরকে বিশ্বাস ও ভক্তি করে, তাই সে রামবাবুর পরিবারভুক্ত ও চিরপোষ্য বলিয়া গণ্য। যুবকগণ যে উদ্যানে উৎসব করিতে-ছিলেন, তথায় ধান্যের ক্ষেত্র ছিল। রামবাবু ও মনোমোহনবাবু সেই ধান্যের ক্ষেত্র মধ্য দিয়া, পদ কর্দ্দমাক্ত করিয়া সেই যুবকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং "জয় রামকৃষ্ণ" ধ্বনি তুলিয়া ঐ যুবকগণকে উৎসাহিত করিয়া দিলেন। যুবকগণ তাঁহাদিগের দর্শনে ও পরিচয়ে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাদের

পায়ের কর্দ্দম মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রসাদ খাওয়াইয়া পরে আপনারা প্রসাদ পাইলেন। সেদিনকার অপূর্ব্ব আনন্দে যুবকেরা বিস্ময় মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

ইহারই দিন পোনর পরে যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব। ঠাকুরের প্রতিষ্ঠার পঞ্চমবর্ষীয় উৎসব। রামবাবু ও মনোমোহনবাবু যুবকগণকে যোগো-দ্যানে যাইবার জন্য বলিয়া গেলেন। তাঁহারা পর সপ্তাহের এক দিবস অপরাহ্ণে যোগোদ্যানের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন এবং তথায় যাইয়া দেব-দর্শনে তাঁহারা পরম আনন্দ অনুভব করিয়া আসিলেন। সেই হইতে এই যুবকগণ প্রায়ই যোগোদ্যানে যাতায়াত করিতেন এবং রামবাবু ও মনোমোহন বাবু এবং ঠাকুরের অপরাপর ভক্তগণসহ ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। এইবার উৎসবের দিনে ঠাকুরের অনেকগুলি ছবি সাধারণে বিতরিত হইয়াছিল, যুবকগণ তাহা আনিয়া স্ব স্ব পাঠগৃহে রাখিয়া দিয়া-ছিলেন। প্রিয়নাথেরও পাঠগৃহে ঐ ছবি থাকিতে আমরা দেখিয়াছি। রামবাবু এই যুবকগণকে ঠাকুরের একখানি জীবনবৃত্তান্ত প্রদান করিয়া-ছিলেন। যুবকেরা ঐ পুস্তকখানি প্রায়ই নিত্য সায়াহ্নে পাঠ করিতেন।

এই যুবকেরা সর্ব্বদা সদালোচনায় এ সৎ পুস্তকাদি পাঠে অবসর-সময় অতিবাহিত করিতেন। সৎ পুস্তকে যে সমস্ত উপদেশ পাইতেন, তাহা প্রত্যেকে একটী খাতায় সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। প্রিয়নাথ সেই সময়ের একখানি মোটা খাতা অতি সযত্নে তাঁহার নিকটে প্রায় ১৩।১৪ বৎসর রাখিয়াছিলেন। চিন্তাশীল সাধু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একটী কবিতা তাঁহার এই খাতায় লেখা ছিল—তাহা হইতে তিনি নিম্নের কথা কয়টী প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন—

"'প্রিয়নাথ' নাম মোর—বড় ভালবাসি—
রেখেছেন, জনক জননী।
প্রিয়নাথ!, প্রেম দাও দীনে,—
প্রিয় যেন হেরে সে তোমারে।"

সম্প্রতি তিনি যখন যোগোদ্যানে বাস করিতে থাকেন, সেই সময়ে একদিন এই খাতাখানি 'জয় গুরু' বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকুণ্ডে কর্দ্দম মধ্যে পুঁতিয়া দেন। প্রিয়নাথের সহপাঠী অনেক যুবক এইক্ষণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, রামকৃষ্ণ-মিশনে কার্য্য করিতেছেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী, প্রিয়নাথ, মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকটে দীক্ষা

গ্রহণ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই প্রিয়নাথ লেখাপড়া পরিত্যাগ করিয়া কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। ১৩০৭ সালের ২২শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, দোল-পূর্ণিমার দিবস প্রিয়নাথের জননী পরলোক গমন করেন। তাঁহার স্বর্গারোহণে প্রিয়নাথের সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয়। প্রিয়নাথ বিবাহ করেন নাই। তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে বিবাহিত হইবার জন্য অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অনিত্য সংসারে মায়ার বন্ধনে বাঁধা থাকিতে কোনও দিন সম্মতি প্রদান করেন নাই। যে কয়দিন দেহ আছে, সে কয়দিন কাহারও দ্বারস্থ না হইয়া, উপার্জ্জন দ্বারা জীবনযাপন করিয়া "রাম রাম" করিতে করিতে তিনি ইহলীলা অবসান করিবেন, এই তাঁহার বাসনা ছিল।

প্রিয়নাথের সে বাসনাপূর্ণ হইয়াছে। জননীর পরলোক গমনের পর হইতে তিনি নবীন উদ্যমে যোগোদ্যানে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং জীবনকে ধর্ম্মপথে রাখিয়াই সংসার ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইবেন, এই সঙ্কল্প করিলেন। সন ১৩১২ সাল হইতে তিনি তাঁহার কলিকাতার বাসা উঠাইয়া দিয়া যোগোদ্যানে থাকিতে আরম্ভ করিলেন, এবং তথা হইতে নিত্য কলিকাতায় আসিয়া কাজকর্ম্ম করিতেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, পথের দূরতা, কিছুতেই তাঁহার কষ্টবোধ ছিল না। তিনি বলিতেন যে, যতক্ষণ কলিকাতায় থাকি প্রাণ যেন 'হাইফাই' করে। যেমন খালের পোল পার হইয়া নির্জ্জন অন্ধকারে পাড়, প্রাণ যেন নাচিয়া উঠে। তখন আমি দেখি যেন, ঠাকুর আমার আগে আগে আলো লইয়া চলিয়াছেন, কখন বা সাপ ও শৃগাল কুক্কুর তাড়াইয়া দিতেছেন। যোগোদ্যানে যাইয়া যখন গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলি, তখন আমি স্বর্গধামে উপস্থিত হইলাম বলিয়া জ্ঞান হয়। বৃষ্টির দারুণ দুর্য্যোগে, তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াও রাখা যাইত না।

প্রিয়নাথ বেশ বলবান ছিলেন। ১৩১৪ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ, প্রিয়নাথ বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হয়েন। এই রোগে তাঁহার জীবনাশা বিন্দুমাত্র ছিল না, কেবল ঠাকুরের কৃপায় তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। যদিও তিনি সুস্থতা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় শরীর ও বল আর তিনি প্রাপ্ত হয়েন নাই।

ইদানী তিনি যোগোদ্যানে নিত্য ঠাকুরের সেবা ও পূজাদির কার্য্য স্বয়ং সম্পন্ন করিতেন। সন্ন্যাসীর ভাবেই জীবনযাপন করিতেন। চাকরী

করা ভিন্ন সংসারের সঙ্গে তাঁহার আর কোনও সম্বন্ধই ছিল না। তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ তিনি দেবসেবাতেই ব্যয় করিতেন। স্বদেশে তাঁহার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহা মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ, তিনি ঠাকুরের সেবার জন্য যোগোদ্যানের সেবায়তের হস্তে ন্যস্ত করিয়া দেন। তিনি যেন জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার আর এ জগতে অধিকদিন থাকিতে হইবে না।

গত অগ্রহায়ণ মাসে প্রিয়নাথ বেরীবেরী রোগে আক্রান্ত হয়েন। এই রোগে প্রায় একমাস ভুগিয়া, তিনি গত ৪ঠা পৌষ, রবিবার, বেলা ১০টায় যোগোদ্যান হইতে একখানি গাড়ী করিয়া তাঁহার গুরুগৃহে চিকিৎসার্থ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা ব্যবস্থা হইতে ছিল; কিন্তু ভবরোগের চিকিৎসক শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহাকে আর অনর্থক ঔষধ সেবন করিতে দেন নাই। বেলা ৩॥০ ঘটিকায় প্রিয়নাথ কথা কহিতে কহিতে কাসিতে লাগিলেন, বুকে দারুণ যন্ত্রণা বলিতে লাগিলেন; অমনি তাঁহার চক্ষুদ্বয় স্থির হইয়া আসিল। ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি, তাঁহার মুখে ঠাকুরের চরণামৃত দান করিলেন এবং কর্ণমূলে ঠাকুরের নাম বার বার শুনাইতে লাগিলেন। প্রিয়নাথ সেই শ্রীচরণ সুধাপানে বিভোর হইয়া, ঠাকুরের নাম শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমন করিয়াছেন। এই নরজগতের সহিত তিনি ৩৮ বৎসর মাত্র সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

ঠাকুর বলিতেন—কলমীর দল, একটী ধরিয়া টানিলে ক্রমে সব আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রিয়নাথের জীবনে আমরা ইহার কিছু পরিচয় পাইয়াছি। প্রিয়নাথ হইতে তাঁহার আত্মীয়বর্গের মধ্যে অনেকেই ঠাকুরের ভক্ত হইয়াছেন। এই প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার বাল্যের সহপাঠী ও চিরবন্ধু। ইনিও সে সম্বন্ধে তাঁহার নিকটে বিশেষ ভাবে ঋণী রহিয়াছেন।

জনৈক আত্মীয়।

নবদ্বীপচন্দ্র।

সংসারে আমি যদি পরের জন্য না কাঁদি, তাহা হইলে পর কখনই আমার জন্য কাঁদিবে না। ভক্তিশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, যদি পরের নিকট নিজে সম্মান প্রার্থনা কর, তাহা হইলে আগে পরকে সম্মান কর। যদি নিজের জন্য অন্যকে কাঁদাইতে চাও, তাহা হইলে অন্যের জন্য আগে নিজে ক্রন্দন কর। তাই বুদ্ধদেব পরের জন্য কাঁদিয়াছিলেন, তাই চৈতন্য মহাপ্রভু পরের জন্য কাঁদিয়াছিলেন, তাই যীশুখৃষ্ট পরের জন্য কাঁদিয়াছিলেন, তাই রামকৃষ্ণ পরমহংস, তাঁহার পদাশ্রিত শিষ্যবর্গ, এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণ পরের জন্যে কাঁদিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলের জন্য কাঁদিয়াছিলেন বলিয়াই আজ সকলে তাঁহাদের জন্যে কাঁদিতেছে। এরূপ ভাবে কাঁদিবার জন্যে কাহারও অনুরোধ করিতে হয় না, লোকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই কাঁদে।

আমাদের পরলোকগত মাননীয় ডাক্তার নবদ্বীপচন্দ্র পালও এই কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে আমরা এ কাল পর্য্যন্ত পরের জন্যে রোদন করিতে দেখিয়াছি। তিনি চিরকাল আমাদের জন্যে কাঁদিয়া গিয়াছেন বলিয়াই, আজ এ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ণকুটীরবাসী ভিক্ষুক পর্য্যন্ত এখানে সমবেত হইয়া সমানভাবে কাঁদিতেছেন, সকলেই নয়নজলে মুখমণ্ডল সিক্ত করিতেছেন।

এখানে ইতঃপূর্ব্বে আরও অনেক লোক দেহত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্যেত এরূপভাবে কাঁদিতে কেহই কখনও কাহাকেও দেখেন নাই? তবে কি নবদ্বীপচন্দ্র ডাক্তার ছিলেন বলিয়া লোকে কাঁদিতেছে? তাহা নহে। তবে কি জন্য কাঁদিতেছে? কি জন্য কাঁদিতেছে শুনিবেন? তবে শুনুন,—নবদ্বীপচন্দ্রে এমন একটী কোন গুণ ছিল যে, সেই গুণটীর কথা স্মরণ করিয়াই লোকে হাহাকার করিতেছে। সেটী আর কোন গুণ নয়, কেবল পরোপকারিতা গুণ। এক্ষণে আমরা নবদ্বীপচন্দ্রের ন্যায় পরোপকারী লোক এই কুমারখালীর মধ্যে,—শুধু এই কুমারখালী

---

* ১৩১৬ সালের ২৫শে মাঘ, সোমবার, কুমারখালীর পরলোকগত ডাক্তার নবদ্বীপচন্দ্র পালের স্মৃতি রক্ষা কল্পে, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে যে সভা হইয়াছিল, সেই সভায় পঠিত প্রবন্ধ।

কেন,—এদেশের মধ্যে দেখিতেছি না। এই গুণটী মনুষ্যের পক্ষে সুদুর্ল্লভ গুণ। ইহা ইচ্ছা করিলে লাভ করা যায় না। তাই আমরা যে মহাত্মা পুরুষে এই গুণ বিদ্যমান দেখি, তিনি সহস্র দোষে দোষী হইলেও আমরা তাঁহাকে দেবতা বোধে প্রণাম করিয়া থাকি। এবম্ভূত মহাগুণ বিমণ্ডিত ব্যক্তির চরণতলে জাতি-বিচার, কি বংশ-বিচার না করিয়া মস্তক অবনত করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

নবদ্বীপচন্দ্র যদি কলিকাতা কি ঢাকার ন্যায় কোন সমৃদ্ধিশালী নগরে ব্যবসা করিতেন, তাহা হইলে আজ তিনি ন্যূনকল্পে লক্ষ টাকা নিশ্চয়ই রাখিয়া যাইতে পারিতেন। নবদ্বীপচন্দ্রের আয় এখানেও নিতান্ত অল্প হইত না। এখানে যে কয়েকজন এল, এম, এস, ডাক্তার আছেন, নবদ্বীপচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। সকলের অপেক্ষা তাঁহার প্রসার ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তিনি দরিদ্র ব্যাধিপীড়িতের জন্য সমস্তই ব্যয় করিয়া—

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্য নিরুজস্য কিমৌষধং॥"

এই শাস্ত্র বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে নবদ্বীপচন্দ্রের ভিজিটবুক খুলিয়া দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার মাসিক যে পরিমাণ আয় হইত, তিনি যদি তাহার সিকি অংশও স্থিতি করিতেন, তাহা হইলে তিনি আজ বহু সহস্র মুদ্রা স্ত্রী পুত্রাদির গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য রাখিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু এ সঙ্কীর্ণ ভাব, এ হীন প্রবৃত্তি, প্রশস্তচিত্ত, উদারহৃদয় নবদ্বীপচন্দ্রের উচ্চ অন্তঃকরণে স্থান পায় নাই। তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, দরিদ্রের বেদনা তিনি প্রাণের সহিত বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি এই জন্মভূমি—কুমারখালীর ও তৎচতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের দীন দরিদ্র ভ্রাতাদিগকে ঔষধ ও অর্থের দ্বারা উপকার করিবেন বলিয়া এইখানেই চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করিয়া—"ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ মুৎসৃজেৎ" এই মহা-বাক্য প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপচন্দ্র কেবল ব্যাধির চিকিৎসক ছিলেন না, তিনি দেশের ও সমাজেরও চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার শাসন গুণে দেশের কেহই কোনরূপ দুষ্কার্য্য করিতে পারিত না। নবদ্বীপচন্দ্রের অভাবে এতদঞ্চলের জনসাধারণ, একজন উপযুক্ত স্বদেশ-হিতাকাঙ্ক্ষী হারাইয়াছেন।

যাহা হউক, নবদ্বীপচন্দ্র যে উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অব-তীর্ণ হইয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া আজ তিনি মানবের চরমপথে

গমন করিয়াছেন। এখন তাঁহার অনাথ পরিবারবর্গ যে, কি ভাবে কালাতিপাত করিবে, তাহাই ভাবিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যে লোক, দরিদ্র রোগীর ঔষধ ও পথ্য প্রদানপূর্ব্বক উপকার করিতেন, যে লোক, আর্ত্ত পীড়িতের পরিবারবর্গকে নিজের পকেট হইতে টাকা দিয়া প্রতিপালন করিতেন, আজ তাঁহারই পরিবারকুল কি খাইব ভাবিয়া আকুল হইতেছেন। যাঁহার ভরসায় গ্রামের দীন দরিদ্র গৃহস্থগণ নিশ্চিন্ত বসবাস করিত, আজ তাঁহারই উপার্জ্জনাক্ষম সন্তান সকল ও বিধবাপত্নী ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিয়া চিন্তার অকূলসাগরে ভাসমান হইতেছেন। যিনি বিপদসলিলে মগ্ন, নিরাশায় শুষ্ককণ্ঠ ব্যক্তিকে স্বীয় ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করিতেন, আজ তাঁহারই পুত্র, কলত্রসমূহ মহাবিপদসাগরে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। এ দুঃসময়ে কে তাঁহাদের রক্ষা করিবে? কে তাঁহাদের আশ্রয় প্রদান করিবে? যে নবদ্বীপচন্দ্র মহাশত্রুও বিপন্ন হইলে তাহাকে রক্ষা করিতেন, সেই নবদ্বীপচন্দ্রের—সেই দেশের বন্ধু—দরিদ্রের সহায় নবদ্বীপচন্দ্রের বিপন্ন পরিবারবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য কৈ কাহাকেও ত অগ্রণী হইতে দেখিতেছি না। আর হইবেই বা কে? এ কার্য্য ত আমাদেরই, আমরা ব্যতীত অন্য কে তাঁহাদের রক্ষা করিবে? নবদ্বীপচন্দ্র হেথাকার ধনী নির্ধনী সকলেরই উপকার করিয়া গিয়াছেন, সকলকেই রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকটে এ দেশের ধনী, মানী, গুণী, জ্ঞানী সকলেই ঋণী। আমি এখানে এমন লোক দেখিতেছি না যে, তাঁহার নিকটে ঋণী নহে। আমাদের বিশ্বাস যে, আমরা যদি সকলে একত্রিত হইয়া নবদ্বীপচন্দ্রের পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করি, তাহা হইলেও তাঁহার কৃত উপকারের যথেষ্ট প্রত্যুপকার করা যাইবে না।

নবদ্বীপচন্দ্রের পরিবারদিগকে কি নগদ টাকা দিয়া সাহায্য করিতে হইবে? না, তাহা নহে, কারণ তাঁহার একটী ডিস্পেন্সারী আছে, সেখানকার ঔষধ যে, খাঁটী ও বিশুদ্ধ, তাহা বোধ হয় আপনারা বিশেষভাবে অবগত আছেন। আপনারা যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই ঔষধালয় হইতে ঔষধাদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই মৃত ডাক্তার নবদ্বীপচন্দ্রের অনাথ পরিবারবর্গ কোনরূপে প্রতিপালিত হইতে পারিবেন। ভরসা করি, আপনারা এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবেন না।

পরিশেষে স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র কুণ্ডু, এল, এম এস, মহোদয়কে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না, কারণ, তিনি রোগী পরিদর্শন

করিয়া যে সমস্ত প্রেসক্রপ্সন করিবেন, সে সমস্তগুলিই নবদ্বীপচন্দ্রের ডিস্পেন্সারীতে অর্পণ করিবেন বলিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এজন্য বিজয়চন্দ্র ভগবানের নিকটে আশীর্ব্বাদভাজন এবং আমাদের নিকটে ধন্যবাদার্হ ও প্রশংসনীয়। আমি উপস্থিত জনসমূহকে বিজয়চন্দ্রের ঔদার্য্যগুণের অনুকরণ করিতে অনুরোধ করি।

আমি আর একটী কথা আপনাদিগকে জ্ঞাপন করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যে নবদ্বীপচন্দ্র দেশের ও দশের হিতের জন্য চিরজীবন ভরিয়া চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, যে নবদ্বীপচন্দ্র পরমশ্রদ্ধাস্পদ ত্যাগীরাজ বিবেকানন্দের প্রদর্শিত আদর্শপথে আজীবন চলিয়া, অন্তিমে বীরসাধকের ন্যায় মা মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে জাহ্নবীর পরম পবিত্র শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য কেবল রোদন করিলেই যথেষ্ট হইল না। এমন মহৎ লোকের একটী স্মৃতি সংস্থাপন করা বিশেষ কর্ত্তব্য। মহৎ লোকের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখিলে দেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা দেখিয়া দেশের ছোট বড় সকলেই তাঁহার ন্যায় উন্নতপথে উঠিবার চেষ্টা করে। স্মৃতিচিহ্ন দেখিলে মহতের চরিত্র আলোচনা করিবার ইচ্ছা মানবের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠে। তাহার দ্বারা সকলেই মহতের পথে চলিতে শিক্ষা করে। তাই বলি, ভাই। আর কালবিলম্ব না করিয়া, এস আমরা সকলেই পরহিতরত অশেষগুণশালী মৃত ডাক্তার নবদ্বীপচন্দ্র পালের জন্য স্মৃতি সংস্থাপনে মনোযোগী হই। যিনি যাইবার তিনি চলিয়া গিয়াছেন, অবশ্য তিনি আর এ স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে আসিবেন না। ইহার দ্বারা আমাদেরই কল্যাণ হইবে। আমরা বা আমাদের উত্তরপুরুষ যখন যে এই স্মৃতিচিহ্ন দেখিব বা দেখিবে, তখনই মনে হইবে যে, আজ আমরাও নবদ্বীপচন্দ্রের ন্যায় দেশের ও দশের বন্ধু হইবার চেষ্টা করি। এই কার্য্যের দ্বারা যে, কেবল নবদ্বীপচন্দ্রের কীর্ত্তি রক্ষা হইবে, তাহা নহে; ইহার দ্বারা আমাদেরও কীর্ত্তি রক্ষিত হইবে এবং যশোরশ্মি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। তাই আমি উপস্থিত সভ্যমহোদয়গণকে এই মহাবাক্যটীর প্রতি লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি—

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনং।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥"

শ্রীকান্তিবর ভট্টাচার্য্য।

বাণী-বন্দনা।

(১)

এল বাণী বীণাপাণি মনিষি মনোহারিণী,
উঠিল বীণারি রোল সপ্ত রাগ রাগিণী ॥
হৃদে শ্রীচরণ রাখি, পদরজ বুকে মাখি,
হাসিল প্রেমের হাসি, শ্রীপঞ্চমী তিথিরাণী ॥
মরতে জ্ঞানের আলো, আসি পুনঃ দেখা দিল,
জ্ঞানানন্দ উপজিল, পোহাল কাল যামিনী ॥
সুর, গ্রাম, তান, লয়, ছাইল ভুবনময়,
সংগীত লহরী চয় (মায়ের) হ'ল শ্রীপদ কিঙ্কিনি ॥
পিয়ে গীতব্রহ্মবারি, বিমোহিত নরনারী,
নয়নে আনন্দ বারি, হেরি ব্রহ্ম সনাতনী ॥
জ্ঞানদে জ্ঞানদে মা, শুভদে শুভদে মা,
নাশ মা মোহ-ত্রিযামা কিঙ্করে রক্ষ জননী ॥

(২)

এস মা ভারতী-সতী, সুধী-হৃদি-রঞ্জিনী।
জ্বালিয়ে বিজ্ঞান-বাতি শুভ-বুদ্ধি-প্রমোদিনী ॥
(মা'র) পদ্মাসন প্রতি দলে, দেব-দল দলে দলে,
গাহিছে আনন্দ-গান সংগীত-সিন্ধু শোভিনী ॥
আগম, নিগম, তন্ত্র, বেদ বিধি বীণাযন্ত্র,
সকলি তোমারি তন্ত্র, প্রতিভা-প্রদায়িনী ॥
আছি গো মা পথ চেয়ে, ধন্দ লাগি অন্ধ হ'য়ে,
(মোহ) আঁধারে জ্বালো মা আলো, দিব্য-জ্যোতি-বিকাশিনী ॥
ধরণী তিমির ভরা, জীবকুল সংজ্ঞাহারা,
(মাগো) বিতর করুণা কণা, বিজ্ঞান-ঘন-রূপিণী ॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

অরুচি।

(১)

তারা গো, বিষম অরুচি,—
কচ্ছে আমার গা ঘিন ঘিন্,
যাচ্ছে যত বেশী গো দিন,
(আমি স্নান কোরে তোর কৃপাসরে
হব মা শুচি।

(২)

তারা গো নিম্‌তেতো সংসার—
এই কি মা তোর লীলাকানন ?
মাগো এ যে বিচুটি বন—
ছট্‌ফোটিয়ে মলেম আমি,
থাকবো নাকো আর।

(৩)

তারা গো ওল-কচু-কানন—
মিষ্টি মধুর লাগেনা কায়,
চাক্‌লে পরে গলা ধরায়,
(আবার) সমাজ-রূপী বৃশ্চিকেতে
কচ্চেছে দংশন।

(৪)

তারা গো বহুরূপী সং
তেতো খরা পচা ধসা,
বিদ্‌কুটে টক্ বোদা কসা,
(আমার) ফাট্‌ছে ছাতী, ঝর্‌ছে নয়ন,
দেখে শুনে ঢং।

(৫)

তারা গো চোর ডাকাত ভরা,
তোমামুদে পাপর ভাজায়
ধূমে প্রাণে ফাঁসায় মজায়,
(কেবল) শিশু-কড়াইভাজাগুলি—
সবার মন হরা।

(৬)

তারা গো আছি তাই বেঁচে—
কুপত্তিতে মায়ার ঘোরে,
কড়াইভাজা ভোলায় মোরে,
(যদি) সে গুলি হয় চিতাভস্ম,
পাই দুঃখ কেঁচে।

(৭)

তারা গো আত্মীয় স্বজন—
স্বার্থে ভরা লৌকিকতা
দেঁতো হাসি ছেঁদা কথা
(আমি) সষ্টাঙ্গেতে প্রণমি গো,
তাদের শ্রীচরণ।

(৮)

তারা গো একটী যে মধুর,
ভাল লাগে সংসারে যা—
খাঁটী জিনিস আদর্শ "মা"
(এই) পচা জলের সংসারে মা
মিশ্রিত কর্পূর।

(৯)

তারা গো পতির কেমন স্বাদ ?
অপ্রেমেতে অজ্ঞানতায়,
একজামিনে হেরেছি তায়,
(তাই) পতিত্বেতে নীরব আমি,
স্বর্ণ কি সে খাদ !

(১০)

তারা মা আম্র আঙুর ফল,
মধুর কানন নিঝুমতা
জড়ায় যথা গাছে লতা
শৈল বুকে নির্ঝর ঝরে
পাখীর কোলাহল।

(১১)

তারা গো বিশুদ্ধ সন্দেশ—
মহত সাধু যোগে বসি,
নাইক বুকে দাগামসি.
(এমন) একটী আমি চেকেছি মা,
সুমধু সরেস।

(১২)

তারা গো মনেই অরুচি—
বাসনা আর অজ্ঞানতা,
লুকিয়ে বুকে পেশে গাঁতা,
(আমার) ইচ্ছে করে কেটে কেটে
করি গো কুচি।

(১৩)

তারা গো মর্‌বো কি তবে—
এ অরুচি বাড়ছে ক্রমে,
অজ্ঞানতার বিষম ভ্রমে,
আমার চিত্তে—বিকার বাড়ুক তীব্র
তোমার ত সবে ?

(১৪)

তারা গো অশ্বরূপী মন—
ধর্ম্ম কাজে কুঁড়ে অতুর,
তোলে কেবল কাঁচনে সুর,
উঠ্‌তে বস্‌তে দুঃখের চপ্‌টি
খাচ্ছে অনুক্ষণ।

(১৫)

মা তারা, তারা মা আমায়
কৃপাপ্যাথি ঔষধে তোর,
এ অরুচি দূর হবে মোর,
(তোমার) অমল কমল পদের সুধা
মন অলি চায়।

শ্রীসুশীলমালতী সরকার।

উদ্বোধন।*

বাজিল ধর্ম্মের ভেরী গভীর নিনাদে,
হাসি উষা শুনিল সে তান,
দলে দলে নর নারী ধাইল আহ্লাদে,
শান্তি আশে শুনিয়া আহ্বান।
উদিল কনক রবি বিকাশি কিরণ,
ফুটে উঠে কুসুম হরষে,
হের হের ভৃঙ্গ দল করি প্রাণপণ
ছুটে যায় মধুপান আশে।

---

* কটক, বহুগ্রামে ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত।

"এ রবির খর তেজে শুদ্ধ জাগরণ"
শুনিয়াছি মহাত্মার কাছে ;
তবে কেন নিদ্রাদেবী করি আকর্ষণ
জোর করে টেনে রাখে পিছে ?
বুঝেছি আমরা সবে ; চুম্বক যেমন
লৌহ পেলে টেনে লয় কাছে,
কাদা-মাখা লৌহ কিন্তু পারেনা কখন
যাইতে গো চুম্বকের কাছে।
সেইমত মোরা দেব! মায়ামলা মাখি
পড়ে আছি অসার সংসারে ;
মায়াময় ভবখেলা—নিরন্তর দেখি
তবু মন ছাড়েনা তাহারে।
দয়ানিধে! দয়া করি জ্ঞানহীন জনে
মায়ামোহ কর প্রক্ষালন ;
লও লও কাছে প্রভো, নিজগুণে টেনে,
ঘুচুক অচিরে যত সংসার বন্ধন।
আজ শুভ জন্ম-তিথি উপলক্ষ করি
দলে দলে ভাই ভগ্নী মিলে,
একত্রিত হইয়াছি তব নাম স্মরি
এই পূত জন্মোৎসব স্থলে।
তুমি গতি, তুমি মতি, মোক্ষ জীবনের
এইমাত্র জানিয়াছি মোরা ;
প্রেম, শ্রদ্ধা, শুদ্ধাভক্তি দাও গো মোদের
জীবনের তুমি ধ্রুবতারা॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত।

অমৃত।

(১)

তারা-পরিবৃত হ'য়ে,
নিশীথে গগনে বসি,
জগতে অমৃত-কর,
প্রদান করিছে শশী।

(২)

করিছে জলধি নদী,
অজস্র অমৃত দান,
বাঁচাইছে অবিশ্রান্ত,
অনন্ত জীবের প্রাণ!

(৩)

ওই যে পাপিয়া পিক,
ধরিয়া অমৃত-তান,
গাইছে অমৃত গীতি,
জুড়ায় বিশ্বের প্রাণ।

(৪)

মৃদু-মন্দ সমীরণ,
ফুলের অমৃত ঘ্রাণ,
ছড়ায়ে করিছে ফুল্ল,
আমোদিত ধরাখান।

(৫)

শ্রান্তকে অমৃত-ছায়া,
দিতেছে পাদপদল,
করিছে অতিথি সেবা,
প্রদানি অমৃত ফল।

(৬)

অমৃতের ফল্গু-নদী,
বিশ্বের মাঝারে বয়,
অমৃত-গেহ সে, তার,
এ বিশ্ব অমৃতময়।

(৭)

দারাপুত্র-পরিবৃত,
সংসার নীরস নয়,
ঈশ্বরের প্রিয় স্থান,
সংসার অমৃতালয়।

(৮)

নিজে নহে, সংসারের,—
কর্ত্তা যার ভগবান,
সেই ত সংসার থেকে,
করিছে অমৃত-পান।

শ্রীভোলানাথ মজুমদার।

জন্মোৎসব-গীতি।

(১)

স্বরগ-দুয়ার-খুলি এল প্রেম অবতার।
দীনের-কুটীরে হের প্রেমিকের দরবার॥
তারা পথে শোন গায়, জয়ধ্বনি উভরায়,
জনক নানক শুক নারদাদি বার বার॥

যিনি গড্ আল্লা হরি, জিহোবা জগদীশ্বরী,
(আজি) রামকৃষ্ণ-রূপ ধরি লইছে পাপীর ভার ॥
কোরাণ পুরাণ তন্ত্র, বাইবেল বেদ মন্ত্র,
বিজ্ঞান দর্শন শাস্ত্র হ'ল এবে একাকার।
সংগোপনে আসাআসি, জীবে ভাল বাসাবাসি,
প্রেমিক উদাসী-বেশী ভ্রমে দীনের দুয়ার ॥
নেহারি অনাথ দীনে, পায় কত ব্যথা প্রাণে,
বহিছে নয়ন কোণে অবিরল অশ্রুধার ॥
(শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণে কর সবে নমস্কার)

(২)

(হ'ল) সর্ব্ব ধর্ম্ম-সমন্বয় একাধারে রে।
বসন্ত আগমে, পুণ্য বঙ্গধামে,
সঙ্গে সহচর বিরাজ করে।
হের মঙ্গল মিলন গো :—
(ঘাটে) (ভব পারের তরী এল)
পুরাণ কোরাণ, শাস্তির বিধান,
গায় একেশ্বরে।
শুন নবীন বিধান গো :—
বৌদ্ধ মুসলমান, জৈন খৃষ্টিয়ান্,
করে আলিঙ্গন ;
গেল ধরম বিবাদ গো :—
(রাম রহিম মিলে গেল)
(নাচে) ঈশা মহম্মদ, মুশা গোরাচাঁদ,
গলা ধরে রে।
ভেদ অভেদ ডুবিল গো :—
(তবে) যত মত ছিল, তত পথ হ'ল,
প্রেম উথলিল,—
(সবে) মঠে মস্জিদে মিলিল গো :—
(হ'ল) (গির্জ্জা মন্দির একাকার)
(ভাব) কৌমুদী ছাইল উদিল প্রেমশশী
(রামকৃষ্ণ) ধরম অম্বরে ॥

উৎসব সংবাদ।

গত ২রা ফাল্গুন, সোমবার, সরস্বতীপূজার দিন, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও উৎসব হইয়াছিল। এই দিনে বেলিয়াঘাটা নিবাসী শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। প্রায় সাত দিন ধরিয়া তথায় সুমধুর কীর্ত্তনগানে ও হরিসংকীর্ত্তনে পল্লিমুখরিত হইয়াছিল।

গত ৮ই ফাল্গুন, রবিবার, সালিখা রামকৃষ্ণ-অনাথ-বন্ধু সমিতির সপ্তম বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে সালিখা ছাতুবাবুর ঘাটে মহাসঙ্কীর্ত্তন, ভক্তসেবা, এবং অনাথ দরিদ্রদিগকে অকাতরে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সমিতির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় এবং সভ্যগণ সকলকেই আদর আপ্যায়নে বিশেষ ভাবে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

গত ২৮শে ফাল্গুন, শুক্লা দ্বিতীয়ায় কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে ঠাকুরের জন্মতিথি পূজা এবং তৎ পরদিবস তদুপলক্ষে ঠাকুরের বিরাট রাজভোগ হইয়াছিল। অনেক ভক্ত সমবেত হইয়া ঠাকুরের নাম গানে আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

গত ২৯শে ফাল্গুন, রবিবার, কটক বঙ্গগ্রামে ঠাকুরের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে তথায় প্রায় ৬০০ শত দরিদ্রনারায়ণের পরিতোষ ভাবে সেবা করা হইয়াছে।

৬ই চৈত্র, রবিবার, বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণমঠে ঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবে প্রায় ৩০।৪০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন। সেবকগণ সকলকেই প্রসাদ দানে এবং আদর আপ্যায়নে তুষ্ট করিয়াছিলেন, নামগানে উৎসবক্ষেত্র মুখরিত হইতেছিল। এ পুণ্যময় দৃশ্যের মহিমা দর্শক হৃদয়ে চিরজাগরিত থাকিবে।

১১ই চৈত্র, শুক্রবার, দোলপূর্ণিমার দিবস, যশোহর চেঙ্গটীয়া ধর্ম্মাশ্রমে ঠাকুরের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়া আনন্দ করিয়াছিলেন।